আকাশ-পাতাল

(প্রথম পর্ব্ব)

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

(অ, আ, ই ছদ্মনামে লিখিত)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৭
মূল্য পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা

কল্যাণীয়া শ্রীমতী আরতি দেবীকে

কুসঙ্গ আর অসৎ প্রবৃত্তির খেয়ালে ছেলে যাতে বিগড়ে না যায়, সেদিকে কুমুদিনীর দৃষ্টি ছিল প্রখর। শিক্ষাও ছিল অনন্যসাধারণ। পাঁচ আত্মীয়ের কান-ভাঙানি, মোসাহেবের চাটুকারিতা, শত্রুর স্তোক-বাক্য শুনে ছেলে যাতে ঘর ভুলে পরকে আপন করতে না যায়, সেই ভয়েই সিঁটিয়ে থাকতেন কুমুদিনী। সদাই চোখ রাখতেন ছেলের চাল-চলন, মতি-গতির দিকে। ক্ষুধা পেলে আহার এগিয়ে দিতেন। তৃষ্ণায় জল। অসুস্থ হলে সেবা করতেন। কিন্তু ছেলের মনোরাজ্যে কখন যে কিসের তুফান উঠলো, শতেক চেষ্টাতেও তা কি অনুমান করতে পারতেন!

বিধবার একমাত্র সন্তান কৃষ্ণকিশোর। প্রচুর স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির খাস মালিকানা তার। নাবালক উত্তরাধিকারী, তাই বকলমে এ ষ্টেটের কাজ চ'লেছে। আত্মীয়-স্বজনের অশুভ কামনা, শত্রুতার চেষ্টা আর ছলনার ষড়যন্ত্র থেকে অভিভাবক কুমুদিনীই এত কাল রক্ষা করে আসছেন ছেলেকে। কারণ, সরকার টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব কষেই না কি খালাস, বালকের নৈতিক চরিত্রের কি এল-গেল সে-বিষয়ে কোন মাথার কারণ নেই।

পড়াশুনায় মন নেই। বই-পত্র ভাল লাগে না। পাঠশালার বন্দিজীবন মনে হয় বিষময়। কৃষ্ণকিশোর গুরুকে ভক্তি করে, কিন্তু তাঁর অসাক্ষাতে বিলক্ষণ দু'-চার গাল-মন্দ দেয়। চলন-বলনের অনুকরণে হাসি-তামাসা করে। বইগুলো পর্যন্ত সে নিজে বয়ে নিয়ে

যায় না, একটা পোষা কুকুরের গলার বগলসে ঝুলিয়ে দেয়। পণ্ডিতের নজরে পড়ে। পণ্ডিত মশাই বলেন,—তুই এমন উচ্ছিষ্ট হচ্ছিস কেন বল্ তো?

কৃষ্ণকিশোর বিস্ময় মানে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। পণ্ডিতই কথা বলেন,—কুকুরে বই বইবে, মাষ্টারে প'ড়ে দেবে আর তুমি বৃত্তি পাবে! এ আশা বৃথা!

বিদ্যার বৃহস্পতি বাড়ী ফিরে এসে বই-পত্র ফেলে ছড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে ডাক ছাড়লে,—মা, মা, মা!

কুমুদিনী রান্না-বাড়ীর চাতালে বসে তখন নারকেলের ভাজা-পুলি তৈরী করছিলেন। ছেলে এসে খাবে। ডাক শুনে হাতের কাজ ফেলে উঠে পড়লেন।

ব্রাহ্মণী ছিল উনুনের ধারে। যোগান দিচ্ছিল। গিন্নীমার ফেলে যাওয়া কাজ সারতে বসলো।

কুমুদিনী তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—কি হয়েছে রে?

কৃষ্ণকিশোর নিরুত্তর। কুমুদিনী দেখলেন বই-খাতা-কলম ছত্রাকারে ছড়িয়ে আছে চতুর্দ্দিকে। দেখে কি আর করবেন, হাসলেন। কাতর হাস্য। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—কি হয়েছে? পণ্ডিত মশাই মেরেছেন?

বাঁধা-গরু ছাড়া পাওয়ার মত হঠাৎ মায়ের নাগাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কৃষ্ণকিশোর। ক্রোধে আর আক্রোশে ফুলতে ফুলতে স্বগত করলো,—মারবে! ইস্, টিকি কেটে নেবো না তা হলে!

কুমুদিনী লজ্জায় চোখে দু'হাত তোলেন। বলেন,—ছিঃ, এমন কথা

বলতে নেই কিশোর। তিনি যে তোমার গুরু। আচার্য্য, শিক্ষক, উপাধ্যায়। ছিঃ!

কৃষ্ণকিশোর বলে,—শালা বলে কিনা কুকুরে বই নিয়ে আসবে, মাষ্টারে পড়িয়ে দেবে আর তুমি বিত্তি পাবে!

কুমুদিনীর মুখে ব্যথার ছায়া ঘনিয়ে আসে। চোখ দু'টো ছল-ছল করে। বলেন,—কিশোর, তুমি পণ্ডিত মশাইকে শালা বলছ? ছিঃ!

—বলবে না? শুধু শালা, শালা শূয়ার-কি-বাচ্ছা বলে কিনা আমার পাঠশালে আসাই বৃথা! বলতে বলতে কৃষ্ণকিশোর সদরের দিকে পা বাড়ায়। বৈকালের আলো-আঁধারিতে মা দেখতে পেলেন কিশোরের বিলীয়মান শুভ্র বেশ। চুড়ীদার আদ্দির পাঞ্জাবী, আর বৃন্দাবনের খয়েরী ফুলপেড়ে ধুতি।

দিন-শেষের রক্তিমা পশ্চিমের মেঘে। ঘরের ভেতর অন্ধকার হয়ে আসছে। তাঁবেদার মশাল হাতে বাতিদানে আলো জ্বালাতে বেরিয়েছে দালানের অপর তীরে। মশা উড়তে শুরু করেছে। কুমুদিনী মাথার ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। শান্ত পদক্ষেপ। চোখে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী। নেহাৎ দশ বছরে এ-বাড়ীতে পা দিয়েছেন, তাই চোখ দু'টো বন্ধ ক'রেই এগিয়ে চললেন।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই কেমন যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কে আবার এ নামে হঠাৎ ডাকলো তাঁকে!

—কুমুদিনী!

—তুমি? ত্রস্ত হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন কুমুদিনী। কৈ, কেউ তো নেই! কোথায়? ভাঙা-মনে আবার পা বাড়ালেন। ওপরে চললেন। খাস-মহলে।

কিশোর, তাই ভুল করেছে। জানে না তাই। নয় তো সে কি কান

পেতে শুনেছে তিনি কি বলেছেন! সদরে যাওয়ার পথটুকু একটুখানি নয়। অনেকটা। তার আগে দু'-দুটো মহল পেরোতে হবে। চারটে লম্বা লম্বা দালান, তিনটে উঠোন, একটা নাটমন্দির। ছাত্রের একটি বারের জন্য মনে পড়ে যায় পণ্ডিত মশাইকে। তাঁর মুখখানা। তাঁর চলন-বলন, শিক্ষা দেওয়ার আদব-কায়দা।

তখন আরও ছোট ছিল সে। পণ্ডিত মশাইয়ের কোলে ব'সে যখন অক্ষর চিনছে—অ, আ, ই। তারপর? তারপর আরও গোটা কয়েক বছর চলে গেছে। কিশোর বড় হয়েছে। একদিন পাঠের অন্তে পণ্ডিত মশাই কিশোরকে ডেকেছেন, বলেছেন,—আজ তুমি থাকবে। তুমি আজ কনফাইন্‌ড রইলে! তোমার আজ কনফাইন্‌মেণ্ট। আর সব ছেলেরা যে-যার বাড়ী ফিরে যাও।

কিশোর তাই বুঝতে পারেনি। অন্যান্য সহপাঠীরা তাকিয়েছে সবিস্ময়ে। ভেবেছে কোন্ অপরাধ হয়েছে তার, তাই আটক হয়েছে আজ। কেউ হেসেছে। কেউ ঘরে ফিরে সিধে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে বলে মনে মনে তখনই ঠিক করে ফেলেছে। পাছে গুরু কিশোরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন!

অবশেষে সদরে এসে পৌছলেন ভাবী-কর্ত্তা। মুখাকৃতি অসম্ভব গম্ভীর। চক্ষু কুঞ্চিত। কপালে এখনও রেখা ফুটে ওঠেনি নেহাৎ, তাই রক্ষা। এক পাশে বৈঠকখানা, নাচ-ঘর, ডাইনিং-রুম। আর এক পাশে কাছারী। কাছারীর দালানে সেজের প্রদীপ জ্বলছে দেখলো কৃষ্ণকিশোর। চশমা চোখে মুন্সী পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। তিলক-কাটা বুড়ো পুরুত দোরে দোরে গঙ্গাজলের ছড়া দিচ্ছে। কাছারীর দেওয়ালে জার্ম্মানীর ছাপা কালি, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, চণ্ডী, বগলামুখী আর মা গন্ধেশ্বরীর ছবির তলায় ধুনোর ধোঁ পড়ছে।

নাটমন্দিরে শাঁকের শব্দের সঙ্গে ঘণ্টার টং-টং শুরু হল। কৃষ্ণকিশোর সোজা বৈঠকখানায় এসে ফরাসে গড়িয়ে পড়লো একটা ভেলভেটের তাকিয়া টেনে নিয়ে। তার আগে হাত বাড়িয়ে দুলিয়ে দেয় ঝুলন্ত আলোর ঝাড়। বেলজিয়ামের কাটা কাচের ঝাড়।

ছোটবেলার অভ্যাস এখনও ভুলতে পারেনি। ঐ জলন্ত আলোর ঝাড় ধীরে ধীরে দুলবে আর ফরাসে শুয়ে দেখবে সে অনেকক্ষণ ধরে। থেমে গেলে চলবে না। বত্রিশ বাতির ঐ দোদুল্যমান ঝাড় দুলতে থাকবে। হরেক রকম রঙ ঠিকরোবে। সে এক বাহার খুলবে। আর ফরাসে শুয়ে একদৃষ্টিতে দেখবে কৃষ্ণকিশোর।

আজকেও আলো দুলছে যথারীতি। সেই কাট-গেলাসের আলো। তবুও সেই একটা চিন্তা কেমন যেন তাড়া করে চলেছে কিশোরকে। আলোর রঙীন ছায়া আজ আর দেখতে পাচ্ছে না সে। দেখছে, যেন সে পাঠশালায় বসে আছে পণ্ডিত মশাইয়ের পাশে। সেই সেদিনের কথাগুলি মনে পড়ছে।

তিনি বলছেন,—তোকে আজ আটকে রেখেছি কেন জানিস?

কৃষ্ণকিশোর বিস্ময়ে হতবাক্। বললে শুধু,—না, জানি না।

পণ্ডিত মশাই কিছু বলবার আগে কতক্ষণ বসে রইলেন নীরবে। কি সব ভাবলেন কে জানে। হঠাৎ বললেন,—তুই বিধবার একমাত্র সন্তান। তোর উপর অনেকের দৃষ্টি। তুই কি শেষে ঐ ডিরোজিওর বংশধরদের দলে নাম লেখাবি?

ডিরোজিও! ডিরোজিও!!

কৃষ্ণকিশোর ভয়ে ভয়ে বললে,—না পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত মশাই বলতে থাকেন,—তোমার পাঠে মন নাই। তুমি যদি লেখা-পড়া না শেখো তা হলে কি হবে জান? তোমার টাকা-পয়সা

পাঁচ ভূতে ওড়াবে। সরস্বতীর সেবা না করলে লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখতে পারবে না। নৈব চ—নৈব চ।

পণ্ডিত শালুতে পুঁথি জড়াতে জড়াতে আসন থেকে উঠে পড়লেন কথা বলতে বলতে। বললেন,—যাও, বাড়ী যাও। সন্ধ্যার পর ছাত্রদের গৃহের বাইরে থাকতে নাই।

চলেই যাচ্ছিল কৃষ্ণকিশোর। এক নতুন অভিজ্ঞতার ঝুলি হাতে নিয়ে। মনে হল, এ ধরণের কথা কখনও এত আবেগ-ভরে কেউ বলেনি। এত আন্তরিকতার সুরে। পাঠশালার আঙিনায় পা দিয়েছে কৃষ্ণকিশোর। পণ্ডিত মশাই আবার কথা বললেন,—কিশোর, তোমরা ইংরেজী কায়দায় এ্যালবার্ট ফ্যাশনে চুল রাখছ! ভুলে যেও না। কখনও ভুলে যেও না তোমাদেরই একটা ইংরেজী কথা,—Learning is a jealous mistress!

কিশোর তাই বুঝলো না। কথাটার অর্থ জানলো না। শুধু শুনলো মাত্র।

আলোর ঝাড় কখন থেমে গেছে। একেবারে স্থির। আজ যেন আর ইচ্ছা হয় না হাত বাড়িয়ে তুলিয়ে দিতে। থাক্, আজ আর নয়। আলোর রঙীন ছায়া আজকের জন্য মুছে গেল তার চোখ থেকে।

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লকে টাং-টাং ক'রে ছ'টা বেজে গেল। একজন নায়েব এসে বললে,—দাসী জলখাবার এনেছে হুজুর! মা অন্দর থেকে পাঠিয়েছেন আপনার তরে।

—মা গো! মনটা যেন হু-হু করে উঠলো কৃষ্ণকিশোরের। বললেন, —কৈ, খাবার আনতে বলুন।

সত্যিই ক্ষুধার্ত্ত সে। আর ক্ষুধার নাকি মা-বাপ নেই। খাবারের রেকাবি হাতে নিয়ে একে একে মুখে তুললো নারকেলের ভাজা-পুলি।

তার সাধের একটি খাদ্য। অর্ডারের জিনিষ।

খেতে খেতে মাকে মনে পড়ে যায় মুহূর্ত্তের জন্যে। তাঁর হাতের তৈরী। কিশোরের মনে হয়, সে যেন মা'র চোখে জল দেখেছে আজ। তাঁর চোখ দু'টো তখন ছল-ছল করছিল যেন।

কুমুদিনী তখন খাস-মহলে।

তিনি আর, আর এক জন থাকেন। কিশোর ব্যতীত অন্যের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কুমুদিনী সেই ব্যক্তির সমুখে দাঁড়িয়েছিলেন তখন। দু'চোখে জলের ধারা নেমেছে। স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। তাঁর রাজবেশ। মুখে মিষ্টি হাসি। চোখের দৃষ্টিতে আহ্বানের মৃদু ইঙ্গিত। কুমুদিনী চেয়ে আছেন।

তিনিও চেয়ে আছেন। তাঁর মাথায় হীরে-বসানো টুপি, বুকে জরীর কারচোপের কর্ম্ম-করা কাবা। গলায় মুক্তার পাঁচনরী, হীরের কণ্ঠি। দু'হাতের দশ আঙ্গুলে দশটি আঙটি। নবরত্ন, আর একটি ক্যাট্স-আই। পায়ে নবাবী নাগরা। হাতে শুধু আঙটি নেই, সবলে ধ'রে আছেন একটা হৃষ্ট-পুষ্ট তেজস্বী ওয়েলারের বল্গা। আর হাসছেন।

সত্যি নয়। বিরাট একখানা তেল-রঙের ছবি। সোনালী আঙ্গুরের গুচ্ছ আর পাতার ফ্রেমে বাঁধানো। কুমুদিনীর শয়ন-ঘরে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

ছবির নীচে মেহগিনির বর্ম্মী ব্র্যাকেটে ধূপদানি আর ফুল। সকাল-সাঁঝে আরতি হয় কৃষ্ণচরণের। কুমুদিনীর চোখের জলে।

কৃষ্ণচরণ সেই দলের উদ্যোক্তা। জমিদারীর স্বত্ব থাকলে কি হবে, ইংরেজ-শাসনের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—এক দল সম্ভ্রান্ত বাঙালী। হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান আর চব্বিশ পরগণার বাসিন্দা। গঙ্গার তীরদেশে

তাঁদের বাস, কলকাতা শহরের আনাচে-কানাচে। সে-যুগের দেশবাসীর যা-কিছু আশা-ভরসা। ইংরেজী অত্যাচার, দেশের সংস্কার, জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা, আর দরিদ্রের অভাব মোচন—সে সময়ে তাঁরাই ছিলেন এই সব গণযুদ্ধের প্রধান পুরোহিত।

খাল-বাঁধা, রাস্তা তৈরী, জলাশয়, পান্থশালা, হাসপাতাল নির্ম্মাণ, গুপ্ত-রাজনৈতিক বিপ্লবী দলকে অর্থের সাহায্য দান তাঁরাই করতেন। কৃষ্ণকিশোরের পিতা কৃষ্ণচরণ ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম।

দাসী এসে বাইরে থেকে ডাকলো,—হুজুরণী! কুমুদিনী চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এলেন। দাসী বললে, হুজুর জলখাবার খেয়ে জুড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন, তা নাকি ব'লে গেলেন না ম্যানেজারকে।

কুমুদিনী শান্ত পদক্ষেপে দালানের জানলায় এসে দাঁড়ালেন। বাইরে সন্ধ্যা উৎরে গেছে। দেখলেন, রাস্তায় পানের দোকানে দেওয়ালগিরী আর বেল-লণ্ঠন জ্বলছে। আস্তাবলে গাড়ী নেই, ঘোড়াও নেই।

নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন কুমুদিনী। একটা জানলার পাখী খুলে। কিশোর ফিরে আসবে কখন?

নাটমন্দিরে শেষ শাঁখ বাজতেই যুক্তকরে প্রণাম করেন গৃহ-দেবতাকে। পাখী খুলে আবার দেখতে থাকেন। কিশোর কখন আসবে। আকাশে তখন সন্ধ্যাতারা দু'-চারটে। পথ প্রায় জনহীন। কুমুদিনীর চোখে জলের ধারা।

দেখতে দেখতে আঁধারের প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। রাতের পাখীরা সব আকাশে উড়লো। চতুর্দ্দশীর চাঁদ হঠাৎ যেন দেখা গেল

আকাশে। ডুবে ছিল এতক্ষণ। ভেসে উঠলো যেন। নাটমন্দিরের চূড়ায় পেতলের কলস। চন্দ্রালোকে চিক্-চিক্ করছে। চৌরঙ্গীর দিকে শেয়ালের পাল ডাক ছাড়লো। জানান দিয়ে গেল প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত। প্রাঙ্গণের গাছে-গাছে জোনাকীর ঝাঁক। আকাশের এক রাশ তারার মত জ্বল-জ্বল করছে যেন।

ওদিকে জোড়াসাঁকো, ইদিকে চিৎপুর, তার পর কলুটোলা। চাপা কলরব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে থেকে থেকে। যত দূর চোখ যায়, দেখা যাচ্ছে রাস্তার দু'ধারের বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছে সারি সারি। লালমোহন, টিয়া, কাকাতুয়া, নেউল আর বেড়াল পাশে নিয়ে বিবিরা সব হাত-পাখায় বাতাস খাচ্ছেন। আর আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছেন ইদিক-সিদিক। বেলফুল আর মালাইওলার চিৎকারের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। বাবুদের সব বগী, ব্রাউহাম, ফিটনদের একে একে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সইস আর কোচম্যানের পাগড়ীর আঁচল ল্যাজের মত উড়ছে শূন্যে।

কিশোর এখনও এলো না। গেল কোথায়। কুমুদিনী ইষ্টনাম জপ করেন। পণ্ডিত মশাইয়ের কথায় রাগ ক'রে মায়ের মনে কষ্ট দেবে! আর অপেক্ষা নয়, বিরক্ত হয়ে অবশেষে আবার ডাকলেন,—বিনোদা!

দাসী ছিল কাছাকাছি। লম্প পাশে নিয়ে সুপুরী কুঁচিয়ে রাখতে বসেছিল। মধ্যে মধ্যে ঘুমে ঢুলছিল। মশার কামড়ে, আর জাঁতিতে হাত কেটে যাওয়ার ভয়ে কখনও বা চোখ মেলে দেখছিল চমকানি খেয়ে খেয়ে।

দাসী আসতেই বললেন কুমুদিনী,—ম্যানেজার বাবুকে বল' এখুনি বেরিয়ে যেন খোঁজ করেন কিশোরের। পাইক পাঠাতে বল তার বন্ধুদের বাড়ী। তার পিসীমার বাড়ীতেও লোক যায় যেন। আর পণ্ডিত

মশাইকে বলে পাঠাও কিশোরের মা নিজে তাঁকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। কাল সকালেই যেন তিনি আসেন। যাও যাও, শীঘ্রি যাও।

দাসী ছুটল থপথপিয়ে।

এখান থেকে কাছারী-বাড়ী বড় সামান্তি পথ নয়। যেতে-আসতে দস্তরমত হাঁফিয়ে যেতে হয়। তবুও দাসী প্রায় ছুটতেই থাকে। কুমুদিনী আবার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন। রুদ্ধ নিশ্বাসে কথাগুলি শেষ ক'রে তিনি নিজেই খানিক উত্তেজিত হন। গর্ভে ধারণ করলেন যাকে তার কি এই প্রতিদান! জন্মের পর থেকে এত কাল যাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন, শেকল কেটে সে-ই উড়ে গেল! কিন্তু গেল কোথায়! এমন হয় না কখনও, মাথার গুণ্ঠন কদাপি খোলা থাকে না। আজ সব কিছু ভুলে গেছেন কুমুদিনী। ভয়ে আর উদ্বেগে।

এ ঘরে শুধু তাঁর আসবাব-পত্র।

পালঙে শয্যা, দেরাজে পোষাক। তাঁর ব্যবহারেরই যত কিছু। মায় সায়েববাড়ীর জোড়া জোড়া জুতো আর নানা রকমের বাহারী ষ্টিক্ পর্য্যন্ত। আর লম্বা কাচের বুক-কেসে সব ঠাসা ঠাসা বই। মরক্কো বাঁধাই। সোনালী আখরে নাম লেখা। একটা দেরাজের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন কুমুদিনী। একখানা বই নজরে পড়ে। কর্ত্তার সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী ছিল সে-বই। সর্ব্বদা পাশে রাখতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক জজ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। এই গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য-তনয় বৈজপাল রাজা শ্রীধরাধর নামক স্বীয় পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে বিদ্যার গুণানুবাদ শুনিয়েছেন। অতঃপর আচার্য্য প্রভাকরের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থে পুত্রকে সমর্পণ করলে প্রভাকর রাজপুত্রকে

সম্বোধন-পূর্ব্বক বর্ণবিচার থেকে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনেক বিষয়ের উপদেশ দেন এবং হিতোপদেশের ছলে লৌকিক শাস্ত্রীয় নানা উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

তর্কালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকার এই কাহিনী কুমুদিনী তাঁর কাছেই শুনেছেন। তার পাশে রয়েছে হ্যালহেডের ব্যাকরণ। তারাশঙ্করের কাদম্বরী। কবিকঙ্কণচণ্ডী, রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল।

সবই আছে। শুধু তিনিই নেই। পায়ের শব্দ শুনে দরজার দিকে এগিয়ে আসেন কুমুদিনী। কে এলো, কিশোর? না, দাসী এসেছে। খবর এনেছে কিছু?

দাসী বললে,—হুজুরণী, সন্ন্যাসী-লালু এসেছেন। বলছেন আপনার সাক্ষাৎ চাই। কি কথা বলবেন।

লালমোহন আসল নাম। আদরে 'উ' প্রত্যয়ের নিমিত্ত লালু নামকরণ। বিশেষণ 'সন্ন্যাসী' কথাটি আরও কয়েকজনের থেকে ব্যতিক্রমের কারণে লালমোহনের নামের আগে সকলে ব্যবহার করে থাকেন। কারণ, আরও কয়েক জন লালমোহন আছেন। যথা,—কাণা-লালু, মোটা-লালু ইত্যাদি, তাই সন্ন্যাসী-লালু। ইনি নাকি সর্ব্বত্যাগী।

সাক্ষাৎ-প্রার্থীর নাম শুনে কুমুদিনীর কপালের স্বল্প রেখা কয়েকটি নতুন ক'রে ফুটে উঠলো যেন। স্বগত করলেন,—তিনি এ সময়ে কেন? বৈঠকখানায় বসাতে বল তাঁকে। আমি ভেতর থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলবো। আর বিনোদাকে বল আমার গায়ের কাপড়খানা যেন দিয়ে যায়।

বিনোদা আরেক দাসী। বধূ-বেশে যখন এ বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করেন কুমুদিনী তখন তাঁর পিত্রালয় থেকে সঙ্গে এসেছিল বিনোদা। দক্ষিণের বাসিন্দা। কুমুদিনীর আশৈশবের সহচরী বা পরিচারিকা যা-ই বলা যাক্ না কেন।

লাল রঙের চেলী। এক রাশ শ্মশ্রু, মাথার জটাজুট কেশ পৃষ্ঠে লম্বমান। বাতির অল্প আলোয় ভয়ঙ্কর ব'লে মনে হয় যেন। জাফরির পেছন থেকে কুমুদিনী বলেন,—আমি এসেছি। আদেশ করুন।

—জয়স্তু! আমিও এসেছি।

বৈঠকখানার হল-ঘরে কথা ক'টির ধ্বনি ভেসে উঠলো। ভাঙ্গা কাঁসরের মত ভাঙ্গা স্বর। তিনি আবার কথা বলেন,—কাছাকাছি কেউ নেই তো? গুটিকতক কথা তোমাকে বলব মা।

কুমুদিনী ভয়ে আর আশঙ্কায় বলেন,—আজ্ঞে না, তেমন কেউ নেই। আপনি বলুন।

তিনি বললেন,—গেল মঙ্গলবার কালীঘাটে গেছলাম। এই আজ ফিরছি। ফেরবার পথে দেখলাম তোমার ননদের ওখানে তোমাদের জুড়ী। মনে করলাম, মা বুঝি সেখানে গেছেন। সইসকে শুধোলাম, তা বললে,—না মাইজী নয়, খোদ্ কর্ত্তা।

খানিক থামলেন তিনি। জিরেন নিলেন যেন।

এতক্ষণে যে কথাগুলি তিনি বলেছেন তাতেই সব কিছু অনুমান করেছেন কুমুদিনী। ঠাকুরঝির বাড়ীতে যখন কিশোর রয়েছে তখন সব কিছু যেন দেখতে পেলেন চোখের সমুখে। দেখলেন, তাঁর ছেলে সেখানে কি করছে। যতই হোক জননী। কালীঘাটের নাম শুনে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করলেন কালিকার উদ্দেশে।

কুমুদিনী বললেন,—আমি ঠাওরেছিলাম কিশোর ওখানেই আছে। আপনি আর কষ্ট করবেন না। আপনার শরীর পথের কষ্টে ক্লান্ত। আপনি বাড়ী চ'লে যান।

সন্ন্যাসী হাসতে শুরু করলেন হো-হো ক'রে। বললেন,—ঘর তো আমার নেই মা! যাব এখন শ্মশানে। নিমতলায়। আজ চতুর্দ্দশী,

কাল পূর্ণিমা। ঐখানেই এ ক'দিন ক'রাত্তির আসন নেবো। সন্ন্যাসী হঠাৎ থেমে গেলেন কথার মাঝে। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন,— তা মা, খোদ্ কর্ত্তা যদি এখন থেকে তার পিসীর ছেলেগুলির সঙ্গে মেলা-মেশা করতে থাকে তা হলে মা আমার বড় আপত্তি আছে।

কুমুদিনী বললেন,—হ্যাঁ, আমিও মানা করি। যায়ও না বড় একটা। এই আজকেই গেছে। আমি ব্যবস্থা করছি। আপনি কি এখন জলপান করবেন ?

সন্ন্যাসীর কণ্ঠ স্তিমিত হয়ে আসে যেন। বলেন—তা করব মা। এক পাত্র পানীয় জল, আর কিছু নয়। আরেকটি নিবেদন ছিল, যদি গোটা দুই টাকা দান করতেন! মা, কারণের জন্য চাইছি। কারণ পান করব। আমার ঝুলি একেবারে শূন্য।

কুমুদিনী বললেন,—আপনি অপেক্ষা করুন। আমি ভেতরে গিয়ে ব্যবস্থা করছি।

সন্ন্যাসী অনুমান করলেন, শ্রোতা অন্তর্ধান ক'রেছেন। বৈঠকখানার দেওয়ালে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন। আর বলতে থাকলেন আপন মনে,—কোথায় বড় বাবু, মেজ বাবুই বা কোথায়, কৃষ্ণকান্তই বা কোথায় চলে গেল! কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

দেওয়ালে ঝুলছে সারি সারি তৈলচিত্র। কাঁচা হাতের আঁকা, কোন রকমে মানুষগুলিকে যেন চেনা যায়। কতক ঠিক, কতক একেবারে বেঠিক। সন্ন্যাসী নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকেন কৃষ্ণকান্তের পানে। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীর সতীর্থ। হাতীবাগানের টোলে পড়তেন দুজনে একসঙ্গে। কৃষ্ণকান্ত ন্যায় পড়তেন, লালমোহন ন্যায় শেষ ক'রে অন্য পথে গেলেন। তন্ত্রমন্ত্রের পথ। কৃষ্ণকান্ত যৌবনেই চলে গেলেন এ ধরাধাম

ত্যাগ ক'রে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বুকের পাঁজর ভেঙে গেল। তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল অকালে।

একটা তাঁবেদার একটা ট্রে হাতে নিয়ে হঠাৎ আবির্ভাব হ'ল। মিছরির জল এক পাত্র আর দু'টি রৌপ্য মুদ্রা ট্রের 'পরে। তাঁবেদার বলে,—হুজুরণী পাঠালেন।

সাদরে গ্রহণ ক'রে উঠে পড়লেন সন্ন্যাসী। যেতে যেতে বললেন, —মা, তারা, ব্রহ্মময়ী! একটা ছোট-খাটো জাহাজ যেন অন্ধকারে সাঁতরে চললো। তাঁবেদার শুধু অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ফ্যাল্‌ফেলিয়ে!

পিসীমা।

যাঁর কাছে গেলেই পান আর জর্দার একটা অদ্ভুত সুগন্ধ পাওয়া যায় আর শোনা যায় মিষ্টি-মিষ্টি কথা, কিশোরের সেই পিসীমা। যেমন রঙ তেমনি গড়ন। রাশি রাশি কুঞ্চিত কেশ। পান খাচ্ছেন, হাসছেন আর কথা কচ্ছেন সদাক্ষণ। কেদারায় বসে বসে হুকুম কচ্ছেন, কাজ তামিল হয়ে যাচ্ছে। পিসীমা আপন রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। কিশোরের পিসীমা; কৃষ্ণচরণের সহোদরা, কুমুদিনীর ঠাকুরঝি। হেমনলিনী। ফরাসডাঙ্গার জরদ-পাড় সাড়ী, কল্কি-ঢাকা লেসের জামা, পায়ে নক্সা-আঁকা ভেলভেটের চটি। হেমনলিনী কিশোরকে বড় স্নেহ করেন। পিতৃহীন বালক, তাই নিজের ছেলেদের মত মনে করেন কিশোরকে।

সেবার নাকি জরির কলম এনে দিয়েছিলেন পিসীমা। পেতলের দোয়াত। কাশী থেকে। রুপালী জরির ছড়ি। নীল বনাতের খাপে রাঙতা-মোড়া সোনার তরোয়াল। কাঠের ব্যাট-বল, ঘূর্ণী, ঘোড়া, হাতী, উট, বাঘ আর সিংহ।

কুমুদিনী বলেন,—কিশোর, পিসীমা যে এত সব দিচ্ছেন, তার ঋণ তোমাকে পরিশোধ করতে হবে।

কিশোর হাসে। বালকের হাসি। ঋণ কথাটার অর্থ বুঝতে পারে না। হেমনলিনী বলেন,—কি যে বল বৌরাণী! কিশোর আর আমার জহর-পান্নায় তফাৎ আছে?

জহরলাল আর পান্নালাল। হেমনলিনীর দুই বংশধর। প্রায় কিশোরের সমবয়সী। তাদের মাথার ওপর পিতা বর্তমান। হেমনলিনীর স্বামী। শিবচন্দ্র বাবু। ইট-খোলা করেছিলেন হাওড়ায়। আর্মানী পাড়ায় খান-চারেক কুঠি তুলেছেন। ওপরওয়ালাদের সাথে মেলা-মেশা ক'রে আরও যে কত কি করেছেন সে-কথা শিবচন্দ্র বাবু কা'কেও প্রকাশ করেন না। মাথার মধ্যে সব রেখে দেন। তিনি বলেন কিছু করেন না, ক'রেও কিছু বলেন না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই শুধু যা একটু গৃহত্যাগী হন। চৌরঙ্গী থেকে বিলীতি মদের বোতল কিনে নিয়ে সিমলের দিকে কার কাছে নাকি যান। কেন যে যান তাও কেউ সঠিক জানে না।

যাত্রাকালে বদল করেন বেশ। তাতেই সকলে অনুমানে বুঝতে পারে শিবচন্দ্র বাবু সিমলের দিকে চলেছেন। আদ্দির বুটিদার পাঞ্জাবী, বাহান্ন ইঞ্চির চুনট-করা শান্তিপুরী কাঁচির ধুতি, চীনে-বাড়ীর অর্ডারী লপেটা। মাথায় সোজা সিঁথি, কানে আতর, হাতে হাতীর দাঁতের ইষ্টিক্। ভুরভুরে সুবাস সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসেন। বগী-গাড়ী। কোন দিন পকেটে থাকে শত শত টাকার কারেন্সী নোট, কোন দিন বা এক জোড়া হীরের বালা, নয় তো মুক্তোর ঝুমকো কিংবা হীরে-পান্নার মামতাসা।

কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। কারণ, শিবচন্দ্র বাবু যা করেন তা নাকি নিজের টাকায় করেন। তাই কাকেও বড় তোয়াক্কা করেন না।

মাঝে মাঝে কুমুদিনী নিষেধ করেন ছেলেকে।—বেশী যেও না পিসীমার ওখানে। আবহাওয়া বড় খারাপ। জহর-পান্নার সঙ্গে মিশবে না। ওদের সঙ্গ পেলে তুমিও নষ্ট হয়ে যাবে।

সেই সেখানেই গেছে কৃষ্ণকিশোর। অন্য কোথাও যায়নি এই রক্ষা। কুমুদিনী সন্ন্যাসীর কথায় খানিক আশার আলোক দেখতে পেয়েছেন। যা ভেবেছেন তা নয়। কোন যা-তা জায়গায় হয়তো সে যায়নি, গেছে পিসীর ওখানেই।

কিন্তু সেখানে শুধু যদি পিসীমা থাকতেন তা হলে আপত্তির কিছু ছিল না। শিবচন্দ্র আছেন, আর আছে তাঁর দুই গুণধর—জহরলাল আর পান্নালাল। যেন জগাই আর মাধাই। কৃষ্ণকিশোরের সমবয়সী।

এই বয়সেই এত!

হ্যাঁ, এই বয়সেই। কৈশোরের শেষ আর যৌবনের শুরু। গোঁফে রেখা ফুটেছে কি ফোটেনি। জহর-পান্নার নামে পাড়ার লোকের চোখ কপালে উঠে যায়। দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করে তারা—যাদের প্রতিবাদের উপায় নেই তাদের। যারা মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দিতে পারে অথচ মারতে পারে না তাদের। জহর-পান্নার হাতে ক্ষমতা, লোকে তাই ভয় করে ভীষণ। কানাঘুষোয় যদি কোন প্রতিবাদীর নাম শুনতে পায়, জহর-পান্না একসঙ্গে সাধারণ্যে ঘোষণা করে দেয় তার উদ্দেশে,—বলিস্, ধড়ে আর মাথা থাকবে না! গায়ের চামড়া তুলে নেবো! বাঁশ-ডলা ক'রে মেরে ফেলব।

ঘোষণা হুঙ্কারের মত শোনায়।

কৃষ্ণকিশোর গেছলো মনের কথা দু'দণ্ড কইতে। অনুরাগী মন না পেলে মন খুলে কথা বলা যায়? কিশোর তাই আজন্মের সঙ্গীদের মন

জানতে গেছল। কি করবে তারা, কোন্ পথে যাবে। টোল পাঠশালায় পড়বে, না মহাবিদ্যালয়ে পড়বে। টুলো পণ্ডিত হবে, না রাজার ভাষা শিখে ফিরিঙ্গী আদব-কায়দায় গড়ে উঠবে?

জহর আর পান্না তখন সবে মাত্র বাড়ী ফিরেছে। বিকেল বেলায় পাড়া ঘুরতে বেরিয়ে কোথায় জমে গেছল নাকি। বুলবুলির লড়াই হচ্ছে কোথায়, সেখানে। বাড়ী ফিরে বন্ধুকে দেখতে পেয়েই পান্না চিৎকার করে উঠলো,—আরে কিশোর, তুই?

কৃষ্ণকিশোরের মুখ এখনও গম্ভীর। বললে,—পণ্ডিতটা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। কয়েদ রাখে, অপমান করে, আবার বলে কিনা লেখাপড়া আর হবে না।

জহর সহানুভূতির স্বরে বলে,—বল্-না এক দিন শালাকে দিই দু'-চার ঘা। কলকাতা থেকে ভাটপাড়ায় পাঠিয়ে দিই।

কৃষ্ণকিশোর সে কথায় সায় দেয় না। বলে,—না, তার দরকার নেই। আমি ঠিক করেছি মিশনারি স্কুলে ভর্ত্তি হব। তোরা কি বলিস?

জহর-পান্না প্রায় একসঙ্গেই বলে,—তাহলে ভাই আমাদের সঙ্গে তোমার বনবে না। মিশনারিদের কাছে প'ড়ে তুমি হবে সায়েব। আমাদের গায়ত্রী জপ না করলে মা খেতে দেয় না, তোমার জানা আছে। সুতরাং—

কৃষ্ণকিশোর হাল ছাড়ে না। বলে,—মিশনারি স্কুলে পড়লেই যে সাহেব হয়ে যাব তার কি মানে আছে?

বন্ধুরা এ কথার উত্তর দেয় না। হয়তো খুঁজে পায় না কোন কথা। একটা উজবুক টানা-পাখা টানছিল দালানের বাইরে বসে। জহর তাকে বললে,—যা, মাইজীকে ব'লে আয় কিশোর এসেছে।

পাখা থেমে গেল। ফরাসের 'পরে হাতের কাছে ডিপে ছিল পানের। রূপোর একটা হাঁস। দু'পাশের ডানা খোলা। ভেতরে পান, দোক্তা,

জর্দ্দা, যষ্টিমধু। পর-পর চারটে পান মুখে পুরলে পান্না। জহর গোটা পাঁচেক। চিবোতে চিবোতে বললে জহর,—থাম্, পড়াশুনোর গল্প এখন রেখে দে। সারা দিন পরে যদি লেখাপড়ার কথা কইতে হয় তা হলে আমার চোখে যেন ঘুম আসে।

পান্না বলে,—তাই না তাই.। আমার যেন জ্বর আসে। বল্ এখন, কবে নাচ দেখতে যাচ্ছিস্?

কিশোর বললে,—কি নাচ? কার নাচ? কোথায়?

পান্না হাসে। অর্থপূর্ণ হাসি। বলে,—আহা, কচি খোকা আমার! চল্ না একদিন দেখিয়ে আনি।

কিশোর বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে বলে,—কোথায় তাই বল্ না!

জহরের মুখে পানের পিক। তবুও কথা বলে।—এই কাছেই। কলুটোলায়। একটা মুসলমান বাইজীর সন্ধান পেয়েছি।

পান্না বলে,—যেমন গায় তেমনি রূপ। এমন খুবসুরৎ মাল যে দেখলে তোর লেখাপড়া মাথায় উঠে যাবে।

জহর বললে,—তবে পাওনাটা যা একটু বেশী।

এমন সময় হেমনলিনীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ভেতর থেকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন।—কিশোর এসেছিস, বেশ করেছিস। আয়, অন্দরে আয়।

নিশ্বাস্ ফেলে বাঁচে যেন কিশোর। ভাল লাগে না তার এই প্রসঙ্গ। নৃত্যকলায় রস পায় না। পিসীর ডাক শুনে উঠে যায়। বলে,—চুপ চুপ পিসীমা আসছেন।

হেমনলিনী তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেন। কপালে চুমা খেয়ে বলেন —এমন অসময়ে কেন বাছা? বাড়ীর খবর ভাল তো? মা?

কিশোর বলে,—হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে এলাম।

হেমনলিনী হাসতে হাসতে বলেন,—বেশ করেছিস। আজ রাত্তিরে খেয়ে কাল সকালে যাবি। আমি বলে পাঠাচ্ছি বৌরাণীকে।

পিসীমার বাড়ীর ইটগুলো পর্য্যন্ত কিশোরের পরিচিত। ছেলেবেলায় কত দিন আর কত রাত সে হেসে-খেলে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে যায় এ বাড়ীতে। কিশোর এলে পিসীমা নিজে উনুনের ধারে যান। এটা-সেটা তৈরী করেন। বড়বাজার থেকে সর-ভাজা, কুমড়োর মেঠাই, ঝুরি-ভাজা, বুড়ীর মাথার পাকা চুল, আমসত্ত্ব, আমলকীর আচার আনিয়ে কিশোরকে নিজের হাতে খাইয়ে দেন। কত গল্প বলেন, কত রূপকথার কাহিনী শোনান। কিশোরের যখন ঘুম পায় তখন পাশে শুয়ে কত ছড়া বলেন। একটা ছড়া কিশোরের একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। কত সময়ে নিজের মনে কিশোর নিজেই বলতে থাকে—

আয় ঘুম আয়, আমার খোকার চোখে আয়।
বাংলা দেশের আকাশ বয়ে আলোক চলে যায়।
সেই আলোতে ভেসে ভেসে চাঁদের হাসি ধরে,
ফুরফুরে ঐ বাতাস এলো, পাতার কোলে সরে।
বাংলা দেশের এমন বাতাস, এমন চাঁদের হাসি;
আর কোথা নাই—আমরা সবাই বড় ভালবাসি!
তুমিও যাদু বড় হলে বাংলা ভালবেসো;
বাংলার দুখে কেঁদো খোকা, বাংলার সুখে হেসো।

কিশোর আর থাকতে পারলে না। বলে ফেললে,—মাকে না বলে চলে এসেছি। আমি, পিসীমা, পণ্ডিতের কাছে আর পড়ব না। আমি মিশনারি ইস্কুলে পড়ব। পণ্ডিতটা—

হেমনলিনী তার কথা শুনে মিটি-মিটি হাসেন। বলেন,—বেশ তো, তোর যেখানে ইচ্ছে হবে পড়বি। তা আর বেশী কথা কি! বৌরাণী কি বলছে?

কিশোর বললে,—মাকে এখনও বলিনি।

হেমনলিনী বুঝতে পারেন একটা কিছু ঘটেছে। বলেন,—সে কথা পরে হবে'খন। তুই এখন থাক্ এখানে রাত্তিরটা।

চাঁদের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল কারা যেন আসছে এক দল। হেমনলিনী অন্দরের জানলা থেকে দেখেন। কারা আসছে ওরা! এমন তরতরিয়ে। ফটক পেরিয়ে ভেতরে।

একটা পাল্কী আসছে। বেয়ারাদের একটা চাপা কোরাস শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কি বলছে কে জানে!

হেমনলিনী বললেন,—স্থাখ, তোর মা বোধ হয় লোক পাঠালে কিশোর। না বলে-কয়ে আসতে আছে?

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। পাল্কীতে ম্যানেজার বাবু এসেছেন। কুমুদিনী পাঠিয়েছেন। ব'লে পাঠিয়েছেন,—কিশোর যেন আজ রাত্তিরেই যায়। পিসীমা যদি খেয়ে যেতে বলেন সে-কথার যেন অমান্য করা না হয়।

ইতি-উতি কি সব ভাবলেন হেমনলিনী। বললেন,—হ্যাঁ, তাই যাবে। খেয়েই যাবে।

ম্যানেজার বাড়ী ফিরে গেলেন। কিশোর পিসীমার হাত ধরে অন্দরের দিকে চললো। খেতে চললো ভাল-মন্দ।

ছেলে রাত্তিরেই আসবে শুনে কুমুদিনী শান্ত হলেন। আহারাদি আর করলেন না। শয্যায় শুয়ে পড়লেন। বড় ব্যথা পেয়েছেন তিনি। বড় অপমান বোধ ক'রেছেন। ফটকের পাশে ঘড়ি-ঘর। ঢং-ঢং শব্দে দশটা বাজলো।

পুত্রকে যথার্থ মানুষ করতে চাও তো তাকে স্বাবলম্বী কর'। ষোড়শ বর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রের ন্যায় ব্যবহার কর' তার সঙ্গে। সে যে পরমুখাপেক্ষী নয়, সে যে বড় হয়েছে, সে যে এখন আপন বিবেকের নিয়ন্ত্রণে—সে কথা বুঝিয়ে দাও তাকে। স্বীকার কর' তার অস্তিত্ব, তার সত্তাকে।

সে যে এখন শুধু পুত্র নয় মিত্র—এই শাস্ত্রোপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন কুমুদিনী। কৃষ্ণকিশোরের ষোলো শেষ হয়েছে। ছেলের ঘর তাই আলাদা, সকল বন্দোবস্তের ভার তার নিজের হাতে। নিত্য-প্রয়োজনের যত কিছু তারই ইচ্ছাধীন।

কিন্তু ছেলে যে এমন পাঠে বিঘ্ন ঘটাবে তা কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছেন কুমুদিনী। এত বড় বংশের উত্তরাধিকারী, ব্রাহ্মণের সন্তান—সে উপেক্ষা করবে বংশ-গৌরব! ইংরেজী শিক্ষার ধারায় সমুদ্রপারের সভ্যতা হবে তার অলঙ্কার। বিদ্যা পুরুষের ভূষণ—কৃষ্ণকিশোর গয়না পরবে বিলীতি। ইংরেজীতে কথা বলবে আর ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখবে! খাবে যত অখাদ্য-কুখাদ্য। বৌ ক'রে ঘরে আনবে বিলীতি বিবি!

তাও যদি দিন-কাল ভাল হ'ত।

দেশের মানুষ যদি মানুষ থাকতো। কোথা থেকে যে কি এক জোয়ার এসেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বাঙলার নগরে উপনগরে জমায়েৎ হয়েছে বিধর্মীর দল, কিসের প্রলোভন দেখাচ্ছে আর দেশের লোক সেই যাদুমন্ত্রে বিলকুল সব কিছু ভুলে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে জোয়ারের বেগে। আপন ঘর-বাড়ী, সমাজ-সংসার, ধর্ম্ম-সংস্কার, এমন কি আপন পিতা-মাতাকে পর্য্যন্ত চিনতে পারছে না সেই মন্ত্রের ঘোরে। পুরাণের কৃষ্ণকে ত্যাগ ক'রে আসক্ত হচ্ছে সেই দূর জেরুজালেমের ইহুদী খৃষ্টের প্রতি। হাতের কবচ-কুণ্ডল ফেলে বুকে তুলছে ক্রুশের চিহ্ন।

ঘর অন্ধকার।

ভবিষ্যৎও গভীর অন্ধকারে। কুমুদিনী উঠে বসলেন শয্যায়। একটা অস্বাভাবিক বেদনার জ্বালা সর্বাঙ্গে, ঘুম আসছে না। ভেঙ্গে গেছে যেন চিরকালের মত। খোলা জানলার বাইরে অসীম আকাশ। আসমানী ওড়নায় সোনালী জরির চুমকি। জ্বলছে ধিকি-ধিকি। ওড়নার আবরণে সুপ্ত মহানগরী কলকাতা। চাঁদ যে কোথায় চোখে পড়ে না, শুধু তার আলোয় দিগ্বিদিক্ আলোকময়। ভ্রম হয় রাত নয়, বুঝি দিন।

হঠাৎ কাকের ডাক শুনে কেমন যেন মনে হয় কুমুদিনীর। মনে হল, রাত্রি আর নেই। বোধ হয় ফর্সা হয়েছে। কাক ডাকছে তাই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি শেষ হবে এই বিনিদ্র রজনী! আকাশে এখনও এত তারা থাকবে! শুকতারা থাকবে তো শুধু। কৈ? কুমুদিনী ভুল বুঝতে পারেন। দুশ্চিন্তায় মন তার ভারাক্রান্ত। তাকিয়ে থাকেন ঐ আকাশের দিকে। বাইরে ফুটফুটে কাক-জ্যোৎস্না।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টায় ঘা পড়ে।

থমথমে জ্যোৎস্না প্রতিধ্বনিতে কাঁপতে থাকে বুঝি। কান পেতে থাকেন কুমুদিনী। দু'টো বেজে গেল। এখনও অনেক দেরী। তার অনেক বাকী, যখন মেঘ রাঙিয়ে সূর্য্য উঠবে পূবাকাশে। তমসা লুপ্ত হবে ধীরে ধীরে। ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেবে শুভ্রতা। তামসিকতা ঘুচে আসবে সাত্ত্বিকতা। তার পর আসবেন অশ্বরথে সূর্য্যরাজ। ঝলমলে আলোয় হেসে উঠবে পৃথিবীর এক ভাগ। চোখ মেলবে পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ।

একবার ঘুমোলে আর কি জ্ঞান থাকে।

কৃষ্ণকিশোর তখন নিদ্রায় অচেতন। একেই ফিরতে দেরী হয়েছে

পিসীমার বাড়ী থেকে। অন্য দিন সাড়ে আটটার মধ্যে বিছানায় যায়, আজ দশটা বেজে যাওয়ার পর বাড়ী ফিরেছে। এসেছে আর শুয়েছে। জানে না কোথা দিয়ে কি হয়েছে। জানে না কুমুদিনীর বুকে কিসের তুফান উঠেছে। কোন্ আশঙ্কায় জেগে বসে আছেন তিনি। বিনিদ্রায় রাত্রি-যাপনের সামর্থ্য নেই কৃষ্ণকিশোরের। বয়সও ঠিক নয়। জানেও না যে কিসের তাড়নায় রাত্রি জাগতে হয়। কেন জাগে মানুষ। সুখের রাত আর দুখের রাত। অনেক পুণ্যের আর অনেক পাপের। কারও বা হাসির, কারও বা কান্নার।

কিন্তু ঘুমের ঘোরেও এমন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে কেন?

মনের ঝড়, না অন্য কিছু। সত্যি সত্যিই গাড়ীতে ফেরবার সময় ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে ছেলের মনে প'ড়েছে মাকে। না বলে চলে যাওয়ার অপরাধে কুমুদিনীর ব্যথাতুর মুখখানা। তাঁর স্নেহ, সোহাগ, শাসন একে একে সব মনে পড়ে গেছে। কোচমানকে আবদারের সুরে বলেছে,—আবদুল, হেঁকে চালাও না।

কৃষ্ণকিশোরের ঘুমে-ঢুলু-ঢুলু চোখও তখন নিক্তির কাঁটা যেন দেখতে পেয়েছে। স্নেহের দিক ভারী, শাসনের পাল্লায় প্রায় শূন্য।

কুমুদিনী শাসন করেন, পীড়ন করেন না। ক্রোধের মাত্রাধিক্যে শাসনের লেশও থাকে না। তখন যত রাগ হয় নিজের 'পরে। সত্যাগ্রহীর মত অনাহারে থাকেন। জলস্পর্শ করেন না। যেমন আজ করেছেন।

যার প্রতি এই অভিমান সে হয়তো আভাসেও জানতে পারে না। সে তখন ঘুমিয়েই কাতর। সে এত-শত বোঝে না। বোঝালে বুঝতে পারে। তখন ছুটে যায় মা'র কাছে। বলে,—ঠিক বলছি, আর কখনও এমন হবে না। তুমি খেতে বসবে চল।

আজ আর ডাক আসে না। ছেলের মঙ্গলের জন্য তবুও কুমুদিনী

চোখ দু'টি বন্ধ ক'রে প্রার্থনা করেন ঈশ্বরের কাছে। ঘরে তিনি একা, তাই আর মনে মনে নয়। বিড়-বিড় করেন,—ভগবান, মতি-গতি ফিরিয়ে দাও ছেলের। সব ভেসে যেতে দিও না। তোমার দেওয়া এ বংশের লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন! তুমি এমন হতে দিও না, দোহাই।

এ আরাধনা লোককে দেখিয়ে জানিয়ে নয়। তাই মিথ্যার সুর নেই কথায়। অন্তরের সুর। কাপড়ের আঁচলে চোখ দু'টো মুছে নেওয়ার দরকার হয় যে! এমন একবার দু'বার নয়, সারা রাতে এমন অনেক বার।

অবশেষে সূর্য্যোদয় হল। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে। মই-কাঁধে বেয়ারার দল রাস্তার গ্যাস নিবিয়ে দিয়ে গেল। কাক ডাকলো। মানুষ জাগলো। পুণ্যার্থী গঙ্গাযাত্রীর দেখা মিললো চিৎপুরের রাস্তায়। কুমুদিনী শয্যা ত্যাগ ক'রে অন্দরের পুকুরের দিকে চললেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে। পেছনে বিনোদা। তার হাতে তসরের কাপড়, গামছা, তেলের পাত্র আর গুল-পোড়া দন্তচূর্ণ।

নাটমন্দিরের পুরোহিত চন্দন ঘষতে বসেছেন। তৈজস-পত্র নাড়া-চাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভোরের হিমেল বাতাসে প্রাঙ্গণের সারি সারি ফুলের গাছ হেলছে দুলছে। স্তবকে স্তবকে ফুলের গুচ্ছ প্রাণ-চাঞ্চল্যে দোদুল্যমান। ফটকের দ্বারপালের শ্রীরামচরিতমানস পাঠের দোঁহা-ধ্বনি ভেসে আসছে মধ্যে মধ্যে। আস্তাবলের ঘোড়া চিঁহি-চিঁহি শব্দে পা ঠুকছে। পাত্র শূন্য, আহার চাই।

বিনোদা আর থাকতে না পেরে ঘাটের চাতাল থেকেই জিজ্ঞেস করলো,—কাল এতের বেলায় কিছু মুখে কাটলে না কেন শুনতে পাই?

কুমুদিনীর আবক্ষ পুকুরের জলে। জল থেকেই সহাস্যে বলেন,—কে বললে তোকে? কিশোর কখন ফিরলো রে?

বিনোদার মুখাকৃতি বিরক্ত। বললে,—দু'-দু'বার শেয়াল ডাকার পর ফিরেছে। কে আবার বলবে! আমি কি কানা, না আমার চোখ দু'টো অন্ধ হয়ে গেছে! খানিক থামে বিনোদা। বিরক্ত হয়েই বলে আবার,—নাও নাও, তাড়াতাড়ি নাও। পূজো-আচ্ছারা সেরে মুখে কিছু দাও। মুখের চেহারা হয়েছে দেখো দিকিন না খেয়ে!

এ বাড়ীতে এমন স্বরে কথা বলবার অধিকার একমাত্র বিনোদার। আর কারও নয়। কারণ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন কুমুদিনী ঐ বিনোদার হাতে। তার পর থেকে এখনও পর্য্যন্ত সঙ্গেই আছে বিনোদা। শোক-তাপ পেয়েছে অনেক, তবুও দেশে চলে যায়নি। চোখের দৃষ্টি হারিয়ে প্রায় অথর্ব্ব হয়ে পড়েছে, তবুও নয়।

কাক-স্নান নয়, অবগাহন।

শরীর যেন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি চোখ থেকে মুছে যায় যেন। কপালে শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ দিয়ে নাটমন্দিরে পূজাসনে বসেন কুমুদিনী। সমুখে রূপার কোষাকুষি, পুষ্পপাত্র আর পঞ্চপাত্র। কুমুদিনীর আসনের স্থান নির্দ্দিষ্ট। তাঁর সময়ও নির্দ্দিষ্ট। মণ্ডপের তলায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বেদ পাঠ করেন। পুরোহিত যুগল-মূর্ত্তিকে শয্যা থেকে তুলে যথাস্থানে স্থাপনা করেন। বেশ-পরিবর্ত্তন চলেছে। অর্চ্চনা শুরু হবে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে। কস্তুরী ধূপ আর ধূনার ধূম্রজালে মন্দিরের অভ্যন্তর পরিপূর্ণ। চন্দন আর টাটকা ফুলের সুগন্ধে ভোরের বাতাস ভারী।

ধীরে ধীরে সূর্য্য পূর্ণাকারে দেখা দেন। কাঁচা রৌদ্রের ছটা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দ্দিকে। যেন কাঁচা হলুদের রঙ। ফড়িঙ আর হরেক রকম প্রজাপতির নর্ত্তন শুরু হয় ফুলে ফুলে। মধুর লোভে পাখা নাচিয়ে উড়ে আসে যত মধুপায়ীর দল।

ঘরের কোণে একটা গ্রাণ্ড-ফাদারর্স ক্লক। প্রতি পনেরো মিনিটে জলতরঙ্গের শব্দে সময়ের গতি জানিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে প্রবল ইচ্ছা হয় কৃষ্ণকিশোরের, একবার খুলে দেখে কোথায় এই মিষ্টি সুরের উৎস। কোন্ অদৃশ্য হাত জলতরঙ্গ বাজায়। পেতলের লম্বা পেণ্ডুলাম পাশাপাশি তিনটে পেতলের চেনে ঝুলছে। আর, সময় নেই অসময় নেই দুলছে সদাক্ষণ।

এ যেন চার্চ্চের বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরের আরাধনার সুর শোনার মত। টুং-টাং শব্দে পিয়ানো বাজে ভেতরে। এমন মিষ্টি হাতে কে বাজায় কে জানে! শোনা যায় নাকি এক ঝাঁক পরীর মত মেয়ে, গোলাপী অর্গাণ্ডির ঘাগরা প'রে পিয়ানো বাজাতে বসে। প্রার্থনা-সঙ্গীতের সুর। কৃষ্ণকিশোর কত দিন বেড়াতে বেরিয়ে চার্চ্চের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছে। উঁকি মেরে দেখেছে ভেতরের দিকে, ঝাড়ের গেলাসে জলন্ত মোমবাতি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। পরীদের দেখতে পায়নি সে।

ঘরের ঐ ঘড়িটার শব্দেই ঘুম ভেঙ্গে যায় কৃষ্ণকিশোরের। চোখ মেলতেই মনে পড়ে গতকালের ঘটনা। কাল সেই বিকেল থেকে এখনও সে মাকে দেখেনি। দেখা দেয়নি নিজেকে তাঁর কাছে গিয়ে। কি একটা অন্যায় হয়ে গেছে যেন, মাকে না ব'লে সে চলে গেছে পিসীমার বাড়ী।

—জহর-আর পান্নার সঙ্গে তুমি মিশবে না!

কুমুদিনীর এই নিষেধ বাক্য উদ্ধত শব্দে কানে বাজতে থাকে কৃষ্ণকিশোরের। এই একটা কথাই কত দিন বলেছেন কুমুদিনী। শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাঁর নিষেধ তবুও সে অমান্য করেছে। ভয় আর উত্তেজনায় বিছানায় চুপটি ক'রে বসে থাকে কৃষ্ণকিশোর।

পোষা-কুকুরটা ঘরের ভেতর পালঙ্কের চতুর্দ্দিকে লেজ দুলিয়ে ঘোরাঘুরি

করে। তার এখন ইচ্ছা, প্রভুর সঙ্গে প্রাত্যহিক প্রাতর্ভ্রমণে যায়। প্রভুর মন যে আজ তেমন খুশী নেই, সে কি জানে? অন্যায়ের অনুশোচনায় প্রভু আজ অনুতপ্ত, তা কি সে বোঝে? কৃষ্ণকিশোর সব ভুলে গিয়ে এখনই হাসতে পারে মাত্র একজনের হাসিমুখ দেখে। কিন্তু কুমুদিনী কি এত সহজে হাসবেন? মা কি ভুলে যাবেন ছেলের অপরাধ? আর কখনও এ অন্যায় হবে না, তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন হলেও কৃষ্ণকিশোরের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কুমুদিনীর রাগ হলে তিনি যে কথা বন্ধ ক'রে দেন। কোন্ সাহসে কথা বলবে কৃষ্ণকিশোর। পৃথিবীতে যদি তার ভয় পাওয়ার কোন বস্তু থাকে, সে ঐ মৌন ও গম্ভীর কুমুদিনী—তার স্নেহময়ী মা। আর কেউ নয়। আর কিছু নয়।

কখনও তিনি ছেলের গায়ে হাত তোলেননি। কিন্তু গায়ে হাত উঠুক, তাই যেন সমীচীন মনে হয় কৃষ্ণকিশোরের। এর চেয়ে তাই ভাল। অবিরাম গাম্ভীর্য্যের চেয়ে অনেক লঘু সে শাস্তি। কিন্তু কুমুদিনীর নীরবতা সহসা ভঙ্গ হওয়ার নয়।

জলতরঙ্গ আবার বাজতে শুরু হল।

কৃষ্ণকিশোর দেখে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে গেছে যেখানে ছিল সেখান থেকে। সওয়া সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার ঘরে। সময় যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল তার প্রাতর্ভ্রমণের। কুমুদিনীর নির্দ্দিষ্ট সময়। সাড়ে ছ'টায় শয্যাত্যাগ করবে, তার পর প্রাতঃকৃত্য সারবে, সাড়ে সাতটায় যাবে প্রাতর্ভ্রমণে। তার পর বাড়ী ফিরে দুধ, জলখাবার খেয়ে পাঠে বসবে। স্নানাহার সেরে এগারোটায় যাবে পাঠশালায়। তার পর—

মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতেই চোখ খুললেন কুমুদিনী।

বিনোদা পেছন থেকে বলে—জপ হল তোমার? পণ্ডিত মশাই

এসে বসে আছেন যে। আসতে বলেছিলে তাই এসেছেন এই সাত-সকালে।

কুমুদিনী বলেন,—হ্যাঁ। আগে তাঁকে খাবার পাঠাতে বল ব্রাহ্মণীকে। ছানা, মিষ্টি আর ফল খাবেন তিনি। অন্য কিছু যেন না দেওয়া হয়। আমি জপ সেরেই আসছি। কিশোর কোথায়? কিশোর উঠেছে?

মুখে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে আবার চক্ষু মুদিত করেন কুমুদিনী। বিনোদা বিরক্ত হয়ে বলে,—না, তিনি আজ এখনও ওঠেননি। পিসীর ছেলেরা কাল কিছু খাইয়ে দিয়েছে কিনা দেখো। নেশা হয়তো কাটেনি এখনও।

কুমুদিনী কিছু বললেন না। চোখ খুলে একবার তাকালেন মাত্র। ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। কপালে ফুটে উঠলো কয়েকটি রেখা। বিনোদা বুঝলো তার কথাগুলো বলা অন্যায় হয়নি, বলবার মত যথা স্থান এ-জায়গা নয়। নাটমন্দির নয়।

সদরের দালানে বসেছিলেন পণ্ডিত মশায়।

মহলের লোক-জন আর প্রজাদের জন্য দেওয়ালের ধারে কাঠের বেঞ্চির সারি। বৈঠকখানার ঘরে ফরাসের বিছানা। পণ্ডিত মশায় ফরাসে বসেন না উচ্ছিষ্টতার কারণে। তাই কাষ্ঠাসনে বসে আছেন। খিলানে পায়রার পাল বকম বকম করছে। পণ্ডিত মশায়ের কণ্ঠে সুরের গুঞ্জরণ। গুন-গুন শব্দে আবৃত্তি করছেন পূর্ব্বাকাশে চোখ মেলে। নবোদিত সূর্য্যের দিকে স্থিরদৃষ্টি। চোখের পলক পড়ছে না। দিবাকরের প্রথম রশ্মি চক্ষুর পক্ষে উপকারক ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক। প্রত্যহ প্রভাতে তাই প্রথম আলোর কাজল চোখে মাখেন পণ্ডিত মশায়। এ তাঁর দৈনন্দিন রীতি। ছাত্র-জীবনের অভ্যাস।

পাঠ এবং লিপিকার্য্যে জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন। চোখের দৃষ্টি হারালে চলবে না। জীবন ধারণের জন্য জ্ঞানের পথ। যদি অন্ধকার হয়ে যায় সে-পথ, তখন আর উপায়ান্তর থাকবে না যে! আর স্বয়ং গুরু যদি হন অন্ধ, পথ দেখাবেন কোন্ উপায়ে?

তাই দিনে সবিতৃ আর রাত্রে তৈল-প্রদীপের সাহায্যে এই পঞ্চাশোত্তরেও তাঁর দৃষ্টি আছে অক্ষয়। অপলক নেত্রে চেয়ে আছেন তিনি। কণ্ঠে তাঁর 'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং' মন্ত্রের ঘন-ঘন পুনরাবৃত্তি।

এ বাড়ীর রীতি-নীতি, আইন-কানুন, আদব-কায়দা অজানা নেই পণ্ডিত মশায়ের। ছাত্র কৃষ্ণকান্তর পিতা কৃষ্ণচরণ ছিলেন বিদ্যার বৃহস্পতি। পণ্ডিতের শিরোমণি। সংসার ত্যাগ করেননি, পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য্যে শিক্ষকতাও করতে হয়নি—তবুও গৃহী কৃষ্ণচরণ জীবিতাবস্থায় জ্ঞানান্বেষণের প্রবল তৃষ্ণায় এত অধিক পান করেছিলেন যে, বহু খ্যাতিমান বিদ্বানও সমীহ করতেন তাঁকে। সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা করতেন। শাস্ত্রালোচনায় বিঘ্ন ঘটলে নির্ভয়ে চলে আসতেন কৃষ্ণচরণের সমীপে। তিনি তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে দিতেন, বলে দিতেন কি শুদ্ধ আর কি অশুদ্ধ। কৃষ্ণচরণ রাজা হয়েও অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন, তাই পূজা পেয়েছিলেন এমন যে, কোন রাজা আর কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে তেমন বড় একটা জোটে না।

তাঁর উত্তরাধিকারী ঐ কৃষ্ণকিশোর!

ওষ্ঠপ্রান্তে হতাশার ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল পণ্ডিত মশায়ের। ধীরে ধীরে স্বগত করলেন চাণক্যের একটি শ্লোক। বললেন,

"শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং, মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো ন হি সর্ব্বত্র, চন্দনং ন বনে বনে॥"

যার বঙ্গার্থ হল :

সকল পর্ব্বতে নাহি মাণিক্য জন্মায়,
সকল গজেতে নাহি মুক্তা পাওয়া যায়।
সাধুজন কখন না মিলে সর্ব্ব স্থানে,
চন্দন না জন্মে কভু প্রতি বনে বনে ॥

নায়েবদের এক জন কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে পাননি পণ্ডিত মশায়। হঠাৎ দেখেও বিস্মিত হলেন না। নায়েব বললে,—ও ঘরে আপনার প্রাতরাশের আয়োজন করা হয়েছে। গিন্নীমা বলে পাঠিয়েছেন, আগে আপনি প্রাতরাশ সমাপন করুন, পূজা সেরে তিনি এসে কথা বলবেন আপনার সঙ্গে।

পণ্ডিত মশায় বললেন,—তথাস্তু। চলুন।

বৈঠকখানা-ঘরের মেঝেয় রৌপ্যপাত্রে ফল আর মিষ্টান্ন। এক পাত্র পানীয় জল। কুশের আসন। পণ্ডিত মশায় আসন গ্রহণ করে মুদিত নেত্রে বসে রইলেন খানিক। আহার্য্য উৎসর্গ করলেন হয়তো। আচমনান্তে মুখে তুললেন খাদ্যদ্রব্য। খেতে খেতে বললেন,—আপনাদের ভাবী বাবুসাহেব বোধ করি এখনও শয্যাত্যাগ করেননি ?

নায়েব সলজ্জায় দাঁড়িয়ে থাকে নত মাথায়। বলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। মহাশয়ের অনুমান বোধ করি যথার্থ। এখনও দেখছি না তো তাঁকে।

পণ্ডিত মশায় আবার হাসেন। হতাশার ক্ষীণ হাসি। বলেন,—সময়ের মূল্য এখনও বুঝলো না! অধ্যয়নের সময় প্রাতঃকালে। যে ছেলে সূর্য্যোদয় দেখতে পায় না তার কি লেখাপড়া হয়, না কখনও হয়েছে! এই বয়সেই এই, না জানি বয়স কালে কখন্ ঘুম ভাঙবে। বড়লোকের অপোগণ্ডেরা শুনতে পাই রাত্রি কালে জাগেন আর দিবায় নিদ্রা যান। Morning shows the day. Morning showeth the day.

পণ্ডিত মশায় ইংরেজ আমলের। তাই শুধু সংস্কৃতে নয়, ইংরেজীতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হয়েছে। তাই কথায় কথায় বিলেতী প্রবাদ-বাক্যের ব্যবহার ক'রে থাকেন। বাইবেলের ইংরেজীতে।

অন্দরে নয়, সদরে।

ঘর থেকে বেরিয়ে অন্দরে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ায় না কৃষ্ণকিশোর। সোজা সদরের দিকে চলে। সঙ্গে চলে তার পোষা কুকুর। তার গলার ঘন্টি ঝুন-ঝুন করে; তার পেছনে একটা চাকর। তার হাতে একটা রূপার রেকাবে একটা নিমের দাঁতন আর রূপার জিব-ছোলা। আরেক হাতে একটা তোয়ালে।

কোথা থেকে এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো বিনোদা। বললে,—মা বললে তুমি মুখ-হাত ধুয়ে বার-বাড়ীতে এসো। তোমার পণ্ডিত এসেছে। কি কথা আছে, তাই তোমাকেও থাকতে হবে।

কৃষ্ণকিশোর বিস্ময় মানে কথাগুলো শুনে। বলে,—পণ্ডিত মশাই! এসেছে! কথা আছে, আমাকে থাকতে হবে! কেন?

মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে চ'লে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায় বিনোদা। শ্লেষের হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। বলে,—কেন, তা আমি কি ক'রে জানব! কি আর কথা, তুমি বিদ্যার দিগ্‌গজ হচ্ছ দিন-দিন, তাই নিয়েই কথা আর কি! তা, গেলেই তো শুনতে পাবে।

কথার শেষে আর দাঁড়ায় না বিনোদা। চলে যায়। তার সজোর পদক্ষেপের শব্দে তাচ্ছিল্যের আভাস। মুখে বিদ্রূপের হাসি। কৃষ্ণকিশোরের সে দিকে চোখ নেই। তার যত রাগ হয় ঐ পণ্ডিত মশাইয়ের আসার কথায়। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলতে শুরু করে যেন। ইচ্ছা হয়, কিছু না হোক এয়ার-গানটা নিয়ে গিয়ে ঘোড়া টিপে দেয়

পণ্ডিতের বুকে! ইচ্ছা হয়, দ্বারোয়ানকে ডেকে বলে, লোকটাকে এখুনি—

কিন্তু কুমুদিনী—

তাঁর গম্ভীর মুখখানা মনে পড়তেই মনের যত দাপট নিবে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কৃষ্ণকিশোর ভয়ে ভয়ে এগোয়। মনে তার ঝড় উঠেছে। হঠাৎ। মেঘ না ডেকে। অতর্কিতে।

এমন মিষ্টি সকালটা বৃথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাঁচা হলুদ রঙের এমন কাঁচা রোদ্দুর। এমন মধুর ঠাণ্ডা বাতাস। গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে নানান ফুলের মেলা। দিকে দিকে এমন মধুপের গুঞ্জন। সদরের ঘরের কোলের লম্বা বারান্দাটায় যেতে যেতে একবার পাশ ফিরে তাকায় কৃষ্ণকিশোর। দেখে কাছাকাছির কিছু নয়। দেখে দূরের এক বাড়ী। দেখে তার তিন তলার বাতায়ন-পথ। দেখে, কেউ সেখানে আছে না নেই! দেখে সহজ দৃষ্টিতে নয়, ভয়ে ভয়ে, সসঙ্কোচে।

কাদের বাড়ী?

যাদের বাড়ী তাদের। এতদিন জানতো না কৃষ্ণকিশোর ওরা কে বা কারা। জানবার প্রয়োজন ছিল না। আরও তো হাজারো বাড়ী রয়েছে এ তল্লাটে। কে কার খোঁজ রাখে, কে দেখে কাকে।

কিন্তু কৌতূহল যেদিন উগ্র রূপ ধারণ করলো সেদিন আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করেনি কৃষ্ণকিশোর। খোঁজ নিয়ে জেনেছে কাদের বাড়ী। ওরা কারা। ওরা কোথাকার কে।

শুধু এই একটা সময়। সকাল বেলায়।

ঐ বাতায়ন শূন্য থাকে না। কে একজন থাকে। একেক দিন

একেক রঙে। কোন দিন সবুজ, কোন দিন ধুপছায়া, আবার কোন দিন বা শুধুই সাদা রঙ। লাল রঙের পাড়। একেক দিন একেক রঙের শাড়ী। কোন দিন মাথায় খোঁপা থাকে, কোন দিন চুল শুধু এলো নয়, একেবারে এলোমেলো। উড়ছে।

আসল রঙ চাঁপার মত। ছিমছাম গঠন। কোন দিন মুখ ভীষণ গম্ভীর, আর কোন দিন বা হাসিতে সে-মুখ পরিপূর্ণ। এত দূর থেকেও দেখা যায় তার পান-রাঙা ঠোঁটে হাসির চিহ্ন। সে হাসছে। কেন, কে জানে।

এই সব দেখে-শুনে ব্যগ্র মনে জেনেছে কৃষ্ণকিশোর। জেনেছে তার নাম, অদ্ভুত একটা নাম। এই, লতা-পাতা ফল-ফুলেরই একটা। আইভিলতা।

আজও দেখলো কৃষ্ণকিশোর। হ্যাঁ, রয়েছে। লাল রঙে। হাসছে। শুধু হাসির পাত্রই আজ অসম্ভব গম্ভীর। পণ্ডিত মশাইয়ের আসার সংবাদে ভীষণ যেন ক্ষুব্ধ। আজ আর দেখতে চায় না সে। শুধু দেখবার অদম্য বাসনায় নয়। এমনি দেখে, আছে না নেই। দেখতে দেখতে জলের ঘরের দিকে চলে যায়। স্নানের ঘরে। পেছনে পেছনে অনুসরণ করে চাকর।

• কুমুদিনী আজ আর জাফরির পেছন থেকে কথা বললেন না। সরাসরি পণ্ডিতের সমুখে এসে দাঁড়ালেন গুণ্ঠনে মুখ ঢেকে। আমলা ও পেয়াদাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এদিক পানে কাকেও যেন আসতে দেওয়া না হয়। গিন্নীমা বার-বাড়ীতে এসেছেন, কথা বলছেন পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে। কর্তার লাইব্রেরী ঘরে। বৈঠকখানার পাশে। পণ্ডিত মশায় বসেছেন একখানা কেদারায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিনোদা।

কুমুদিনী বলছেন,—কিশোরের পড়াশুনার কি করবেন? কি হয়েছে জানি না, কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করছি, মন নেই ওর পড়ায়। পাঠশালায় যেতে চায় না তেমন। বলছে নাকি মিশনারিদের ইস্কুলে পড়বে, পাঠশালায় আর পড়বে না। কিন্তু—

মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন পণ্ডিত মশায়,—তা কি বুঝতে পারিনি ভাবছ বৌঠান। বুঝেছি—সব বুঝেছি। তোমার ছেলে শেষ পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছ হতে চায় ঐ ডিরোজিওর বংশধরদের দলে নাম লিখিয়ে।

কুমুদিনীর সুরে হতাশার স্বর। বলেন,—কি হবে তা হলে? সব ভেসে যাবে?

পণ্ডিত মশায় আবার হাসেন। বিজ্ঞের হাসি। বলেন,—তাই বলছিলাম, 'শৈলে শৈলে ন মাণিক্যম্, মৌক্তিকং ন গজে গজে—'

কুমুদিনী বললেন,—তা তো আমি পারবো না! চোখের সামনে দেখতে পারবো না তো এই অনাচার!

বাইরে থেকে শুধু একটি কথা কানে পৌছয় কৃষ্ণকিশোরের। পণ্ডিত মশায় উচ্চারণ করছেন একটি কথা। একজনের নাম।

ডিরোজিও! হেনরী ডিরোজিও!

ঘরের ভেতরে এসে একটা কেদারার পেছনে দাঁড়ায় কৃষ্ণকিশোর। মুখে তার কথা নেই।

পণ্ডিত মশায়ের মুখাকৃতির এ কি পরিবর্ত্তন!

নামাবলী দেহ থেকে লুটিয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই সেদিকে। অধিক ক্রোধ আর উত্তেজনায় তাঁর শুভ্র কান্তি সিঁদুরে মেঘের রঙ ধরেছে। চোখ দু'টিও তাই। আয়ত চক্ষের দৃষ্টি সীমাহীন আকাশে নিবদ্ধ। ছাত্রকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে চেয়ে আছেন ঐ দিকে। যেন মুখদর্শন করবেন না।

কুমুদিনীর শান্ত ও ধীর কথার সুরে ঘরের নীরবতা ভঙ্গ হয়।

বলেন,—কিশোর, আমি তোমার কাছে শুনতে চাই, তোমার কি মত। পাঠশালার পড়ায় কেন তোমার আপত্তি? আমার কানে এসেছে তুমি মিশনারি ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ। তোমার অভাগী মায়ের হয়তো জানবার অধিকার নেই, তবুও, তবুও আমি তোমার মুখেই শুনতে চাই।

কিশোরের কথার আগেই পণ্ডিত মশায় বলতে শুরু করেন,—জানো বৌঠান, ওর বাবার সঙ্গে আমার এই ঘরে ব'সে ব'সেই প্রায়শই আলাপ হ'ত ওর লেখাপড়া বিষয়ে। সে বলেছিল, আমার ছেলে বারো থেকে আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত টোল-পাঠশালায় পড়বে। প্রথম তিন বৎসর পড়বে ব্যাকরণ, অতঃপর দু' বৎসর পড়বে কাব্যালঙ্কার। অপর এক বৎসরে ন্যায় ও স্মৃতি সমাপন ক'রে চলে যাবে বারাণসীতে। সেখানে গিয়ে সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পড়বে বেদান্ত, মীমাংসা ও সাংখ্য।

পণ্ডিত মশায়ের জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য থেমে যায়। আবার বলেন তিনি,—তার স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত হতে দেখে আমি কৃতার্থ! আহা, সেই লোকের ছেলের কি পরিণতি! আসলকে ত্যাগ ক'রে নকলের পিছনে ধাবমান? আমি আর কিছু বলতে চাই না, নিয়ত আমার এই প্রার্থনা যে স্বর্গ থেকে তার আশীষ বর্ষিত হোক। কৃষ্ণচরণের মাথায় ছিল শিখা, তার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকিশোরের মাথায় এ্যালবার্ট ফ্যাশনের টেরী। বিধাতার কি অভিনব বিচার তারই প্রমাণ আর কি। ধিক্, ধিক্ স্বাং—

তাঁর আশা, তাঁর স্বপ্নের কথা শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে যান কুমুদিনী। এ সব কথা পূর্ব্বে কোন দিন জানতে পারেননি, আজ এই প্রথম শুনলেন। শুনে তাঁর মনেও জেগে উঠলো অনেক কথার স্মৃতি। তাঁর মনোবাসনা, তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের বহু বিচিত্র কথা। কুমুদিনী বলেন,—আমি কি করতে পারি বলুন এই অবস্থায়?

পণ্ডিত মশায় তৎক্ষণাৎ বলেন কাতর হাস্যে,—এ হেন সন্তানের জননী হওয়ার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করবে! কি আর করবে?

কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে কৃষ্ণকিশোর। কেমন এক অস্বস্তি।

পণ্ডিত মশায়ের কথায় শ্লেষের ইঙ্গিত। বাক্য অত্যন্ত রূঢ়। মিশনারি বিদ্যালয়ে পড়তে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশেই যে এত ঘটনা ঘটে যাবে তা কি সে ভেবেছে! পণ্ডিত মশায় আসবেন, এত কথা বলবেন, কুমুদিনী দুঃখ প্রকাশ করবেন এমন অসহায় কাতর স্বরে—তা কি সে আশা করেছে।

কুমুদিনী আরেক বার জিজ্ঞেস করলেন,—কিশোর, তোমার কি ইচ্ছে খোলাখুলি জানাবে। আমাকেও সেই রকম ব্যবস্থা করতে হবে। এই যদি হয়, আমার তো এ বাড়ীতে থাকা সম্ভব নয়। আমি চলে যাই, কাশীবাসী হয়ে থাকবো যে ক'টা দিন বেঁচে আছি। তুমি জানবে তোমার মা ছিল, মা ম'রে গেছে।

কুমুর কণ্ঠস্বর কাঁপছে। বাষ্প-রুদ্ধ যেন। চোখের কোণে জলের দু'টি বিন্দু। কৃষ্ণকিশোরের মনে হল, কে যেন তার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছে। কথা ফুটছে না। লজ্জা আর অপমানে নিজেকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত হীন। কুমুদিনীর নয়, তার নিজেরই মনে হচ্ছে আর এক দণ্ড এ বাড়ীর ছায়ায় সে থাকবে না।

হক্ কথা কি জানিয়েছে সে। বলেছে একবারও, যে এখুনি এই মুহূর্ত্তে সে পাঠশালা ত্যাগ করছে। না, সত্যিই সে নাম্ লিখিয়েছে মিশনারি স্কুলে! শুধু বলেছে মাত্র, করেছে? আর না ক'রেই যদি এই ব্যাপার ঘটে, না জানি করলে কি হ'ত!

কৃষ্ণকিশোর কথা বলে এতক্ষণে। অনেক ভেবে, শুষ্ক কণ্ঠে।—আমি এখনও কিছু ঠিক করিনি। পাঠশালায় আমার পড়তে আপত্তি নেই।

তবে সেই সঙ্গে আমাকে ইংরিজীও পড়তে হবে। আমি দু'-চার দিন পরে জানাবো।

এ ধরণের কথা উভয়ের কেউই যেন আশা করেননি। পণ্ডিত মশায়ের চোখে-মুখে অদ্ভুত এক লক্ষণ দেখা দেয়। যেন হেরে গেছেন তিনি। এতক্ষণ যা ভেবেছেন তা যেন নয়। যা বলেছেন তা বুঝি মিথ্যা হয়ে গেল। গুণ্ঠনের আবরণে কুমুদিনীর মুখখানা ঢাকা, তাই দেখা যায় না। বোঝা যায় বেশ, হাসি-অশ্রুর সংমিশ্রণে গর্ব্বের ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে। এ তো অন্যায় কথা নয়, ঠিক কথা। সে যদি এক দেশকে জেনে আরেক দেশকে জানতে চায় তাতে লাভ বৈ ক্ষতি নেই। কিন্তু, ঐ চার্চ্চ, ঐ ডিরোজিও, ঐ পাদরীদের যাদুমন্ত্র যদি ভুলিয়ে দেয় সকল কিছু। ঐ যীশু যদি মাথায় চাপে একবার! বিলীতি পরী, অখাদ্য-কুখাদ্য আর ঐ সর্ব্বনাশের চরম নেশা পানদোষে যদি আসক্ত হয়?

তবুও কুমুদিনী স্থির হতে পারেন না মন থেকে। কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ-খচ করে—ঐ ইংরেজীয়ানার কাঁটা। ছুরি আর কাঁটা।

পণ্ডিত মশায় আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। খড়মে পা দিয়ে বললেন,—তা হ'লে বৌঠান, আমার কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। তোমাদের মনোবাসনা অবগত হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিশোর আমার পাঠশালায় থাক্ বা না-থাক্, ওর পড়াশুনার জন্য আমার আশঙ্কা এতটুকুও হ্রাস পাবে না। আমি চাই কিশোর যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হোক। আমি আর কিছু চাই না।

খড়মের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে একশো আটটি সিঁড়ি বেয়ে চলে গেলেন পণ্ডিত মশায়। ঘর থেকে সোজা চোখ চালিয়ে দেখলো কৃষ্ণকিশোর, গোলাপী তসরের নামাবলী চলেছে। ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে গেছেন এর মধ্যে।

সময় অমূল্য সম্পদ, সে জন্য অতি দ্রুত তাঁর পদক্ষেপ। বেলা হয়ে গেছে, পাঠশালার দরজা খোলার সময়ের বড় বেশী দেরী নেই। পণ্ডিত মশায় একবার আকাশের দিকে চোখ তোলেন। দেখেন রৌদ্রের গতিপথ। তিনি এখন কোন্ স্থানে অবস্থান করছেন—দেখে অনুমানে বুঝতে পারেন পণ্ডিত মশায়। এখন ঘড়ির কাঁটা কোথায়। ঘড়ি ধারণ সাত সমুদ্র তেরো নদীর অপর তীরের ব্যবস্থা। মন থেকে তাই ঘৃণা করেন। গির্জ্জার ঘড়ি দেখে তিনি পথ চলেন না, মান-মন্দিরের দিকে তাঁর চোখ।

ধীরে ধীরে গুণ্ঠন সরিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন কুমুদিনী। কৃষ্ণকিশোরও দৃষ্টি ফেরায়। বাইরের ফটক থেকে। মা'র পানে তাকায়। দেখে মা'র মুখে খুশীর হাসি। কুমুদিনী বলেন,—আমি অন্দরে যাচ্ছি। তুমিও এসো। আমার কাছে ব'সে জলখাবার খাবে। দুষ্টু ছেলে, না ব'লে চলে যাওয়া হয়েছিল ?

কৃষ্ণকিশোর এখনও গম্ভীর। এখনও তার রাগ পড়েনি। ঠিক রাগ নয় অভিমান, লজ্জা নয় অপমান।

কুমুদিনী কাছে এগিয়ে এলেন। ছেলের হাত দু'টি ধরলেন। বললেন,—দুষ্টু ছেলে, এখনও রাগ পড়েনি। চল' আমার সঙ্গে।

এতক্ষণে ছেলে একটু যেন নরম হয়। মুখে একটু হাসি। বলে,—তুমি যাও, আমি যাচ্ছি এখুনি।

কুমুদিনী বলেন,—শীঘ্রি আয়। কাল থেকে যে আমি জলগ্রহণ করিনি তুই কি জানিস ?

তুমি থেকে তুই ! ভ্রূ দু'টো কুঁচকে ওঠে শুধু। কৃষ্ণকিশোর বলে,—মা, জানি না। কে আমাকে জানাচ্ছে ? তোমার ঐ বাপের বাড়ীর লোকটাকে আগে দেশে পাঠিয়ে দাও।

কুমুদিনী হেসে ফেলেন। বলেন,—কাকে রে! কে আবার আমার বাপের বাড়ীর? আমাকে বাপ তোলাচ্ছিস কিশোর?

ছেলে হাসে। স্বাভাবিক হাসি। বলে,—কে আবার, তোমার ঐ বিনোদা! ওর যা কথা!

কুমুদিনী আরও হাসেন।—ও, তাই বল্। তোকে বুঝি কিছু বলেছে?

হঠাৎ কৃষ্ণকিশোর গম্ভীর হয়ে যায়। বলে,—বললে কি আর বলতাম নাকি এ কথা। ও আমাকে কেন বলেনি যে তুমি কাল থেকে কিচ্ছু খাওনি?

কুমুদিনী অন্দরে পা বাড়িয়ে হাসতে হাসতে চলে যান। বলেন,—আচ্ছা, সে ব্যবস্থা হবে'খন, তুই শীগ্রি শীগ্রি আয়। গলা আমার শুকিয়ে গেছে।

বারান্দার একটা নির্দ্দিষ্ট টেবিল থেকে সেদিনের সংবাদপত্রখানা তুলে নেয় কৃষ্ণকিশোর। পড়তে পড়তে সদরের তিনতলায় উঠে যায়। সেখানে শুধু মাত্র একখানা ঘর। আর ঘর নেই। সে ঘরের নাম হাওয়া-ঘর। চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত। ঘরে চারটে দরজা আর বিশটা জানলা। সেখান থেকে কৃষ্ণকিশোর দেখে। স্পষ্টাস্পষ্টি দেখা যায়। মনে হয় বেশী দূরে নয়, খুব কাছাকাছি। আইভিলতা। লাল রঙের শাড়ী। হাসছে।

আর বেশী দেরী হলে কুমুদিনীর কষ্ট হবে। মা কাল থেকে জলগ্রহণ করেননি। সে কি জানে। কৃষ্ণকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে নীচের সিঁড়িতে পা দেয়। আইভিলতাও সরে যায় বাতায়ন-পথ থেকে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে কৃষ্ণকিশোর হঠাৎ বুঝতে পারে। সে একা নামছে না। আরেক জন আছে তার আশে পাশে।

ঠিক ছায়ার মত। কে, ঐ রূপের ডালি আইভিলতা? না কিশোরের পোষা কুকুর। টম।

আমলাদের একজন যুক্তকরে দাঁড়িয়েছিল একতলায়। সিঁড়ির মুখে। জমিদার বাহাদুরকে দেখে সে বলে,—হুজুর, চণ্ডীস্থান মহলের প্রজারা কয়েক জন এসেছেন এইমাত্র। সর্ব্বসমেত জনা দশেক আছেন। প্রচুর ঘৃত আর দধি এনেছেন সঙ্গে।

চণ্ডীস্থান এখানে নয়। বিহারে। মা চণ্ডীর স্থান। কৃষ্ণকিশোর ব্যস্ত হয়ে ওঠে,—তাই নাকি? ঘর খুলে দিন, বসান তাঁদের। পানীয় জল দিন। আহারের ব্যবস্থা করুন। আমি এখুনি আসছি মা'র কাছ থেকে।

অন্দরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ডাকে কৃষ্ণকিশোর,—মা, মা গো! চণ্ডীস্থান মহলের প্রজারা এসেছে, ভাঁড়ারের চাবি দাও নায়েব মশায়কে। তাদের কি খেতে দেবে ব'লে দাও।

কুমুদিনী বসেছিলেন খাবারের থালা সাজিয়ে। নিজের আর ছেলের। বললেন,—তুমি আগে খাও দিকিন। আমি তার ব্যবস্থা করছি।

ছেলে আসনে বসে। মায়ের পাশে। ছেলে খায়, তার পর মা মুখে তোলেন। বলেন,—হ্যাঁ রে, ক'জন এসেছে?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—বেশী নয়, জনা দশেক।

আহার সেরে সদরে চলে যায় কৃষ্ণকিশোর। কাছারী-বাড়ীর এক জায়গায় গিয়ে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হয় তাকে। প্রণাম আর প্রণামীর বহর চলতে থাকে। সেলাম আর সেলামীর। টুং-ঠাং শব্দ হয় টাকার। কেউ বা রঙীন উড়ুনীর পাগড়ী নামিয়ে দেয় মাথা থেকে। কৃষ্ণকিশোরের পায়ের কাছে। রৌপ্য মুদ্রায় পরিপূর্ণ। নজরানা।

কাছারী ঘরের একটা আরাম-কেদারায় বসে কৃষ্ণকিশোর। তাকে

ঘিরে বসে বিহারী প্রজাদল। মুখে তাদের পথের ক্লান্তি। অনেক দূর থেকে তারা এসেছে। চণ্ডীস্থান থেকে। মা চণ্ডীর স্থান।

যারা এসেছে তাদের কয়েক জনকে দেখেছে সে। তারা নতুন নয়। আরও দু'-চার বার কলকাতায় তারা এসেছে। দেখেছে বাঙলার মাটি। আর যারা, তারা একেবারে আনকোরা। তারা শুনেছে, বাঙলার মাটিতে নাকি যা ফলাবে তাই ফলবে। কখনও চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি এত অসংখ্য সজীব, সবুজ গাছ। এত ফুল আর এত ফল। এই গহন অরণ্যের আবেষ্টনে এমন স্বর্গপুরী। জাঙ্গালের ভেতরে এই শহর কলকাতা।

গাছ, শুধু গাছ। বাঙলার প্রাকৃতিক বৈভব। কলকাতার আবেষ্টন বৃক্ষ-প্রাচীর। ঈশ্বরের রক্ষা-ব্যূহ। আম, জাম, কাঁটাল। তিন্তিড়ী, কদম্ব, বাবলা, হরীতকী। বট, অশ্বত্থ, শেওড়া, শিশু, শেগুন, শাল। সুঁদরী, শিমুল, আমলকী। তাল, সুপুরী, নারকেল। আর বাঁশ গাছ। যেদিকে তাকাও সেদিকে। যেন সীমাহীন। তাই ওদের অবাক চোখ। বিহ্বলতার আবেশে তন্দ্রালু দৃষ্টি। না-দেখা বাঙলার এই জাগ্রত স্বপ্নে।

যারা নতুন তাদের চিনিয়ে দেয় একজন। বয়সে যে সকলের বড় সে। বাসদেও মাহাতো। পাকা চুলের সম্মানে সে গণ্যমান্য। বলে,—হুজুর, শুকদেবপ্রসাদের দুই লেড়কা আছে ,এরা। আউর ইয়ে ভগবান সিংকা ভাই আছে। এরা বাঙলা মুলুকে আসিয়েছে এই প্রথম।

বিস্মিত হয় কৃষ্ণকিশোর। নবাগতদের মুখাবয়ব এক লক্ষ্যে দেখে নেয়।

শুকদেবপ্রসাদ আর ভগবান সিং। স্মৃতির পটে দুজন বৃদ্ধকে দেখতে পায়। বহু বার দেখেছে তাদের চণ্ডীমহলে আর এই কলকাতায়।

মনে হয়েছে তারা যেন আপন জনের মত। আত্মীয়-স্বজন। তাদের বুকে-পিঠে চড়েছে সে। পিতার জীবিতকালে যখন চণ্ডীমহলে যায় তখন ঐ শুকদেবপ্রসাদ আর ভগবান সিং মাটিতে তাকে পা দিতে দেয়নি। হুজুরের ছেলে দয়া করে এসেছেন তাদের দেশে বেড়াতে, তাই উৎসবের আয়োজন হয়েছিল কাছারীর প্রাঙ্গণে। ক'দিন, ক'রাত্তির। রামলীলা, প্রহ্লাদ-চরিত আর পুতুল-নাচ। চণ্ডীস্থান মৌজার যতেক প্রজা সপরিবারে ভীড় জমিয়েছিল ঐ উৎসবের আসরে। দেখতে এসেছিল হুজুরের ছেলেকে। রাজার কুমারকে। তাদের ভবিষ্যতের রাজাকে।

একটু একটু মনে আছে কৃষ্ণকিশোরের। সেই উৎসবের রাত্রি। শত শত নর-নারীর অবিরাম কলকাকলী। কাছারীর চত্বরে মানুষ আর ধরে না। মেয়েছেলের দল আসছে ইদিক-সিদিক থেকে। দল বেঁধে, সারি বেঁধে। তাদের মাথায় পোড়া মাটির কালো কলসী। দুধ এনেছে তারা। ঘরের গাইয়ের দুধ। আর এক সুরে গাইছে ননীচোর যশোদা-দুলালের শৈশব-লীলা। পায়ে তাদের গোছা-গোছা রূপোর ফাঁপা মল। চলছে আর শব্দ হচ্ছে ঝমাঝম্।

আসরের মধ্যিখানে জ্বলছে গোটা কয়েক রাম-মশাল। গভীর রাতের ঘন অন্ধকার সেই আগুনের প্রলয় নর্ত্তনে কম্পমান। মৃদঙ্গ আর করতালির ঘন ঘন ঝঙ্কারে কত বার তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। শুনেছে, রামগান হচ্ছে। সমস্বরে।

এই উৎসবের আয়োজন করেছিল ঐ শুকদেবপ্রসাদ আর ভগবান সিং। একটা টাট্টুতে চাপিয়ে তাকে ঘুরিয়েছিল মহলের চৌহদ্দীতে। পথের দু'পাশের ঘরের দরজায় দেখেছিল অসংখ্য জনতার ভীড়। দর্শনপ্রার্থীর দল। নর, নারী, শিশু।

কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করলো,—আর এরা কারা বাসদেও? এদের কখনও দেখেছি মনে হয় না তো।

পাশাপাশি বসে ছিল তিন জন।

তাদের চোখে সরল দৃষ্টির ছায়া। মুখের ভাবে অজ্ঞতার স্পষ্ট ইঙ্গিত। যেন দেখে-শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়েছে। ঘরের দেওয়াল দেখছে। কড়িকাঠে চোখ তুলছে।

বাসদেও মাহাতো হেসে ফেললো। খুব খানিক হেসে বললে স্বর নামিয়ে,—ইস্, চিন্‌তেভি পারলেন না তো?

হাসির রেশ টেনে বললে কৃষ্ণকিশোর,—না, কৈ না তো!

বাসদেও মাহাতো হাসতে হাসতে বলে,—ওরা তিন জন হুজুরের এই গোলামের তিন লেড়কা আছে।

কথার শেষে নিজের বুকে হাত রাখলো বাসদেও মাহাতো। শুদ্ধ দৃষ্টিতে তিন জনে তাকিয়ে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, রৌদ্রদগ্ধ। মুখাকৃতি অদ্ভুত এক তিনজনের। দেখলেই অনুমান করা যায়, তিন জনেই এক গাছের ফুল। তিন জনের কপালেই চন্দনের তিলক। ভ্রূ-যুগলের সঙ্গম থেকে সোজা কপালে গিয়ে মিশেছে। তিন জনের মাথায় সুদীর্ঘ শিখা। গ্রন্থি বাঁধা।

ক্ষোভের সুরে হঠাৎ কথা বললে বাসদেও মাহাতো।—হুজুর, সংসারে মন নাই। মাঠের কাজে ভি মন নাই। শুধু গান্ আউর গান। আমি এখন বুড়ো হয়েছি। এখন্ ওরা আমাকে দেখবে, না আমি ওদেরকে দেখবো?

কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পারে, কাদের কথা বলছে বাসদেও মাহাতো। নিজের ছেলেদের কথা। ছেলেরা তিন জন লজ্জায় মাথা নামিয়ে বসে আছে যুক্তকরে। এমন অভিযোগের কি উত্তর দেওয়া যায়। তাই সে বিচারের আসনে বসেও নীরবে তাকিয়ে থাকে।

বাসদেও মাহাতো হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পাশেই ছিল তার নিজের একটা প্যাটরা। চটের একটা হাত-ব্যাগ। তার ভেতর থেকে বের করলে কি একটা। বললে,—আরে হুজুর, বহুৎ ভুল হয়ে গিয়েছে। চণ্ডী মায়ীকী প্রসাদী ফুল নিয়ে এসেছি। রাণীমাকে লেকিন ভেজ দিতে হবে।

বাসদেও মাহাতো ভক্তিভরে দু'হাত তুলে ধরলো। হাতে লাল জবা গোটা কয়েক। আর সিঁদুর-মাখা বিল্বপত্র এক মুঠো।

কৃষ্ণকিশোর খুশীর হাসি হেসে বলে,—তুমি যাও বাসদেও। তুমি নিজে গিয়ে দিয়ে এসো। মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না?

বাসদেও মাহাতো হাসে। সলজ্জ হাসি।—সেই ভাল হোবে। আমিও যাই, তাঁর পায়ে হাত দিয়ে আসি। বহুৎ দিন দেখছি না রাণীমাকে।

মাটিতে লুটানো টাকা লাল খেরোর থলিতে ভর্ত্তি করছিল নায়েবদের একজন। খাতায় জমা করতে হবে সঠিক সংখ্যা। কে কত দিয়েছে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—নায়েব মশাই, বাসদেও মাহাতোকে মায়ের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। তাঁকে খবর দিন। আর একবার খবর করুন, এদের খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হ'ল।

অবশিষ্ট যারা তারা বসে থাকে যেমনকার তেমনি। তাদের চোখে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙলা দেশের রূপে তারা যেন আত্মহারা। তারা যেন এক আজব দেশে এসেছে। তাদের মুখে অনুসন্ধিৎসার ব্যাকুলতা। শহরের বৈচিত্র্যে তাদের ঐ গ্রাম্য চোখে যেন জিজ্ঞাসার উৎকণ্ঠা।

বাসদেও মাহাতোর তিনজন ছেলের একজন তার মাতৃভাষায় কি একটা স্বগত করলো। বিড়-বিড় ক'রে কি কথা বলতেই অন্য দুজন সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলো। আবার হেসে ফেললো বাসদেও মাহাতো। ছেলেদের প্রশ্ন শুনে। তাদের সাহস তো কম নয়! কা'কে

কি বলতে হয় তারা জানে না। কখন কি বলতে হয়। বাসদেও মাহাতোর হাসিতে তাই লজ্জার আভাস। যেন নিরুপায় হয়েই আসল বিষয় ব্যক্ত করে। বললে,—হুজুর, বলছে কি, এই বাঙলা মুলুকের ইতিহাস কি আছে? কি কি ফসল হয় এখানে? এই সব জানতে চাইছে ব্যাটা।

পিতার আবেদন শেষ হতেই তিন জন একসঙ্গে মাথা দুলিয়ে সায় দেয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারা রাজার কাছে রাজত্বের খবরাখবর জানতে চেয়েছে। প্রজা কি শুধু দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের। না কি খাজনা দিয়েই খালাস। তাই তারা সরাসরি হুজুরের সমীপে নিবেদন জানিয়েছে। হুজুর নিজমুখে বিবৃত করুন।

বাঙলা দেশ!

কৃষ্ণকিশোর আশা করেনি তারা এমন কথা বলবে। এত-শত বিষয় থাকতে, জানতে চাইবে এই বাঙলার পুরাবৃত্ত। আরেক বার লক্ষ্য করলো সে প্রশ্নকর্ত্তাদের মুখাবয়ব। কেমন যেন শুদ্ধ। নির্ভীক।

বাঙলা দেশ!

—কিন্তু আমার কথা কি ওরা বুঝতে পারবে বাসদেও? আমি তো তোমাদের ভাষা জানি না। কথাগুলি বলতে বলতে কেদারা থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। ঘরের ভেতরে যে জায়গাটুকু শূন্য, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাসদেও মাহাতো যেন কতই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। হুজুর যদি কথা বলতে কষ্ট পান। বললে,—কি যে বলেন হুজুর! আপনি বাঙলায় বলুন। আমি ব্যাটাদের সমঝে দেবো। ইস্!

ঘরের এক পাশে কখন এসে দাঁড়িয়েছে একটা তাঁবেদার।

বিরাট একখানা হাতপাখা, মানুষ-প্রমাণ উঁচু। দু'হাতে দোলাচ্ছিল

তাঁবেদারটা। কিন্তু হাওয়া হচ্ছিল না। তাই নেহাৎ না ধমকে নায়েবকে বললে কৃষ্ণকিশোর,—নায়েব মশাই, লোকটা পাখা কখনও ধরেনি। হাওয়া করতে হবে না, যেতে বলুন ওকে।

টাকা কুড়ানোর কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লাল খেরোর থলিটা ফেঁপে উঠেছে এতক্ষণে। নায়েব লোকটাকে ডাকলো ইশারায়। কাছে ডেকে বললে,—যাও, পাখা করতে হবে না।

আর সত্যিই তখন হাওয়া বইছে ধীরে ধীরে। চৈত্র-দিনের বাতাস বইছে।

গমনোদ্যত নায়েবকে চাপা-গলায় ডাকলো বাসদেও মাহাতো।—চলে যাবেন না। প্রসাদী ফুল আপনি রাণীমাকে পাঠিয়ে দিন। রাণীমার ফুরসৎ হলে ডাকবেন আমাকে। আমি গিয়ে পা ছুঁয়ে আসবো।

হাতের ফুল আর বিল্বপত্র তার হাতে তুলে দেয় বাসদেও মাহাতো। তারপর বলে,—বলুন হুজুর, বলুন।

উত্তরদাতার মন আর এখানে নেই।

বাঙলা দেশ! বাঙলা দেশের কোন্ ইতিহাস সে বলবে। মহাভারতের সেই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের অন্যতম রাজা সমুদ্রসেনের সেই বাঙলা দেশ। বিন্দুসারের পুত্র প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের বাঙলা দেশের ইতিহাস? পুণ্ড্রবর্দ্ধনের? তাম্রলিপ্তের? কোন্ আমলের কথা তারা জানতে চায়। দাক্ষিণাত্যের নাগবংশীয় সেই ভোজ গৌড়দের, না মহারাজা বিক্রমাদিত্যের। না রাজা নরেন্দ্র শশাঙ্ক গুপ্তের। না হর্ষদেবের? মহারাজ আদিশূরের না ধর্ম্মপালের। রাজ্যপালের না লাউসেনের। রামপালের না বিজয় সেনের। বল্লাল সেন না লক্ষ্মণ সেনের। পাঠান বক্তিয়ার খিলজী না গিয়াসউদ্দীন নাসিরউদ্দীনের বাঙলা দেশ।

বিজয়সিংহ না প্রতাপাদিত্যের। শক হূণ পাঠান মোগলের বাঙলা দেশ। না কুইনের রাজ্য এই বাঙলা?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—বাঙলার উত্তরে নেপাল আর হিমালয়ের তরাই, কুচবিহার আর আসাম। দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ, বঙ্গোপসাগর, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর। পশ্চিমে সিংভূম, বরাহভূম, সাঁওতাল পরগণা। পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা আর চট্টগ্রাম। বাঙলা দেশ নদীর দেশ। তাই এখানে ফসল হয় প্রচুর।

শ্রোতার দল হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে।

হুজুর দয়া ক'রে নিজ মুখে বলছেন। তাদের কি সৌভাগ্য! বাসদেও মাহাতো ছেলেদের হয়ে শুধোয়,—কি কি ফসল হয় হুজুর?

কৃষ্ণকিশোরের মন তখন ইতিহাস-ভূগোলের পৃষ্ঠায়। কি কি ফসল হয় তার সব কি মনে আছে। বাঙলার মাটি এতই উর্ব্বরা যে, যা ফলাবে তাই ফলবে। সবুজতার বন্যা দেখতে চাও তো বাঙলার ক্ষেত্র কর্ষণ করো। বাঙলার মাটি হিরণ্যগর্ভা।

পিসীমা এখানে থাকলে বড় উপকার হ'ত।

হেমনলিনী থাকলে মুখস্থ বলে যেতেন। কিশোর শিখেছে তাঁরই কাছে। গল্পের ছলে বলেছেন বাঙলার ইতিবৃত্ত। শুনে-শুনে কিশোরের মনে আছে সব না হলেও কিছু কিছু। বাঙলা লক্ষ্মীর দেশ। তাই ঘরে ঘরে দেখো না লক্ষ্মীপুজো হয়। বছরে বছরে, মাসে মাসে, হপ্তায় হপ্তায় লক্ষ্মীর উৎসব। তাঁরই আশীর্ব্বাদী দান বাঙলার সোনামুখী ধান। অন্নক্ষেত্র এই বাঙলা দেশ। বাঙলা অন্নপূর্ণা।

আর শুধু কি এক রকমের। রকম রকমের।

মহীপাল, দাউদখানী, পাটনাই, পেশোয়ারী, ঢাকাই, কটকী, কাজলি, জলেশ্বরী, নাগরশালি, ক্ষুদে মাগুরা, পেনেটী, ভোটশালী,

ধনেখালি, মানিকমুদি, মহিষাদল, গোপালভোগ, বলরামভোগ, বাদশাহ-ভোগ, রাঁধুনিপাগলা, দুর্গাভোগ, রাজভোগ, সীতাভোগ, বেনাফুল, বাঁশফুল, মালভোগ, পরমান্নশাল।

কিন্তু পিসীমা কি সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। কাছারী-বাড়ীর এই ঘরে ?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—ফসল হয় অনেক। চাল, সরষে, কার্পাস, মসিনা, পাট, যব, মুগ, অড়হর, মাষকলাই, মসুর, ছোলা, মটর, খাঁসারি, নীল, মৌরী, ধনিয়া, ইক্ষু, আদা, পলাণ্ডু, হরিদ্রা, লঙ্কা, রশুন, তিল, তামাক, গাঁজা, অহিফেন।

বলতে বলতে যেন হাঁফিয়ে ওঠে। এক নিশ্বাসে এতগুলি নাম বলে যায় সে।

শ্রোতার দল যাত্রার সামন্তদের মত পরস্পর কি বলাবলি করে বিস্ময়ের সুরে। শোনা যায় না, বোঝা যায় ওরা বাক্য বিনিময় করছে।

বাসদেও মাহাতো মাধ্যমের কাজ করে।

অবুঝদের নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দেয় আসল কথা। বলতে বলতে তার চোখ শুধু নয়, যারা শোনে তাদেরও চোখ বড় হয়ে যায়। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই প্রকৃতির দান ক'টা দেশের কপালে থাকে !

বাসদেও মাহাতো সমীহের সুরে বললে,—আর হুজুর, শুনেছি বাঙ্গাল মুলুকে লোহার বহুৎ কিছু তৈয়ারী হয়। আমার একটা জাঁতি চাই হুজুর।

কথা বলতে বলতে লজ্জিত হয় বাসদেও মাহাতো। কারণ, সে যা চাইছে তা তার নিজের প্রয়োজনে নয়। তার গৃহলক্ষ্মীর আবদার হয়েছে বাঙলা দেশের জাঁতি চাই একখানা। বাসদেও মাহাতোর স্ত্রী নাকি একটু বেশী পান খায়। সেই রক্তমুখী বুড়ীকে ভালবাসে

কৃষ্ণকিশোর। বুড়ী ঘরের কোণে বসে থাকে, ছ্যাঁচা পানের গুলী চিবোয় আর হুঁকোয় তামাক খায়। দু'কানে তার আট দু'গুণে ষোলোটা রূপোর চুড়ী! মাথা থেকে যেন কান দু'টো খসে পড়ে যাবে মনে হয়।

কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পারে জাঁতি কি হবে। হাসতে হাসতে বলে,—বৌ বুঝি বলেছে বাসদেও? তুমি তাকে নিয়ে এলে না কেন?

বাসদেও মাহাতো হো-হো শব্দে হাসতে শুরু করলো। চোর ধরা প'ড়ে ভয় পায়। বাসদেও মাহাতো ভয় না পেয়ে হাসে। বলে,—ঠিক বলিয়েছেন হুজুর। বুড়ী তো চলতে-ফিরতে পারে না। বাতের কষ্টে উঠতেভি পারে না।

কৃষ্ণকিশোর ঐ বুড়ীকে ভুলতে পারে না কোন দিন। একবার মহলে যেতে বুড়ী তাকে নেমন্তন্ন ক'রেছিল। মাটির ঘর-দোরে পিটুলীর আলপনায় ভরে দিয়েছিল সেদিন। কোলে বসিয়ে নিজের হাতে হুজুরের ছেলেকে খাইয়েছিল ছানার মালপো, পেস্তা-বাদাম, আম আর ক্ষীরের লাড্ডু। শেষে বিদায়কালে পরনের কাপড়ে ব্রাহ্মণের ছেলের পা মুছিয়ে নিয়ে ঘরের যত বাসিন্দার মাথায় ঠেকিয়েছিল।

বাসদেও মাহাতোর বাসায় সেদিন ছোট-খাটো একটা মোচ্ছব হয়েছিল। কৃষ্ণকিশোরকে শুধু-হাতে আসতে দেয়নি বুড়ী। উপহার দিয়েছিল প্রকাণ্ড একখানা কাঁথা। জমিতে তার কালো সুতোর নক্সা। নিজের হাতে নাকি তৈরী করেছিল বুড়ী। নাকি দেড়বছর লেগেছিল শুধু ঐ নক্সার কাজ করতে। অনেক মেহন্নতের বস্তুটি হাসতে হাসতে দিয়ে দিয়েছিল। এখনও সযত্নে রাখা আছে সেই কাঁথাখানা। জমির কাপড় নেহাৎ সাদা সুতোর, নয় তো কাশ্মীরী জামিয়ারও হার মেনে যায়।

কুমুদিনী বলেছেন,—তোলা থাক্। তোর বৌ এসে শীতে গায়ে দেবে।

হাসতে হাসতে বললে কৃষ্ণকিশোর,—শুধু কি জাঁতি তৈরী! বাঙলা দেশে লোহার কত কি তৈরী হয়। ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, কাটারি, দা, খড়্গ, তরবারি, বল্লম, শড়কী, বন্দুক, কামান, গজাল, বঁটী, সাবোল —কত কি। জাঁতি, কুরুণী, কাস্তে, কত কি।

হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে ওরা।

যাত্রার সামন্তদের মত পরস্পর কি কথা কয়। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বাসদেও মাহাতো বলে,—ব্যস্ হুজুর, আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

কৃষ্ণকিশোর কথা বলছে কিন্তু সে যেন আসল কথা বলছে না। কথার ফাঁকে-ফাঁকে কি এক চিন্তায় কোথায় যেন চলে যাচ্ছে একেবারে। কি যেন সে ভাবছে। যার কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না এমন কিছু কি? মনে হয়, বড় বেশী চিন্তাকুল যেন সে। যেন কি এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন।

ম্যানেজার বাবু এতক্ষণে হঠাৎ দেখা দেন। ধূমকেতুর মত।

সকালে উঠে স্নান সেরে সেই যে একবার চুলে টেরী কেটেছিলেন এখনও তার এতটুকুও নড়-চড় হয়নি! সোজা সিঁথির দু'পাশে ঢেউ-খেলানো চুল। মাথার-পেছনে চুল নেই, ক্ষুর বুলানো। ম্যানেজার বাবু যে বিলক্ষণ প্রৌঢ় তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কারণ চুলে তাঁর কিঞ্চিৎ পাক ধরেছে। অর্থাৎ তিনি কাঁচা-পাকা চুলের।

হাত কচলাতে কচলাতে বললেন তিনি,—এনাদের আহার প্রস্তুত। আপনি আদেশ করলেই পাতে খাবার দেওয়া হয়।

অনুনয়ের স্বরে কৃষ্ণকিশোর বলে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বাসদেও, তুমি

এদের নিয়ে যাও। খাও আগে। তার পর কথা হবে। বাঙলা দেশের গল্প হবে। তোমার ছেলেদের গান শুনবো।

আবার হেসে ফেললো বাসদেও মাহাতো।

উঠে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। নিজের দলকে বললো,—উঠিয়ে সব। হামরা সাথমে আইয়ে।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে শুরু হলো সশব্দে।

একে একে বাজলো বারোটা। বাইরে রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হয়েছে। বাতাসে উষ্ণতা। কৃষ্ণকিশোর একা একা ঘরের ভেতর পায়চারী করতে থাকে। যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়েছিল কিসের জড়তায়। লজ্জার খাতিরে তাদের ফেলেও যেতে পারে না। কর্ত্তব্য আর ভদ্রতাবোধ, লজ্জা আর শালীনতায় বেধেছে। নয় তো সে কি আর শুধু শুধু এসে বসেছে। কুশল প্রশ্ন করেছে তাদের। গল্প করেছে কতক্ষণ!

পাড়ার ছক্কড় মহলে জুয়া খেলা সুরু হয়েছে।

ঐ ছেলেটাকে পটিয়ে যদি দলে ভেড়াতে পারে। একবার যদি ফুস্‌লে বের করতে পারে কেউ, তারপর দলের আর সকলে না হয় মহড়া আগলাবে। কিন্তু কাছে যাওয়া চাই তো। কাছাকাছি না গেলে কখনও দহরম-মহরম হয়। দূর থেকে কে আর কবে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধেছে। আর সেই জন্যেই তো ছক্কড়ের দল জুয়ায় ভাগ্যপরীক্ষা করতে শুরু করেছে। যার ভাগ্যে লাগে। কোমর বেঁধে তাকেই যেতে হবে ঐ ঘণ্টা-বাঁধার মহৎ কাজে।

তার পর না হয় দলের আর সকলে মহড়া আগলাবে। ভোগ মারবে। ভাগ বসাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কুমুদিনী সদরের রক্ষাকর্ত্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন,—

পাড়ার মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানোরা যেন আমার ফটকের এপারে না আসে। অপমান করতে বলছি না। কিন্তু তারা যেন আমার কিশোরের ত্রিসীমানায় না আসতে পায়।

তবুও তাদের অনেক লোভ।

এত কাঁচা টাকার মালিক ঐ ছেলেটা। এই বয়সেই রাজার পদে অভিষিক্ত। তার পাশে যাওয়া মানেই রাজা হওয়া। কিন্তু তার আগে চিত্ত জয় করতে হবে তো! যাকে বলে মনোহরণ। কে করবে। কে পরাবে মালা।

ত্যজ দুর্জ্জন-সংসর্গম্।

শ্লোকটা পড়তে পড়তে অর্থ বুঝেছে কৃষ্ণকিশোর। অসৎ চরিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। যদিও কে যে সুজন আর কে যে কুজন তা সে জানে না। হাঁড়ির খবর নিয়ে তার পর করবে আলাপ-পরিচয়। কুলজী প'ড়ে করবে বন্ধুত্ব। অপিচ, এ বয়সে সাধু-সমাগমের ভজনাও সম্ভবপর নয়।

কিন্তু কাছে বড় একটা না এসেও একজন তার মনের অনেকটা অধিকার ক'রে বসে আছে। কি এক অদৃশ্য প্রভাবে যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে কৃষ্ণকিশোর। দিন নেই, রাত্রি নেই, তার জন্মে ভেবেই আকুল সে। অনুরাগের পর যেমন এক জন আরেক জনের চিন্তায় বিভোর হয়। কি যে মিষ্টি সে বাজালো বাঁশী, যার সুর-ধ্বনি কখনও যেন সে ভুলতে পারবে না।

ঘরের মধ্যিখানে ছিল একটা বেতের আরাম-কেদারা।

গা এলিয়ে বসে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। কেমন যেন একটা ওলট-পালট। হঠাৎ একটা ঝড়ের হাওয়ায় বিলকুল বদলে গেলো। দেখলো আর মুগ্ধ হ'ল কৃষ্ণকিশোর। একেবারে প্রথম দেখায়।

ঠিক তার পর থেকেই বলতে কি চোখের দৃষ্টি যেন বদলে গেছে তার। দেখে-শুনে আর যেন ভাবতে পারছে না নিজের সম্বন্ধে—কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। কোন্ পথে পা বাড়াবে। দেশী কাঁচা সড়কে না বিদেশী রাজপথে। মামুলী পায়ে-চলা পথে না নতুন বাঁধানো রাস্তায়। দিক্ নির্ণয় করতে পারে না যেন কিছুতেই। টোলের দরজা আর মিশনারিদের স্কুলের ফটক—দুই-ই তার সমুখে উন্মুক্ত। যেথায় খুশী যাও। গীতা আর বাইবেল, পাশাপাশি প'ড়ে আছে। যাকে খুশী নাও।

কিন্তু যত কাল হয়েছে ঐ ভোরে বেড়াতে যাওয়া।

হাওয়া খেতে বেরিয়ে এমন হাওয়া খেয়েছে যে অন্য কোন আবহাওয়ায় আর ভাল লাগছে না নিজেকে। এক দিন দেখেছে, দু'দিন দেখেছে, তিন দিনের দিন সরাসরি পাশে গিয়ে বসেছে। আত্মবিহ্বলতায় নির্লজ্জের মত প্রথম কথা বলেছে কৃষ্ণকিশোর।

কুঠিয়াল সাহেবের দল। ফোর্ট উইলিয়ামের গোরা সৈনিক। সরকারী সেরেস্তার কেউ-কেটারা কেউ-কেউ। কেউ পদব্রজে, কেউ বা অশ্বারোহণে গড়ের মাঠের হেথায়-সেথায় ঘোরা-ফেরা করছেন। কারও কারও সঙ্গে বা তাঁদের আপন আপন জীবন-সঙ্গিনীরা রয়েছেন। তাঁদের এক হাতে কুকুরের চেন আর অন্য হাতে সাদা কাপড়ের লম্বা লম্বা ছাতা। তাঁদের কোমরেও ছাতা! তাঁরা নাকি গাউন পরেছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন মনের আনন্দে। হাসতে হাসতে।

আর ধলা শুধু নয়, দু'-চার কালা আদমীকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রাতর্ভ্রমণে এসেছেন তাঁরা। প্রচুর পয়সার মালিকরা সব। ল্যাণ্ডো আর ফীটনদের রাস্তায় রেখে নিজের পায়ে হাঁটতে এসেছেন। এঁদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী আছেন, চোরবাগানের মিত্তির আছেন, বেল-

গেছিয়ার সিংহীরা আছেন, শোভাবাজারের দেব আছেন, ভূকৈলাসের ঘোষালরা আছেন—বাবুরা সব সভৃত্য-সমভিব্যাহারে একটু হাওয়া খেতে এসেছেন। কেউ বা আবার নিজের ঘোড়াটিকে সঙ্গে এনেছেন। একটু ঘাম ঝরাবেন সেই জন্যে।

আর আছে কচি কচি শিশু। নধর-গঠন কিশোর।

এদের কোন জাত নেই। অজ্ঞানের কোন জাত থাকে না। শুধু সাদা আর কালো এই যা তফাৎ। রাজার আর প্রজার এই যা।

পার্কের একখানা বেঞ্চীতে বসেছিল সে চুপ-চাপ।

তার চারি দিকে নানা গাছের ঝোপ। নানা ফুলের। দেখলে তাকে কে বলবে বাঙালী। মনে হবে ইউদী-কী-বাচ্ছা। কিংবা পার্শী। কিন্তু তা নয়।

তিন দিনের দেখায় ভিন্ন ভিন্ন বেশে দেখা যায়। অবাক হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর।

প্রথম দিন নাবিকদের সাদা জিনের পোষাক।

দ্বিতীয় দিন তিন-টুকরোর স্যুট। আর তৃতীয় দিনে কি না ধুতি আর পিরাণ। স্যু আর বুট থেকে একেবারে সাপের চামড়ার লপেটা।

অবাক করলো তাকে। কৃষ্ণকিশোর বেঞ্চীতে গিয়ে বসলো তার পাশে। জিজ্ঞেস করলো,—তোমার নাম কি ভাই?

লাল আলপাকার রুমালে মুখ মুছতে থাকে সে। একটু হেসে বলে,—নাম দিয়ে কাম কি ভাই?

কৃষ্ণকিশোর আশা করেনি তার মুখ থেকে হাসি আর পরিহাসের বাঙলা ভাষা বেরোবে। সেও হাসে। খুশীর মৃদু হাসি। বলে,—বল না, দরকার আছে। তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?

সে একটা বার্ডসাই ধরায়!

বলে,—নিশ্চয়ই করব। যীশুর এই পৃথিবীতে সকলেই তো সকলের বন্ধু! আমার নাম মাষ্টার নর্ম্মান অরুণেন্দ্র মুখার্জ্জী।

কৃষ্ণকিশোর শুনতে পায়। কিন্তু বুঝতে পারে না। বলে,—কি, কি নাম বললে?

এক মুগ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে আবার বললে সে,—ভাল ক'রে শুনে নাও, মাষ্টার নর্ম্মান অরুণেন্দ্র মুখার্জ্জী।

সে এত-শত বুঝতে পারে না। শুধু বোঝে সে বাঙালী। বাঙলায় কথা বলতে পারে। উপাধি তার সহজ বাঙলায় যাকে বলে নিশ্চয়ই মুখোপাধ্যায়। মুখার্জ্জী যার অপভ্রংশ।

এক দিন বাড়ীতে ফিরে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠেছিল কৃষ্ণকিশোর। —মা, মা, অরুণ বাঙালী। বাঙলায় কথা বলতে পারে।

এক বিন্দুও আনন্দ প্রকাশ না ক'রে কুমুদিনী বলেছিলেন,—হোক বাঙালী! তবুও সে খৃশ্চান! বিধর্ম্মী।

কৃষ্ণকিশোর থ' হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, মা যেন তার বিচার না ক'রে কথা বলছেন। তাকে না জেনে বলছেন। তাকে না দেখেই। তার সম্বন্ধে কত দিন কত কথা বলবার থাকে তার। আর বলে না মাকে। ঐ এক কথা বলেন কুমুদিনী,—সে খৃশ্চান। সে বিধর্ম্মী। তার ছায়া মাড়াবে না তুমি।

কিন্তু সত্যিই কি দেখতে সে অদ্ভুত ভাল নয়। কেমন ভাল চেহারা। কেমন দুধের মত ফর্সা রঙ। কেমন বড় বড় চোখ। কেমন কোঁকড়ানো চুল। কেমন মিষ্টি কথা। আর কেমন তার হাসি। কেমন তার বেশ-ভূষা।

নিশ্চুপ হ'য়ে যখন বসে থাকে কৃষ্ণকিশোর, তখনই যেন মুখখানা তার

ভেসে ওঠে চোখের সমুখে। বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে ধারালো দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টিতে তার ষড়রিপুর একটিরও ছায়া নেই। আছে, অদ্ভুত আকর্ষণ-শক্তি। নর্ম্মান অরুণেন্দ্র, অরুণ, অরু—

আরাম-কেদারা থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। তীব্র এক বিরক্তির অনুভূতিতে বড় বিশ্রী লাগছে আজকের আবহাওয়া। যত কিছুর বাধা হয়েছে ঐ পণ্ডিত মশাই। মাকে যেন পেয়ে বসেছেন। যা বলবেন তাই?

—কোথায় তুমি পড়ো। জিজ্ঞেস করেছিল কৃষ্ণকিশোর।

—হিন্দু কলেজে। তুমি?

কৃষ্ণকিশোর যেন বলতে লজ্জানুভব করে। বলে,—পণ্ডিত শিরোমণি তর্করত্নের টোলে। পটলডাঙ্গায়। ব্যাকরণ আর অলঙ্কার পড়ছি।

তার পর দেখা হয়েছে কত দিন।

কত কথা হয়েছে। দিনের পর দিন বেড়াতে এসে বসে বসে মন-জানাজানির পালা চলেছে। এ কথা থেকে সে কথায় চলে গেছে। এমন কি কুমুদিনীর অজ্ঞাতে ফিরতি পথে কৃষ্ণকিশোর তার সঙ্গে গেছে তাদের বাড়ী। রিপন ষ্ট্রীটে। এক-আধ দিন নয়। এমন অনেক দিন।

দেখেছে অরুণের বাবাকে। মিষ্টার নর্ম্মান বিনয়েন্দ্র মুখার্জ্জী। অরুণের মাকে দেখতে পায়নি। তিনি আছেন। কিন্তু কোথায় থাকেন তা কোন দিন বলেনি অরুণ। আর দেখেছে একজনকে। ছায়াকে।

ছায়া আর অরুণ। ভাই-বোন।

কুইন এলিজাবেথের মত মুখের গঠন। ওভ্যাল্ কাটের মুখ। রুক্ষ সোনালী এলানো চুল। পরনে লেসের ঘাগরা। কানে আর গলায় অপেল পাথরের দুল আর মালা। একেকটা পাথর যেন একেক ফোঁটা জলবিন্দু। ছায়ার বুক জুড়ে থাকে সেই মালা। এক ঝাঁক জলের ফোঁটা। আলো-

আঁধারিতে হরেক রঙের আভা দেখা দেয়। আর ঠোঁট দু'টো তার ডালিমের মত রাঙা।

ছায়ার পত্রবহুল চোখে যেন সাগর-পারের ছায়া। যেন ঠিক বাঙলা দেশের মেয়ে নয়। কোন অচিন্ দেশের মেয়ে। ছায়া ডাক নাম। রাশ নাম লিলি। বেথুন বিদ্যালয়ের খাতায় আছে মিস্ লিলিয়ান মুখোপাধ্যায়।

—হুজুর, রাণীমা বললেন আপনি স্নান সেরে নিন্! বেলা প্রায় একটা বাজলো।

কথা শুনে চমক ভাঙে কৃষ্ণকিশোরের। কোথায় সে ছিল এতক্ষণ। কার ভাবনায় বিভোর। বললে,—জল দাও স্নানের ঘরে।

স্নানের ঘরে কল নেই। পুকুরের জলে চৌবাচ্ছা ভর্ত্তি করতে হয়। তার মানে সময় লাগে অনেক্ষণ। আবার বসে ঐ আরাম-কেদারায়।

দেখতে দেখতে বেলা বয়ে যায়। ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টায় ঘা পড়ে। একটা। গাছে গাছে কাকের কা-কা শুরু হয়েছে। চৈত্রের মধ্যদিনের প্রখর উত্তাপে কাকের দল তৃষায় কাতর। রৌদ্রে সূর্য্যকরোজ্জ্বল দগ্ধতা।

মা ডেকেছেন। উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর।

তার মনের মধ্যে তখন ঝড়ের তুফান উঠেছে। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ছে শিরোমণি তর্করত্নকে। কুমুদিনীকে। পিসীমা হেমনলিনীকে। আর সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে অরুণকে। আর ছায়াকে।

শিরোমণি তর্করত্নের উদ্ধত কথা। কুমুদিনীর কাতর দৃষ্টি। হেমনলিনীর সস্নেহ আদর-আপ্যায়ন। অরুণের সম্মোহনী চোখ। আর, আর ছায়া না লিলিয়ান—তার ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট দু'টোকে।

এতগুলি জীবন্ত বস্তুর সংমিশ্রণে চিন্তায় তার থেই হারিয়ে যায়। ওলট-পালট হয়ে যায় সব কিছু, মনে তার রসাতল বেধে যায়।

কৃষ্ণকিশোর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এগোতে থাকে অন্দরের দিকে। মনে পড়ে ওরা হয়তো খেতে বসেছে। চণ্ডীমহলের প্রজারা।

রান্না-বাড়ীর দিকে চলে। গিয়ে দেখে কুমুদিনী স্বয়ং তাদের আহারের পর্য্যবেক্ষণ করছেন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে। ছেলেকে দেখতে পেয়ে ফিস-ফিস ক'রে বললেন,—আর কত বেলা করবে? এধারে যে একটা বেজে গেছে! বেলা তিপ্পহর।

বাসদেও মাহাতো খেতে খেতে বলে,—হুজুর, কৃপা কর্‌কে আস্নান সেরে নিন। বেলা বহুৎ হয়েছে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—লজ্জা ক'রে খেও না বাসদেও। কে কি নেবে, তুমি তদারক ক'রো। আমি যাচ্ছি স্নান সারতে।

ওরা লজ্জা না ক'রে পরমোল্লাসে খায়। বাঙালী রান্না।

দাদখানি চালের ভাত। সোনা মুগের ডাল। আলু-পটলের দম। বড়ি-বেগুনের ঝাল। মিষ্টি কুমড়োর ছক্কা। আলু-বখরার চাটনী। মিষ্টি আর দই।

পলকের মধ্যে যেন ব্যবস্থা করেছেন কুমুদিনী। ভাঁড়ার খুলেছেন আর উনুনে তুলেছেন। ভাঁড়ার নাকি তাঁর কামধেনু। যখন যা চাইবে তাই পাওয়া যায়। অসময়ের যা, তাও।

তবুও চণ্ডীমহলের প্রজারা নিরামিষাশী। মাছ-মাংসের বালাই নেই। ওরা স্পর্শ করে না। ওরা যে মা চণ্ডীর স্থানের মানুষ। শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্যের শিষ্য। বীর হনুমানের ভক্ত।

অনেক দূর থেকে, স্নানের ঘর থেকে অঙ্গে বিলিতী সাবান ঘষতে ঘষতে

শুনতে পায় কৃষ্ণকিশোর। ওরা সমস্বরে চিৎকার করছে—হনুমান জী কী জয়!

কৃষ্ণকিশোরের মনের মধ্যে তখনও ছায়া না লিলিয়ান তার ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট দু'টো যেন কথা কইছে। কি যেন এক অব্যক্ত আবেগে সকল কিছু ছাপিয়ে মাত্র ঐ একটি বস্তুর লোভানিতে মনটা তার বারে বারে সাড়া দিচ্ছে; একটা নয়, দু'টো। ছায়ার ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট দু'টো।

কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পারে ওদের আহার-পর্ব্ব চুকলো। ওরা ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করছে।

যার যা ইচ্ছা করুক। কিন্তু ঐ শিরোমণি, সে কেন এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে।

অরুণ বলেছিল,—আরে ছোঃ! ঐ পণ্ডিতের কাছে প'ড়ে তুমি বিশ্বজয় করতে বেরোবে! ইংরিজী না জেনে বেঁচে থাকবে এই দুনিয়ায়। আরে, আরে, ও-সব শেক্ অফ্ ক'রে দাও এই মুহূর্ত্তে। সংস্কৃত, সে তো তোমার শেষ বয়সের। কথায় কথায় হাসতে শুরু করে অরুণ। বলে,—যখন তুমি গীতা পড়বে ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে। তখন। কিন্তু ইংরিজী! I can't dream even of it! মাপ করো ভাই আমাকে।

কৃষ্ণকিশোর বলেছিল,—কিন্তু মা বলেন, বাবা নাকি বলতেন, পৃথিবীর যা-কিছু সব ঐ সংস্কৃতের মধ্যেই আছে। বেদ আর বেদান্তেই সব।

আবার হেসে ফেলে অরুণ। বলে,—কিন্তু যাকে পেছনে ফেলে এসেছি তাকে যদি পেছন ফিরে আবার পাকড়াও করতে যাই, তা হলে? আমরা এগিয়ে যাব না পিছিয়ে থাকব?

আর কোন উত্তর দেয় না কৃষ্ণকিশোর। শুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যেন পেছন পানে। বৈদিক যুগের সেই শুচিস্নাত কালের দিকে। সেই

যখন আর্য্যরা ভারতবর্ষের অধীশ্বর। যখন সেই আর্য্যরা বলছে,—ত্যাগ কর। ম্লেচ্ছদের আবাস-ভূমি ঐ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ।

অরুণ তার কথার জের টেনে বলে,—আরে বেরাদার, চলে এসো হিন্দু কলেজে। তার পর দেখো তুমি নিজেই কি কর। ডিরোজিওর নাম শুনেছ? I follow his line of learning.

ডিরোজিও! হেনরী ডিরোজিও!

বিলিতী সাবানের সুগন্ধ। আর ঐ ছায়ার ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট দু'টো। হিন্দু কলেজ। কুমুদিনী। শিরোমণি আর ঐ হেনরী ডিরোজিও!

কৃষ্ণকিশোর বিলিতী সাবান অঙ্গে ঘষতে ঘষতে ভাবে, আর ভাবে। কুল-কিনারা কৈ খুঁজে পায় না। সামনের আর পেছনের টানে একাকার চিন্তায় তার ছেদ পড়ে কখনও-সখনও। কিন্তু কৈ পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না!

সে ভাবছে। অন্ততঃ একবার দেখবে চোখের দেখা। অরুণকে বলবে, এক দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হিন্দু-কলেজ। রোমান প্যাটার্ণের আকৃতির আর অদ্ভুত প্রকৃতির সাহেব শিক্ষকদের। সে চাক্ষুষ দেখতে চায়।

তোয়ালেয় মাথা ঘষতে ঘষতে স্নান-ঘর থেকে বেরোয় কৃষ্ণকিশোর। আর নিজের মনে মনে আওড়ায়,—ডিরোজিও! হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও!

টম ছিল কোথায়।

ছুটতে ছুটতে এসে পায়ের কাছে মুখ নামালো। আবদারের আতিশয্যে লেজ দুলিয়ে সামনের পা দু'টো ধরলো তুলে। লালায়িত জিব বের করে কেমন একটা ঘড়-ঘড় শব্দ করলো গলায়। তার পায়ের চতুর্দ্দিকে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলো। গলার কণ্ঠীতে ঝুমঝুমি। বাজলো তার চাঞ্চল্যে।

আর কোথায় ছিল বিনোদা! কোন্ ঘরের ভেতরে। বেরিয়ে এলো হঠাৎ। বললে,—কি ম্লেচ্ছ কাণ্ড! বাপের বয়সে দেখিনি বাবা! কুকুরের সঙ্গে মাখামাখি। জাত-জন্ম কিছু আর রইলো না। বিদেয় কর, এক্ষুণি বিদেয় কর! চান ক'রে বেরিয়েই কুকুর?

কৃষ্ণকিশোর হেসে ফেললো তার ধরণ-করণ দেখে। বিনোদা রাগ করলে মজা পায় সে। তাকে চটিয়ে দেয় যখন-তখন। পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। ক্রোধের মাত্রা তার যত বাড়ে, তত বেশী হাসি পায় কৃষ্ণ-কিশোরের। হাসতে হাসতে বললে,—তোমার আবার জাত আছে নাকি?

খ্যাঁক ক'রে উঠলো যেন বিনোদা। বললে,—না, তা থাকবে কেন! যত জাত আছে তোমার। আমার সাতপুরুষে কখনও কুকুরকে মাথায় তোলে না। ছুঁলে পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে হয়। জানো?

কৃষ্ণকিশোর চাপা হাসির সঙ্গে বলে,—কিন্তু কুকুরও ভগবানের সৃষ্টি। কেমন প্রভুভক্ত জাত। কত কাজে লাগে।

তেলে-বেগুনে যেন জলে উঠলো বিনোদা। বললে,—থাক্, ঢের হয়েছে! তোমাকে আর ভগোবানের ছিষ্টি দেখাতে হবে না। তোমার আবার ভগোবান! এখন চান হয়েছে তো যাও না, গিয়ে খেতে বস'গে যাও না। বেলা যে দু'টো!

এবার পরিহাস নয়। সহানুভূতির সুরে বললে সে,—বিনোদা, তোমার খাওয়া হয়েছে?

বিনোদার কণ্ঠস্বরে কোন পরিবর্ত্তন নেই। বলে,—আজ্ঞে না। আগে আপনি অনুগ্রহ ক'রে খেতে যান। খেয়ে মাকে খেতে দিন। তার পর দাসী-বাঁদীরা সব খেতে বসবে তো! ইস্, দরদ কত! খাওয়া হয়েছে কি না আবার জিগ্‌গেস করা হচ্ছে!

রান্না-বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় সে। বিনোদার সব কথা হয়তো কানে যায় না তার। আপন মনে বলতে থাকে বিনোদা একা দাঁড়িয়ে। বলে,—ছিষ্টিছাড়া ছেলে বাবা! দেখিনি কখনও এমন। সময়ে চান করবে না, সময়ে খাবে না—যত অনাছিষ্টি কাণ্ড! আর তেমনি কি মা হয়েছেন? কোথায় শাসন করবে তা নয়, আদরে আদরে গোল্লায় পাঠাচ্ছে ছেলেকে! ক'দিন আবার পাঠশালায় যাওয়া নেই, পড়াশুনোর বালাই নেই! গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ছেলে। ধন্যি ছেলে বাবা! কি হবে কে জানে।

হাতে কাজ না থাকলে খাস-কামরায় চলে যান কুমুদিনী।

সেখানে গেলেই যেন একটু শান্তি। আর কোথাও নয়। এত বড় চার-মহলা বাড়ী কেন, এই পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গেলে কুমুদিনী সকল জ্বালা জুড়াতে পারেন। কোথাও নয়, আর কোথাও নয়। ছেলেকে ঠাকুরঝি হেমনলিনীর হেফাজতে রেখে একে একে ভারতের প্রায় সকল তীর্থের ধূলি মেখে এসেছেন মাথায়। শ্রীচরণ দর্শন ক'রে এসেছেন। কষ্টসাধ্য সেই যাত্রায় এতটুকুও ক্লেশ প্রকাশ করেননি। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, তবুও নয়। এত ঘুরেছেন, এত দেখেছেন। কিন্তু মন তাঁর বাঁধা পড়লো না কোন দেবতার ছুয়োরে। পাদস্পর্শ করেছেন আর বলেছেন,—স্থান দাও তোমার চরণে। আমি আর পারছি না।

নিরুত্তর দেবতার দল চোখ চেয়ে দেখেছেন মাত্র। আহ্বানের সাড়া পাওয়া যায়নি।

কুমুদিনী মনে মনে সর্ব্বক্ষণ চলে যেতে চান। কিন্তু পারেন না।

তিনি চলে গেছেন। তারপর এক মুহূর্ত্ত শরীরে প্রাণ থাকবে! কুমুদিনীও চলে যেতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন,—একলা যেতে দেবো না। কিছুতেই নয়। তোমরা আয়োজন কর। সতীদাহ—

সতীদাহ! মৃতদেহ তখনও বাড়ীর বাইরে যায়নি। তাঁর পায়ে মাথা রেখে কথাগুলি বলেছিলেন কুমুদিনী। আত্মীয়-স্বজন আর আমলারা শিউরে উঠেছিল এমন কথা শুনে। কারণ কুমুদিনী কথা বলেন না, পণ করেন। তাই ভয়ে সব আঁৎকে ওঠে সেদিন। সতীদাহ! শেষে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেন,—নাবালক সন্তান বর্ত্তমানে এই অনুষ্ঠান অকর্ত্তব্য। মহাপাপ।

তাই ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারেননি কুমুদিনী। সঙ্গ হারিয়েছেন তাঁর। তিনি চলে যাওয়ার পর ঠাঁই নিয়েছেন ঐ খাস-কামরায়। কৃষ্ণ-চরণের স্মৃতি-মন্দিরে। আলমারীতে বই, দেরাজে পোষাক, পালঙে শয্যা। —যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। আর রয়েছে কৃষ্ণচরণের নিত্য-ব্যবহার্য্য কয়েকটি দ্রব্য—ট্যাঁকঘড়ি, নবরত্নের আঙটি, মসলা খাওয়ার ডিবে, চশমা, কলম, জল খাওয়ার গেলাস, ওষুধ খাওয়ার খল আর তালতলার পাদুকা এক জোড়া।

একখানা মাদুরের 'পরে ব'সে ব'সে নিঃশব্দে পড়ছিলেন কুমুদিনী। কাশীরাম দাসের মহাভারত। কখন এসেছেন কে জানে! অবসর পেলেই চলে আসেন এই ঘরে। কখনও বা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ। বসে থাকেন যেন কি এক ডাকের প্রতীক্ষায়। ডাক আসবে তাঁর। তাঁর ডাক আসবে।

—কুমুদিনী, কুমুদিনী!

কেউ ডাকে না, তবুও কানে যেন ডাক শোনেন। কা'কেও দেখতে পান না। এত বড় চার-মহলা বাড়ীর কোথাও কেউ নেই। কোথা থেকে ডাকছেন। কোথায় তিনি।

সেই সেখানেই চলে যেতে চান কুমুদিনী। কিশোর এখন বড় হয়েছে, আর কোন বাধা নেই। কিন্তু সত্যিকার ডাক না এলে কোথায় যাবেন।

তাইতো ঐ ছবি দেখে প্রতি মুহূর্তে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বলেন,—আমাকে নাও। আমি আর পারছি না।

শিল্পীর সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়।

শুধুই ছবি। শুধু পটে লিখা। কৃষ্ণচরণ শুধু তাকিয়ে থাকেন—কথা বলেন না। চক্ষে তাঁর আহ্বানের ইঙ্গিত। কাছে যাও, কথা নেই। ঈশ্বরের সৃষ্টি কৃষ্ণচরণ আজ স্বর্গত। শিল্প তাঁকে ধ'রে রাখলো মানুষের চোখে। দান করলো অমৃতত্ব।

কুমুদিনী অবসর পেলেই তাই চলে আসেন এ ঘরে। তিনি নেই, তাঁর ছায়া আছে। যেদিকে তাকাও তাঁর স্মৃতির চিহ্ন। যেন এখুনি আসবেন ব'লে চলে গেছেন। আর ব'সে আছেন কুমুদিনী অবিরাম প্রতীক্ষায়।

—'ছেলে না হয় খেতে বসলো এতক্ষণে। এবার তোমার কখন হবে শুনি ?' কোথা থেকে বিনোদা এসে হাজির হল। কথা বললে তিরস্কারের স্বরে। বললে,—বলি, বাড়ীতে আজ আর নোকজনের পেটে ভাত পড়বে না তোমাদের জন্যে ?

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন কুমুদিনী। বই রেখে উঠে পড়লেন তক্ষুণি। বললেন,—কিশোর খেতে বসেছে ? ডাকিস্‌নি আমাকে ? আহা বাছা রে—

বিনোদা বললে,—তোমার বাছা খাচ্ছে। তুমি এখন খাবে চল দিকিন।

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ত্রস্তপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কুমুদিনী। চললেন রান্না-বাড়ী।

খেতে বসেছে, আহারে মন নেই।

দূর থেকে দেখেই বুঝলেন কুমুদিনী ছেলে তাঁর বসে আছে ভাতের গ্রাস হাতে তুলে। দাঁতে কাটছে না। পাতের ভাত যেমনকার তেমনি। বুঝলেন তার মন ঠিক নেই। চঞ্চল। ভাবলেন, সে হয়তো তার লেখা-পড়ার বিষয় নিয়ে ভাবছে। বলেছে তো, ভেবে বলবে দু'-চার দিন পরে।

—কিছু খাচ্ছ না কেন? কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন কুমুদিনী।

কি ভাবতে ভাবতে হেসে ফেললো সে। হঠাৎ। খুশীর সুরে বললে, —খাচ্ছি তো। তুমি কোথায় ছিলে?

খেতে শুরু করে কৃষ্ণকিশোর। কুমুদিনী বসেন এক পাশে। মাছি তাড়াতে হাতে হাত-পাখা। বলেন, এটা খাও সেটা খাও। সে খায় আর থেকে থেকে হাসে একেকবার। নিজের মনেই।

কুমুদিনী বলেন,—হাসছিস্ কেন রে? কি হল আবার?

কৃষ্ণকিশোর হাসি চাপতে চেষ্টা করে। কথা ঘোরায়। হাসছে কেন তা বলে না। বলে,—তোমার বিনোদা বলছে যে টমকে বিদেয় ক'রে দিতে। বল' তো তুমি?

কুমুদিনী একটু হাসেন। বলেন,—আমার নাটমন্দিরে তোমার কুকুর না উঠলেই হল। তা তুমি যা-খুশী কর। দুঃখ আর শোকের প্রবাহে তাঁর এই হাসি এখনও মুখ থেকে মিলিয়ে যায়নি। স্বল্প সলজ্জ হাসি। বললেন,—তোমার খাওয়ায় মন নেই। পিসীমা মোয়া পাঠিয়েছেন তোমার জন্যে। জয়নগরের মোয়া। আর তোমার মহল থেকে ঐ দই এসেছে। মোয়া আর দই মেখে খাও, বেশ ভাল লাগবে।

কুমুদিনী উঠে পড়লেন। মোয়া আনতে। আর কিছু নেবে কি না, আর কিছু দেবে কি না তাই জানতে রান্না-ঘরের দুয়োরে দাঁড়িয়েছিল ব্রাহ্মণী। কুমুদিনী বললেন,—একখানা রেকাবী পাতের কাছে বসিয়ে দাও তো ব্রাহ্মণী।

জমিদারী কায়দা, সবেতেই দেরী। সবেতেই গড়িমসি। ঘুমুতেও যেমন, ঘুম ভাঙ্গতেও তেমন। স্নান করতে যেমন, খেতেও তেমন। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। একবার এটা, একবার সেটা। খাচ্ছে না তো ঠোকরাচ্ছে যেন। চাখছে। শুধু ঐ সাজিয়ে দেওয়াই সার। ভাতের চূড়ো ভাঙ্গে না কোন দিন। এতগুলো ব্যঞ্জনের বাটি একটাও কি শূন্য হয়। একটা বাটা মাছও সম্পূর্ণ খেতে পারে না। একটা কচি রুইয়ের মাথা, তাও নয়। কাঁটা, কাঁটা লাগে গলায়।

হেলতে-দুলতে হাঁফাতে হাঁফাতে বিনোদা এসে দাঁড়ায়। মুখ খিঁচিয়ে বলে,—তোমার যে খাওয়া আর হয় না দেখছি! মা বুঝি আজ আর খাবে-দাবে না? উদিগে যে দু'টো, সে খেয়াল আছে?

কুমুদিনী মোয়া দিয়ে আবার বসেন হাত-পাখা নিয়ে। বলেন,—তুই থাম্ তো বিনো!

কৃষ্ণকিশোর লজ্জা পায় এ কথায়। বলে,—ব্রাহ্মণী, মাকে ভাত দাও না। আমি কি খেতে বারণ করেছি?

বিনোদা বলে,—হ্যাঁ, এবার ঐ আঁশের মধ্যিখানে মাকে ভাত দেবে!

সত্যিই কুমুদিনীর আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট। লুকিয়ে লুকিয়ে। বৈধব্যের অপরাধে নিরামিষ ভোজন। হবিষ্যান্ন। শূদ্রের চক্ষের অন্তরালে। ঐ নিরামিষ রান্না-ঘরের ভেতরে। এক পাশে। খাওয়া-দাওয়ার পরেই কেমন যেন আলস্য ধরে। কেমন যেন নড়তে-চড়তে ইচ্ছা হয় না। চক্ষে জড়তা। সদরের দিকে এগোয় সে ভাজা মসলা চিবোতে চিবোতে। সেই হল্‌ঘরের দিকে বৈঠকখানার ঘর। স্নানের পরেই ভাত খেয়েছে আর খেয়েছে দই—সামান্য মাদকতার আমেজ শরীরে। যেন অবসন্নতা।

হল্‌ঘরের ফরাসে দাঁড়িয়ে ঝাড়ের আলো দুলিয়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়লো একটা তাকিয়ায় মাথা রেখে। ঘরের বাইরের দালানে একটা উজবুক

হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলো। হুজুর এসে পড়েছেন, সে বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ দেখতে পেয়েই হাত চালাতে শুরু করলো। ঘরের ভেতরে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দের সঙ্গে শালুর ঝালর দেওয়া টানা-পাখা চলতে শুরু হ'ল। এক জন তাঁবেদার পিচকারী হাতে জল ছিটিয়ে দিয়ে গেল দরজায় দরজায়। খসখসের হিমকণাবাহী স্নিগ্ধ সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দ্দিকে। আর সে ঐ ঝাড়ের হরেক রকম আলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। কাচের মালার আবেষ্টনে পঁচিশ বাতির ঝাড়—পঁচিশটা ফুটন্ত শ্বেতপদ্ম। এক বৃন্তে ঝুলছে। আলো জ্বলছে আর কত রকমের রঙ দেখা যাচ্ছে। লাল, হলদে, নীল, বেগুনী, সোনালী, রূপালী। মুহুর্মুহু রঙ বদলাচ্ছে। এক রঙ থেকে আরেক রঙে। রাশি রাশি পলকি হীরেয় যেন তৈরী ঐ আলো। কাট্-গেলাসের আলো।

তবুও এখন বাতি জ্বলছে না। দিনের বেলা।

কিন্তু বেলা-শেষের দেরী কত আর? তার মানে রোদ্দুর পড়তে আর কতক্ষণ। ভয় তো তার সূর্য্যের প্রখর বহ্নি-তাপকে নয়, ভয় মাকে। কুমুদিনীকে। নয় তো সে কি আর বসে থাকতো এতক্ষণ। কখন বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু একবার বেরোতে হলে কত কিছুর দরকার হয়। প্রথমেই হয় কুমুদিনীর মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হওয়ার। তার পর দাও কোথায় যাওয়া হচ্ছে তার হাজারো কৈফিয়ৎ। তার পর কত কি।

কিন্তু সূর্য্যাস্তের সময় বেরোতে পারো। সন্ধ্যার আগে ফিরে আসা চাই। কুমুদিনী নিষেধ করবেন না। দিন-রাত্তির ঘরে বসে থাকা, তাও তাঁর পছন্দ নয়। সকাল-সন্ধ্যা হাওয়া খেতে যাও, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। পারো তো বেড়িয়ে এসো না পায়ে হেঁটে। গড়ের মাঠে। পরিশ্রম হবে, স্বাস্থ্যোন্নতি হবে।

কিন্তু বসন্ত কালের বিকেল। চৈত্র-গোধূলির দিন। দক্ষিণা বাতাস আর কোকিলের কুহু-কুহু। স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ। কচি সবুজ পাতার বাহার। নানান ফুলের মিলন। কে যাবে মাঠে বেড়াতে। ঘাম ঝরাতে।

ঘড়ি-ঘরের নিশানা। তিনটে বাজলো। বেলা তিনটে। একটা আনন্দের ক্ষণ-অনুভূতির আস্বাদ পায় যেন সে। অন্ততঃ ভাবতেও ভাল লাগে আজ কোথায় যাবে সে। আজ বিকেলে। যাবে ঐ অরুণেন্দ্র, অরুণ, অরুদের বাড়ী। রিপন ষ্ট্রীটে।

খাস-খানসামাকে ডাকলো কৃষ্ণকিশোর। সদাক্ষণ কাছাকাছি থাকে সে, কখন কি প্রয়োজন হুজুরের। কৃষ্ণকিশোর ডাকলো,—এই অনামুখো। শুনে যা।

অনামুখো আদরের ডাক। খুব যখন খুশী থাকে তখন এই নামে ডাকে। আসল নাম অনন্ত, অনন্তরাম। বর্দ্ধমানের মানুষ।

অনন্ত ঘরে ঢুকেই বলে,—আচ্ছা, তোর কি আক্কেল হবেনি কখনও? মানা করি নাই যে অনামুখো কথাটা আর ক'স্ নে কারও সমক্ষে?

সে তখন উঠে বসে পড়েছে। হাসতে হাসতে বলছে,—অনন্তদা, তুমি রাগ কর? আর কক্ষণও বলব না।

অনন্তরাম বলে,—তা রাগ করব না? কথাটি কি এমন মিষ্টি যে শুনে পুলক হবে আমার! জানিস্ কিশোর, তোর বাবা বলতেন, অনন্ত, তুমি আমার ছেলে। তুই তখন কোথায়? কার ঘরে বুড়ো হয়ে বসে আছিস! তা এখন ডাকছিস কেন তাই বল্ কেনে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—আমার ঘরে যা। দেরাজ খুলে কোঁচানো কাপড়, ফতুয়া, আসমানী অর্গাণ্ডির পিরান আর ভেলভেটের জুতোটা নিয়ে আয়। আয়না-চিরুণীও চাই। আর একটু আতর আনবি—খস-খস। আমি বেরুবো এখুনি।

অনন্তরাম বললে,—বাইরে যা চড়চড়ে রোদ, একটু পরে যাস্‌'খন। কোথায় যাবি পুড়তে?

কৃষ্ণকিশোর তখন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলছে—যা না তুই, নিয়ে আয় না। তোর যেতে-আসতে রোদ প'ড়ে যাবে।

—বৌমা যদি শুধোয়, কোথায় চললি তুই? কি বলব? অনন্তরাম নিজেকে বাঁচাবার জন্যে জিজ্ঞেস ক'রে নেয় কথাটা।

চোখ বন্ধ ক'রে খানিক ভাবে কৃষ্ণকিশোর। বলে—বল্‌বি, গড়ের মাঠে যাবে। বেড়াতে যাবে। কিছু বলবে না মা।

—সত্যি কথা? জিজ্ঞেস করলো অনন্তরাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি কথা। যা না তুই, নিয়ে আয় না। কথার শেষে হেসে ফেললো কৃষ্ণকিশোর। অনন্তরামও হাসলো সেই সঙ্গে। হাসতে হাসতে খস-খস সরিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অনন্তরাম গোপ। রাঢ়ী শ্রেণীর গয়লা। বর্দ্ধমানের মানুষ। যশোহর জেলায় হাজরাপুর মোতালকে নীলের কুঠীতে অনন্তরাম কাজ করেছে এক কালে। নীল বানরের দল যখন কয়েদ রেখে কিছু করতে পারছে না, তখন হাত তুললে লোকের গায়ে। শঙ্কর মাছের চাবুক চালাতে শুরু করলে ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে খুশী। লাথি মারলে কত লোকের পেটে, পিলে ফেটে মরে গেল কেউ কেউ! অনন্তরাম কয়েদ ছিল সাত দিন। একবিন্দু জল পর্য্যন্ত খেতে দেয়নি, আলোর মুখ দেখতে দেয়নি। অন্ধ-ঘর। শেষে খালাস পেয়ে এক দলের সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে পালিয়ে আসে। এসে কিছু দিন পরেই কাজ নেয় কৃষ্ণচরণের কাছে। তাঁর পায়ে মাথা রেখে বলে—হুজুর, আমি আপনার দাস।

সে আজ অনেক কাল আগের কথা। সেই থেকেই দাসত্ব করছে অনন্তরাম। দেশে যায় না কখনও। কুল-শীলের প্রশ্ন উঠলে বলেছে,—

'ছিল আমার সবই। বাপ-মা ছিল, নয় তো এলাম কেমনে? ঘর-বাড়ী সব ছিল।' সে যখন হাজরাপুরে তখন এক বন্যা এসেছিল দামোদরে। তাতেই সব ভেসে গিয়েছিল। বাপ, মা, এক ভাই, দুটো বোন আর তাদের ঘর-বাড়ী ঐ দামোদরের গর্ভে ইহলীলা সম্বরণ করেছে। দু'জোড়া বলদ আর ছ'টা গাই। অনন্তরাম চিরটা কাল তাই কৃষ্ণচরণের পদ-সেবা ক'রেই কাটাতে চেয়েছে। কিন্তু মধ্যে থেকে তিনি চলে গেছেন। অনন্তরাম কত রাতে স্বপ্ন দেখে, কর্ত্তা যেন তাকে ডাকছেন। বলছেন, অনন্ত তামাক দাও। অনন্ত, পায়ে একবার হাত দাও। অনন্ত, অনন্ত, অনন্ত!

অনন্তরাম কৃষ্ণচরণের পা টিপতো শুধু। ফাই-ফরমাস খাটতো। তামাক সেজে দিতো। কর্ত্তা পান খেতেন আর অনন্তরাম ডিবে ধ'রে থাকতো। পিকদানি।

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও!

কৃষ্ণকিশোর ফরাসে দাঁড়িয়ে ভাবছিল যে, আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। অরুণকে বলবে,—কাল চল দেখিয়ে আনবে হিন্দু-কলেজ। আমি দেখতে চাই। আমি ভর্ত্তি হবো ঐ স্কুলে। পড়বো, ইংরেজী পড়বো। রাজার ভাষা শিখবো। রাজভাষা। অরুণেন্দ্র মুখে মুখে কত গল্প বলেছে ডিরোজিওর সম্বন্ধে। যত বলেছে ততই সে আকৃষ্ট হয়েছে। ততই সে মন থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে সেই মানুষটিকে। বাঙালীর বন্ধু সেই ফিরিঙ্গি সাহেবকে।

অরুণেন্দ্র বলেছে,—যেদিন খুশী চল। As you like it. আমি তাঁকে দেখাবো, আলাপ করিয়ে দেবো। দেখবে কত তিনি ভালবাসেন। How much he loves the students! দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তাঁর ব্যবহারে you will be charmed. তার ওপর সব চেয়ে বড় কথা —the man is a poet.

কবি। জাত-কবি। স্বভাব-কবি ডিরোজিও। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। জনৈক ব্যবসায়ী ফ্রান্সিস ডিরোজিওর সন্তান। ১৮০৯ সালের ১০ই এপ্রিল কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কবি, দার্শনিক, নিরীশ্বরবাদী, সাংবাদিক, শিক্ষক ডিরোজিও। অরুণেন্দ্র ডিরোজিওর ইতিবৃত্ত শুনিয়েছে।

অনন্তরাম ঘরে ঢুকলো খসখস সরিয়ে। তার দু'হাতে সাজসরঞ্জাম। কৃষ্ণকিশোর বললে,—অনন্তদা, মা কিছু বললেন!

—হ্যাঁ, বললেন বৈ কি। বললেন,—কোথায় আবার! আমি বললাম, গড়ের মাঠে। ঠিক বলি নাই?

সহাস্যে সম্মতি জানালো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—অনন্তদা, আমি পরছি, তুমি যাও। আবদুলকে বল গাড়ীতে ঘোড়া জুতবে।

সে পোষাক বদলায়। চুল ফেরায়। কানে আতরের তুলো পূরে দেয়। তার পর ভেলভেটের জুতো পায়ে দিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসে। জুড়ি ঘোড়া পা ঠুকে ছুটতে থাকে টগবগিয়ে। তীরের বেগে। সওয়ার জানতে পারে না কোথা দিয়ে সময় চলে যায়। এতটা যে পথ তাও শেষ হতে চললো প্রায়। সে ভাবছে খুব যা হোক অবাক করবে অরুণকে। একেবারে না বলে-কয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির! একবার সে শুধু জানিয়ে দেয় গন্তব্য। বলে,—আবদুল, সেই অরুণ বাবুর বাড়ীতে যাবো।

হাওয়ার বেগে চলেছে আবদুলের গাড়ী। সে শুধু ঘোড়ার কানের পাশে চাবুক পাক খাওয়াচ্ছে। পথের লোকজন আগেভাগে সরে যাচ্ছে দু'পাশের বাড়ীর নীচে; দোকান-ঘরের দরজায়। আর থেকে থেকে পায়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছে আবদুল। সাবধানী ধ্বনি—ঢং ঢং ঢং ঢং।

আজকে যা হয় একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

একে একে দিন চলে যাচ্ছে। সময় চলে যাচ্ছে। ক'দিন বই খুলে পড়তেই বসেনি সে। ছুটি ভোগ করছে মনের আনন্দে। পড়াশুনায় মন নেই, কারণ, তার পাঠ্য পুস্তকে কোন রসের খোরাক নেই যে—নীরস বিষয়। ব্যাকরণ আর অলঙ্কার। অং বং সং, নরঃ নরৌ নরাঃ, তদ্ধিত প্রত্যয়, করণে তৃতীয়া, ভাবে সপ্তমী আর অলঙ্কারের এটা-সেটা মাত্রা—কাঁহাতক পড়তে পারে মানুষ। পড়ছে তো পড়ছেই। শেষ হবে না কোন দিন ?

কিন্তু তার বয়সের আর আর ছেলেরা শিখেছে কত কি। কত দেশ-বিদেশের কথা, কত কাহিনী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাদের চোখের সামনে। সে শুধু ব্যাকরণ-অলঙ্কারের গণ্ডীতে বাস করছে। তারা সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে, আর সে কি না পুরানো সেকেলে পুকুরের তীরে শুধু দাঁড়িয়ে রইলো। কূপমণ্ডূক হয়ে রইলো।

ইদিকে সাহেব-সুবোর বাস। ফিরিঙ্গিপাড়া।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোলাহল নেই, কলরব নেই। শান্তির নীড় একেকটি। হোয়াইট হার্ট কটেজ, গ্রীন ভ্যালি, দি রিট্রিট, সুইট হোম, তার পরেই নর্মান লজ্। একতলা বাড়ী, সাহেবী কায়দায় তৈরী। বাড়ীর সমুখে গাড়ী-বারান্দা ঝুলছে। বারান্দার নীচে থামের গায়ে মাধবীলতার বেষ্টন। সিঁড়িতে কাঠের সবুজ রঙের টবে রকম-বেরকমের পামের সারি আর ফার্ণ নানা জাতীয়। এ্যাশ্পায়ারা।

ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে কাকেও দেখতে পায় না কৃষ্ণকিশোর। কেউ কোথাও নেই। ড্রইং-রুমে শূন্য সোফা। দেওয়ালে দা-ভিঞ্চির আঁকা যীশুর শেষ-ভোজনের ছবি। মেরীর কোলে নবজাতক যীশুর ছবি—সেই সঙ্গে কি একটা ক্যারলের স্বরলিপি একসঙ্গে পাশাপাশি বাঁধানো। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি। আর একখানা ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবের ছবি।

ভেতর থেকে, অনেক ভেতর থেকে মৃদু-মন্দ ঠুং-ঠাং ধ্বনি ভেসে আসছে। ক্ষীণ তরঙ্গায়িত ঝঙ্কার। চারি দিক নিস্তব্ধ তাই শোনা যায়, নয় তো এ সুর দূরের মানুষের কানে পৌঁছবে না। এক কৃষক বালিকার আক্ষেপের সুর। ভেড়ার পাল নিয়ে সে মাঠের দিকে গেছে। কথা ছিল দয়িতের দেখা দেওয়ার, কথা কওয়ার। কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সে পুরুষ আজও আসেনি। আসতে পারে নি। কৃষক-বালিকা প্রতীক্ষা-কাতর কণ্ঠে শেষে গান গাইতে শুরু করে। কান্নার সুরে। পুরুষ চলে গেছে ভিন্ দেশে—অভাবী, তাই ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে।

কৃষ্ণকিশোর মুগ্ধ হয়ে যায় এই ধীর যন্ত্র-সঙ্গীতে। পিয়ানো বাজায় কে ভেতরে, অনেক ভেতরে। কি এমন ব্যথা যে, তার এই কান্নার বাজনা বাজাতে হবে! একটা বাচ্ছা খানসামা এসে দাঁড়ায় তার পাশে। সে বলে,—সাহেব কোথায়?

খানসামা শুধোয়,—কোন্ সাহেব? বড় না ছোট?

অর্থাৎ পিতা না পুত্র। সে বললে,—ছোট সাহেব।

খানসামা তৎক্ষণাৎ বলে,—কোঠিমে হায় নেই। কালেজ গিয়া।

ইতিমধ্যে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন বিনয়েন্দ্র, অরুণের বাবা। এক হাতে তাঁর ধূম্রমান পাইপ আর অন্য হাতে তর্জ্জনীর দ্বারা পৃষ্ঠা-চিহ্নিত কি একখানা বই। সোনার জলের নাম দেখা যায় দূর থেকে। মরক্কো বাঁধাই। তাঁর পরনে পাৎলা কাপড়ের আলগা পায়জামা আর সুতীর কিমানো। রেশমী দড়িতে কোমর-বাঁধা। প্রথমে চিনতে পারেননি। কাছে এসেই চিনতে পারেন। বলেন,—আরে তুমি এসেছো, কিন্তু তোমার friend এখনও যে ফেরেনি! Sit down my boy. সে এখনই আসবে।

কথার মাঝে হাতের বই একটা তেপায়ার 'পরে রাখলেন। নিজে বসলেন একটা সোফায়। সে বসলো আরেকটায়।

বিনয়েন্দ্র অভিজ্ঞ মানুষ, দেখলেই বোঝা যায়। মুখে তাঁর বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি এখনও। ফর্সা রঙ আর ফ্রেঞ্চ-কাট শ্মশ্রুতে মনে হয় তিনি এ দেশের মানুষ নন। চুলে সামান্য পাক ধরলেও সাত ফিট লম্বা লোকটির শরীরে বার্দ্ধক্যের ছায়া বড় সামান্য। কপালের রেখা কয়েকটি স্পষ্ট। মাথার কেশ পেছন দিকে তোলা। চোখে প্যাসনে।

বিনয়েন্দ্র জানতেন কৃষ্ণকিশোরের পূর্ব্বপুরুষকে। আলাপ ছিল না, তবুও পরিচয় জানতেন। জানতেন যে, বাঙালী ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে তাঁরা কলকাতার অন্যতম সম্মানী ব্যক্তি। যশ, খ্যাতি এবং অর্থের প্রাচুর্য্যে তাঁরা স্বনামধন্য। বললেন,—তুমি কি ঠিক করলে? কি পড়তে চাও, ইংরেজী না সংস্কৃত?

কিছু কিছু জানতেন বিনয়েন্দ্র। জানতেন যে, কৃষ্ণকিশোর সম্প্রতি ইংরেজীর দিকে ঝুঁকেছে। তাঁর ছেলের কাছে এমন ইচ্ছে নাকি প্রকাশ করেছে। সে বললে,—এখনও কিছু ঠিক হয়নি। অরুণ আমাকে বলেছে যে ডিরোজিওকে দেখাবে। তাঁর কাছে যদি পড়তে পাই তো হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হব।

—ডিরোজিওকে দেখাবে! বিনয়েন্দ্রর কপালের বলিরেখা কুঁচকে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। বললেন,—ডিরোজিওকে দেখাবে! What do you mean by it? ডিরোজিওকে সে কোথা থেকে দেখাবে? How fun! He is dead now. বহু কাল হ'ল তিনি Lord God-এর কাছে চলে গেছেন।

কথাগুলি শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ে সে। বিস্ময়ে হতবাক্। এত দিনের সকল আশা আর স্বপ্ন ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নিজের বিদ্যা-ধারায় এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যাঁর আশায় সে একটা আমূল পরিবর্ত্তন

করতে চেয়েছে, সেই মহাজন আর ইহলোকে নেই? সে বলে,—তবে অরুণ যে বললে, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।

তার কথার মাঝেই হাসতে শুরু করলেন বিনয়েন্দ্র। দাঁতে পাইপ কামড়ে হাসতে হাসতে বলেন,—Oh, God! তুমি বুঝি জানো না? অরুণের কথায় মেতে উঠেছো! তুমি জানো না অরুণের মস্তিষ্ক সামান্য একটু বিকৃত, a bit cracked?

আরও বিস্মিত হয় কৃষ্ণকিশোর। তার মনে হয় অরুণেন্দ্র নয়, যিনি এখানে ব'সে কথা বলছেন আর হাসছেন তিনিই বোধ হয় উন্মাদ। নয় তো এমন ধরণের কথা কেন? সে বললে,—না, আমি জানতাম না তো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, Lord God তাকে সব কিছু দিয়েছেন। কিন্তু একটি জিনিষ যা না থাকলে মানুষকে মানুষ বলা যায় না, শুধু সেইটি থেকে অরুণকে বঞ্চিত করেছেন। সেটি হচ্ছে rationality! বিচার-বুদ্ধি। তুমি বুঝি জানতে না? হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হলেন বিনয়েন্দ্র। মুখে পাইপ তুললেন। ধোঁয়া ছাড়লেন এক মুখ।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না, আমি জানি না।

—তবে বলি শোন'। আমার ফাদার ছিলেন ডিরোজিওর একজন প্রিয়তম ছাত্র। তোমাদের কালীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জ্জীদের সহপাঠী ছিলেন। বিনয়েন্দ্র বলতে থাকেন চিবিয়ে চিবিয়ে দাতে পাইপ কামড়ে,—ডিরোজিওর বাসায় যাওয়া-আসা করতেন আমার ফাদার। ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েসনের একজন নামজাদা বক্তা ছিলেন তিনি। ডিরোজিওর কাছেই লক্, রীড্, ষ্টুয়ার্ট আর ব্রাউনের মতামত জেনেছিলেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল' আর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কাগজে রীতিমত লিখতেন নানা বিষয়ে। সেই ডিরোজিও? He died in 1831 ···

কিন্তু ডিরোজিও কোথায় ?

অরুণেন্দ্র কেন মিথ্যা আশার ছলনায় তাকে বিভ্রান্ত ক'রেছে। অরুণেন্দ্র, অরুণ, অরুর মস্তিষ্ক বিকৃত! সে এতক্ষণ বুঝতে পারে নি কোথায় সে বসে আছে। চোখের সামনে দেখতে পায় না কোন কিছু। এটা কি তাদের বাড়ী, গড়ের মাঠ, রাস্তা, না অরুণদের বাসা ? এটা কোথায়। ভেতর থেকে, অনেক ভেতর থেকে সেই মৃদু-মন্দ যন্ত্র-সঙ্গীতের ক্ষীণ শব্দ—তাতেই সে আত্মস্থ হয়। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

বিনয়েন্দ্র লক্ষ্য ক'রে দেখছিলেন প্যাস্‌নের ভেতর থেকে।

দেখছিলেন কৃষ্ণকিশোরের জামার চারটে বোতাম। হাতের আঙটি। দেখছেন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে। হঠাৎ বললেন,—তোমার ঐ বোতামগুলো কি বস্তু হে ? Diamond ?

প্রশ্ন শুনে লজ্জিত হয় সে। সলজ্জায় বলে,—না না, ডায়মণ্ড নয়। আলেকজান্দ্রিয়া। বাবা ইটালী থেকে আনিয়েছিলেন কাকার জন্যে। কাকা তো মারা গেলেন ঘোড়া থেকে প'ড়ে। আমি পেয়েছি এখন।

তার কথায় কান নেই, বিনয়েন্দ্র তখন উঠে প'ড়েছেন সোফা থেকে। পাইপ কামড়াতে কামড়াতে একটা কাচের আলমারীর সমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কি যেন খুঁজতে থাকেন। বুক-কেস। বিলেতী বাঁধাই এক সেটের সব বই। ইংরেজী কেতাব। লণ্ডনে ছাপা। কি বই ? এত চমৎকার সুদৃশ্য এক ধরণের এতগুলো বই! সোনালী নক্সা আর নাম বন্ধনীতে। সে তো আর ইংরেজী পড়তে পারে না। বিনয়েন্দ্র হাতের পাইপ তেপায়ার 'পরে ঠকাস ক'রে নামিয়ে রাখলেন। পেয়ে গেছেন তিনি। যে খণ্ড তাঁর প্রয়োজন। বইয়ে চোখ রেখে সেখান থেকেই বললেন চাপা গলায়,—Ridingএ তোমার কাকার মৃত্যুসংবাদ জানি আমি। Most tragic and full of deep sentimental pathos.

কথাগুলো শুনে সে সত্যিই চমকে উঠেছিল। এত গম্ভীর স্বর। সে আর কি তখন সেখানে আছে। বিভ্রান্তি আর ঐ দূরের যন্ত্র-সঙ্গীত, বিস্ময় আর ঐ ঠুং-ঠাং ধ্বনি! সে তখন ভাবছে একবার যদি দেখা পাওয়া যায় এই সময়ে। মাত্র একবার। সেই ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট আর অপেল পাথরের মালা—একবার যদি ঐ পর্দা সরিয়ে দেখা দেয়। আসে সেই রকম হাসতে হাসতে। মুক্তোর মত দাঁতের সারি দেখিয়ে।

বিনয়েন্দ্র এক পলকে দেখে নিলেন বইয়ের একটি পাতা খুলে। কিন্তু কি বই? কি দেখবার প্রয়োজন হ'ল। শব্দকোষ—ইংরেজী শব্দকোষ। বৃটেনের এনসাইক্লোপেডিয়া মন্থন ক'রে দেখলেন, কি বস্তু ঐ আলেক-জান্দ্রিয়া। দেখলেন একপ্রকার জহরৎ, ক্ষণে ক্ষণে দ্যুতি বদল হয় যার। আর অন্ধকারে যার ভিন্ন ভিন্ন রঙ। একেক বেলায় একেক রকম। আলেকজান্দ্রিয়া! এখন ঠিক হীরে মনে হচ্ছে, রাতে মনে হবে নীলা বুঝি। সন্ধ্যায় হয়তো চুণীর আকার ধারণ করলো। আলেকজান্দ্রিয়া, এক পলকে দেখে নিলেন বিনয়েন্দ্র। সোফায় এসে বসলেন পুনরায়। প্যাস্‌নের কালো সুতো নিয়ে খেলা করতে করতে বললেন,—যে কথা বলছিলাম তোমাকে। আমার ফাদার মারা যাওয়ার কিছু কাল পরেই আমি স্বপ্ন দেখলাম এক রাত্রে—really I dreamt. আমি দেখলাম, আমার ফাদার এসে বলছেন আমাকে। Truly speaking, বলছেন যে, I am coming back. আমি আবার আসবো তোমার কাছে। তোমার সন্তান হবো আমি। My child! My father will be my child. Strange! But not a fiction. Truth!

বিনয়েন্দ্র বোধ করি কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠেন। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন। তাঁর মাথা আর হাত দু'খানা ঠক-ঠক ক'রে কাঁপে। সোফায় মাথা এলিয়ে দেন। আবার নিশ্বাস টেনে নিয়ে বলতে শুরু করেন,

—যে woman-কে আমি আমার স্ত্রীর মত, like my own wife মনে করতাম, তার গর্ভে আমার সন্তান হল। ঐ তোমার ঐ friend অরুণেন্দ্র, আর ঐ তোমার ছায়া—my little Lily.

তোমার ছায়া! মনে মনে একবার চম্‌কে উঠলো সে। অনেকটা সুস্থ হ'ল যেন। অরুণদের বংশ-কাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় জেনে কিছু কিছু যেন বুঝতে পারে সে—বুঝতে পারে এরা ঠিক সাধারণ নয়, খানিক অসাধারণ, অস্বাভাবিক। সে শুনতে থাকে গভীর মনোযোগ সহকারে। বিনয়েন্দ্র বলতে থাকেন,—সেই অরুণ, আমার ফাদার! ঠিক তাঁর মত character, gesture, posture—সব তাঁর মত। তা' অরুণ যে তোমার ডিরোজিওকে নিয়ে হঠাৎ এমন খামখেয়ালী কথা বলবে, তা'তে I am not at all surprised. বলতে পারে সে। তার প্রকৃতি অদ্ভুত, সে মানুষও নয়, অমানুষও নয়। তুমি বোঝ না কেন, কলেজে prize পেলে, আর সেগুলো কিনা যারা prize পেলে না তাদের হাতে তুলে দিয়ে এলো! কিন্তু এ-ও তুমি জানবে, বাড়ীতে not a line তাকে আমি পড়তে দেখি না। খানিক থেমে বললেন,—অরুণটা ঐ রকম!

কথার শেষে তাঁর মুখে কাতরতার চিহ্ন দেখা গেল। ক্ষোভের, দুঃখের আর হতাশার। মুহূর্তের মধ্যে চোখে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। কেমন যেন একটা ঝড়ের তুফান। দমকা বাতাসে অদল-বদল হয়ে গেল সব। কৃষ্ণকিশোর বসে থাকে পাষাণের মত। শোনে মন দিয়ে।

—কিন্তু এতক্ষণ সে তো এসে পড়ে কলেজ থেকে। কেন আজ আসছে না? হঠাৎ স্বগত করলেন বিনয়েন্দ্র। উঠে পড়লেন সেখান থেকে। বেরিয়ে গাড়ী-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরে এখন নীরবতা। কৃষ্ণকিশোর কান পেতে শুনলো সেই দূরের

শব্দ। আর আসছে না সেই ঠুং-ঠাং আওয়াজ। থেমে গেছে। একটা রেশ যেন কানে লেগে রয়েছে তার।

তবুও দেখা-না-দেখার স্বপ্ন তার ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেছে মাত্র ঐ একটি কথা শুনে। অরুণের মস্তিষ্ক বিকৃত! অরুণ—

বাইরে বিকেল। বৎসরান্তের সময়। বসন্তের দক্ষিণা বাতাস। স্বচ্ছ আকাশ। সামনের লনে চৈত্রের ঝরা-পাতা খড়-খড় করছে। চৈত্র-গোধূলি। আলো-অন্ধকার। পথে দেখা যায় লোক-চলাচল। সাহেব-সুবোরা সপরিবারে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে। মায় বাড়ীর কুকুরটি পর্য্যন্ত সঙ্গে নিতে ভোলেনি। খানসামা আর আয়ারা চলেছে। খান-সামাদের হাতে ঝুলন্ত রামপাখী আর আয়াদের হাতে মনিবদের খোকা-খুকুরা। কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল চলে যাবে, না থাকবে। বড় বিশ্রী লাগছে এই অস্বাভাবিক আবহাওয়া। কিন্তু এক জন, সে তো বিশ্রী নয়। সুশ্রী। সে ভাবছিল চলে যাবে, না বসে থাকবে।

বিনয়েন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। চোখের প্যাঁস্‌নে খুলে ফেলেছেন। ঝুলছে বুকের কাছে। কৃষ্ণকিশোরের অত্যন্ত কাছে এসে তার দু'টি গালে হাত বুলিয়ে বললেন,—তোমাকে আমি কি offer করতে পারি? কি খাবে বল'। A cup of tea? দু'টুকরো পাঁউরুটি?

সে লজ্জা পায়। কিছু বলে না। তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ নয়নে। সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে মুখে। কিছু বলে না, শুধু হাসে। বিনয়েন্দ্র তেপায়া থেকে রেখে-দেওয়া বইখানা তুলে নিতে নিতে বললেন,—তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমি এবার কাজে যাই। My little Lily, তাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে খাওয়াবে, বসে বসে গল্প করবে তোমার সঙ্গে, তোমার friend যতক্ষণ না আসে।

হ্যাঁ, না, কিছুই বলে না সে। তিনি কাজে যাবেন এই কথাটি

শুনেই যেন ব্যস্ত হয় একটু। বলে,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখন কি কাজ করবেন ?

নেহাৎ আবদারের মত শোনায় তার কথা। বিনয়েন্দ্র যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে পড়েন। হাসতে হাসতে বলেন,—কাজ ? Official work. তুমি জানো না I suppose, আমি সরকারী Translator. অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলে অনুবাদক। সেই কাজের কিছু কিছু বাড়ীতে ব'সে করতে হয়।

বিনয়েন্দ্র মসিজীবী। তাই চোখের দৃষ্টি নেই। কর্ম্ম-জীবনে শুধু অনুবাদের কাজেই লেগে রয়েছেন, কলম চালিয়েছেন। মৌলিক লেখা হ'ল না—শুধু ইংরেজী থেকে বাঙলা, আর বাঙলা থেকে ইংরেজী। সরকারের আইন-কানুন, সাধারণের আবেদন-নিবেদন আর দলিল-দস্তাবেজের তর্জ্জমা ক'রে এতগুলো দিন তাঁর কেটে গেছে। পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছেন রিপন ষ্ট্রীটের এই বাড়ীখানা। আর কিছু নয়। নির্দ্ধারিত হারে মাইনে পেয়েছেন আর দিন কাটিয়েছেন মনের সুখে। শারীরিক কায়ক্লেশ নেই তাই এই বয়সেও কাজ করছেন, নয় তো কবে ইস্তফা দিয়ে দিতেন কাজে। বিনয়েন্দ্র মসিজীবী,—মৌলিক লেখায় হাত দিলেন না কখনও। সাহিত্যাকাশে স্থান না পেয়ে অন্তরালে থেকে পুষ্ট করছেন বাঙলা ভাষা। কত ইংরেজী কথার বাঙলা করছেন। কত বাঙলা কথার ইংরেজী ভাষান্তর !

সে আসছে ?

সে আসবে। বিনয়েন্দ্র চলে গেছেন ভেতরে। যাওয়ার সময় ঘরের মধ্যেকার টেবিল থেকে নিয়ে গেছেন পাইপ আর বই। ভুলে গেছলেন। ফিরে এসে নিয়ে গেলেন সীসের দোয়াত আর চিলের পালকের কলম।

বিনয়েন্দ্র মসিজীবী। সে চেয়ে থাকে তাঁর যাওয়ার পথে। কারও আসার আশায়। নিজেকে যেন অসহায় মনে হচ্ছে তার। কেমন যেন নিরাশার অসহায়তা। কেমন যেন নিঃসঙ্গ। অরুণেন্দ্র, যার আকৃতি আর প্রকৃতি দুই-ই সে মন থেকে ভালবাসলো, সে কি না বিকৃত-মস্তিষ্ক? দেখতে পাওয়ার যে উগ্র আশা নিয়ে কৃষ্ণকিশোর বেরিয়েছে বাড়ী থেকে, এখন আর ততটা যেন নেই। কি হবে দেখে। বড় বিশ্রী লাগছে এই পরিস্থিতি। কেমন যেন অসাধারণ, কেমন অস্বাভাবিক।

বাচ্ছা খানসামাটা আড়ষ্ট হয়ে দেখা দেয় আবার। হাতে তার আখরোট কাঠের ট্রে। তাতে এক পেয়ালা চা আর সেঁকা পাঁউরুটি। মধ্যেকার টেবিলের 'পরে নামিয়ে রাখে। চলে যায় যন্ত্রচালিতের মত।

সে আসে। খানিক পরে।

ছায়া, লিলি, না লিলিয়ান! সেই মুক্তো-ঝরা দাঁত আর ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট, জাম রঙের লেসের ঘাগরা আর সেই অপেল পাথরের মালা-পরা মেয়েটার দেখা পাওয়া যায়। হঠাৎ যেন চন্দ্রোদয় হ'ল কৃষ্ণা-কাশে। ঘর এখন প্রায় অন্ধকার। বাইরে প্রথম সন্ধ্যার আলো-আঁধারি। বসন্তের সমীরণ। কাছাকাছি কোথায় কোন্ চার্চের ঘড়িতে বাদ্য-ধ্বনি হচ্ছে। ঘণ্টা-ধ্বনি। উপাসনার সময় সমাগত। ঘড়িতে তাই বাজনা শুরু হয়েছে বুঝি। কেমন মন-মাতানো কান-ভাঙ্গানো সুর—যেন ডাকছে। এসো, উপাসনায় মন দাও। বল',—The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

লজ্জার বালাই ছিল না কোন দিন।

আজ কেন যেন লজ্জার আভাস কৃষ্ণকিশোরের চোখে-মুখে। কান দু'টো রাঙা হয়ে উঠলো। চোখ তুলে মন ভ'রে দেখতে পর্য্যন্ত পারলো না। চোখ তুলতে, কথা বলতে কেমন যেন জড়তা।

সেই নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে বললে ছায়া,—কৈ, আপনি খাচ্ছেন না? কথার শেষে বসলো একটা সোফায়। তার এক পাশে।

সে বললে,—আমি তো চা খাই না। আপনার বাবা বললেন, তাই খাচ্ছি।

চায়ের পেয়ালায় হাত দেয় সে। ছায়া তার কথায় হাসতে শুরু করে। বলে,—চা খান না আপনি? কেন? আবার তার হাসি। চোখ বন্ধ ক'রে নিঃশব্দ হাসি। ঊর্দ্ধাঙ্গ কাঁপিয়ে।

এক ফালি পাঁউরুটি আর আধ পেয়ালা চা কোন রকমে গলাধঃকরণ করলো সে। পকেট থেকে আলপাকার রুমাল বের করে হাত-মুখ মুছে বললে,—অরুণ এলে বলবেন আমি এসেছিলাম। অনেকক্ষণ বসেছি তার জন্যে। বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়লো সে সোফা ছেড়ে।

হাসি বন্ধ ক'রে বললে ছায়া,—এ কি, চলে যাচ্ছেন? দাদা এখুনি যে আসবে। অন্য দিন এসে পড়ে অনেক আগে। আজ কেন আসছে না!

ছায়ার বড় বড় চোখে ব্যাকুলতা। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ ব্যস্ততা। কথা বলতে বলতে এবং বলার পরেও ছায়া চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। অপলক নেত্র, চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। প্রায় অন্ধকার ঘরের ভেতর সে শুনতে পাচ্ছে ছায়ার নিশ্বাসের শব্দ। একেবারে পাশেই সে বসে ছিল। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। চোখে কি এক আবেদনের ভাষা। যেন আত্মসমর্পণের। ছায়া আবার বললে,—চ'লে যাবেন এক্ষুনি?

ঘরে আর কেউ নেই। শুধু সে আর সে। ছায়া আর সে। এত পাশাপাশি এত কাছাকাছি পেয়েও তার যেন তাকাতে লজ্জা। কান দু'টো কেমন যেন রাঙা হয়ে উঠেছে। ছায়ার কথার উত্তরে সে শুধু বললে,—হাঁ। আজকে যাই।

ছায়া বললে,—কি এসেন্স মেখেছেন ?

এতক্ষণে সে একটু হাসলো। বললে,—এসেন্স নয়, আতর। খসখস।

—How sweet, কি মিষ্টি গন্ধ! ছায়া স্বগতঃ করলো।

মনে মনে ক্ষণিকের জন্য অত্যন্ত খুশী হল সে। গন্ধটা যে তার মিষ্টি লেগেছে সেই জন্যে। কি মনে ক'রে কান থেকে আতরের তুলো বের করলে। বললে,—এই নিন।

হাত পাতলো ছায়া। গ্রহীতা যেমন হাত পেতে দান গ্রহণ করে সেই ভাবে হাত মেলে ধরলো ছায়া। ডিমের মত ফর্সা দু'খানা হাত। চাঁপার কলির মত আঙুল। আতর পেয়ে ক্ষান্ত হয় না। ছায়া কেমন যেন ব'লে ফেললে মুখ ফসকে। বললে,—আর ঐ রুমালখানা ?

কৃষ্ণকিশোর অবাক হয় না শুধু। হতভম্ব হয়ে পড়ে যেন। এ কি রকম কথা। এমন অপ্রাসঙ্গিক। কেমন অপ্রত্যাশিত। সে হাতের রুমাল এগিয়ে দেয়। বলে,—রুমালখানা ? কেন ?

ছায়া লজ্জায় যেন মরে যায়। মাথা নত করে। বলে,—আমার চাই রুমালখানা।

কেন, তার কি কোন উত্তর হয়। ছায়া চায়। হাত পাতে। কে চায় এমন ? রুমাল আর আতর সমেত হাত দু'টো মুখের 'পরে চেপে ধরলো ছায়া। ধরে রইলো অনেকক্ষণ। কে জানে, কি বলতে চাইলো।

—আজকে যাই। কেমন ? কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। লন পেরিয়ে গাড়ীতে উঠেই বলে—আবদুল, চল চল, বাড়ী চল।

ছায়া শুধু একা বসে থাকে সেই প্রায়-অন্ধকার নির্জ্জন ঘরে। চেতনা-হীন জড়ের মত বসে থাকে। রুমালখানায় মুখ মোছে। হাতে জড়ায়। চেপে চেপে ধরে মুঠোর ভেতর। লাল আলপাকার রুমাল। কৃষ্ণকিশোরের

ব্যবহৃত। আর তাই জন্যেই তো চেয়েছে ছায়া, তা কি বুঝেছে সে। ঐ কিশোর?

ফটকে গাড়ী ঢুকতেই দূর থেকে দেখতে পায় সে, নাটমন্দির লোকে লোকারণ্য। আশ্চর্য্য হয়ে যায় যেন। কেন ঐ জনতা। দর্শনপ্রার্থী? না তো, কোন দিন আসে না এত লোক। এক দিনও নয়। নাটমন্দিরের কড়িতে সারি সারি রঙীন আলো ঝুলছে। উৎসব-অনুষ্ঠান ব্যতীত ঐ আলো জ্বলে না। রঙীন কাচের ধুচুনী লণ্ঠন।

ম্যানেজার গাড়ীর দরজায় এসে দাড়ায়। সে নামতেই তাকে বলে,—বাসদেও মাহাতোর ছেলেরা নামগান করবে। তাই আয়োজন করেছি নাটমন্দিরে। পাড়া-প্রতিবেশী জনা কয়েককে আসতে বলেছি গান শুনতে।

সে কিছু বলে না। জনতার কারণ জেনে নিশ্চিন্ত হয় যেন। নাট-মন্দিরে গিয়ে দেখতে পায় গালচে পাতা হয়েছে। লোকজন বসেছে। বাসদেও মাহাতোর তিন ছেলে পাশাপাশি বসেছে। এক জনের হাতে করতাল। এক জনের সামনে একটা হারমনিয়াম। বাজছে। আরেক জন তবলায় চাঁটি মারছে। সুর বাঁধছে।

এক দিকে পুরুষ, আরেক দিকে নারী।

এক দিক উন্মুক্ত, আরেক দিকে চিকের আড়াল। লোকজন আসতে শুরু হয়েছে। হাওয়ায় খবর ছড়িয়েছে। নাটমন্দিরে আজ গাওনা হবে বাবুদের বাড়ীতে। কৃষ্ণকিশোরকে দেখে লোকজন চুপ করে খানিক। খোদ্‌কর্ত্তা এসেছেন তাই। ম্যানেজারকে বললে কৃষ্ণকিশোর,—মা কোথায়? মা জানেন?

—হ্যাঁ, তাঁর অনুমতি পেয়ে তবেই এই আয়োজন করেছি। হাতে হাত কচলাতে কচলাতে বললে ম্যানেজার। বললে,—হুজুর, কে একজন

এসেছেন। অনেকক্ষণ বসে আছেন আপনার জন্যে। নাটমন্দিরে বসতে অনুরোধ করলাম। তা বললেন যে, না আমি ওখানে বসলে আপনাদের মন্দির অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই ঐ দালানে বসে আছেন একা একা।

—কে বলুন তো? ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

দালানে। কাছারীর দালানে চুপ-চাপ বসেছিল সে। দূর থেকে বুঝি লক্ষ্য করছিল এদের আদব-কায়দা। কৃষ্ণকিশোর দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারে আগন্তুক কে। মূর্তিমান অরুণেন্দ্র, অরুণ, অরু! মুহূর্তের মধ্যে সকল আনন্দ নিবে যায় তার মনে। অরুণেন্দ্র বিকৃত-মস্তিষ্ক। সে এসেছে। আর সে গেছে তাদের বাড়ী। সে বুঝতে পারে তার ব্যর্থ প্রতীক্ষার কারণ।

ম্যানেজার পাশেই ছিল। যুক্ত-করে। সে বললে,—মা জানেন ও এসেছে?

—আঁজ্ঞে না। সংবাদ যায় নাই তাঁর কাছে। ম্যানেজার হাত কচলায় আর বলে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—আমি যাচ্ছি, আপনি ওকে আমার পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিন। মা যেন না জানতে পান, দেখবেন। মা খুঁজলে বলবেন, বেড়িয়ে এসে পড়ার ঘরে আছি। আসরে আসছি এখুনি।

• ম্যানেজার অরুণকে ডাকতে যায়। আর সে যায় তার পড়ার ঘরে। বেহাত-হয়ে-যাওয়া রুমাল আর সেই হাত দু'খানা বার বার মনে পড়ে কৃষ্ণ-কিশোরের। আর সেই মুক্তো-ঝরা হাসি। বড় বড় চোখের রহস্যময় চাউনি। পড়ার ঘরের দিকে ধীরে ধীরে চলতে থাকে সে। ম্যানেজার অরুণকে ডেকে আনতে যায়। আর নাটমন্দিরে তখন সবেমাত্র সুর ধরে বাসদেও মাহাতোর তিন বংশধর। নামগান শুরু হওয়ার আগে বন্দনা-গীত ধরেছে তারা। আরেকটু পরেই গান আরম্ভ হবে। রঘুপতি রাঘবো

রাজা রাম। সীতারাম। রাম, রাম॥ আকাশে দেখা যায় মেঘের মালায় দু'চারটে সন্ধ্যাতারা ঝুলছে। চাঁদ উঠবে খানিক পরে।

সন্ধ্যের অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে অনেকেই এসে উপস্থিত হলেন।

কেউ গা-ঢাকা দিয়ে, কেউ বুক ফুলিয়ে, আবার কেউ বা একেবারে বেহেড্ অবস্থায় টলতে টলতে। যাঁরা আহূত তাঁরা সসম্মানে আসন গ্রহণ ক'রেছেন আসরের যত্র-তত্র। আসছেন, ম্যানেজার বাবুর নমস্কারের ফেরতাই দিয়ে ব'সে পড়ছেন যে যেখানে ফাঁক পাচ্ছেন। এদের কেউ মোচে পাক দিচ্ছেন, কেউ আপনার পরনের বেনিয়ানখানার দিকে বারে বারে তাকাচ্ছেন, কেউ ব'সে ব'সে পান চিবোচ্ছেন আর হাসছেন ম্যাড়ার মত। আবার কেউ বা তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হ'ল না মনে ক'রে ম্যানেজার বাবুর প্রতি কটাক্ষ হানছেন। কেউ হাতের আঙটি দেখাচ্ছেন। কেউ ইষ্টিক্। হাতীর দাঁতের, মোষের শিঙের, রূপোর। কেউ আবার সবান্ধবে না এসে আর পারেননি। তেনাদের সঙ্গে দু'-চার ইয়ার-বক্স আর দিলের দোস্তরাও এয়েছেন।

হুজুগে বাঙ্গাল। ঢাকে কাঠি প'ড়তে না পড়তেই। যেমন শুনেছে তেমনি। একেই কলকাতার শহর। যেমন কেজোদের ভীড় তেমনি ঠিক অকেজোরাও কমতি নয় এখানে। শুনেছে গাওনা হবে, আসর হয়েছে।

ম্যানেজার বাবু একটা কাণ্ডই বাধিয়ে ব'সে আছেন!

চিকের আড়ালে বেনারসীর নানান জলুস। সাদা থান। ফিস-ফিস কথা আর শিশুর ক্রন্দন। আসরে গান হচ্ছে তাই শুনবে, না দেখবে পরস্পরকে। এ দেখবে ওর শাড়ীর বাহার, ও দেখবে এর গয়না। তন্ন তন্ন ক'রে। বয়স্থারা ধমকানি দেয়, সামলায় চটুলার দলকে। তারা ছ'মাসে ন'মাসে আজ একত্র হয়ে হাসে খিলখিলিয়ে। ঢ'লে পড়ে এ ওর গায়ে।

অনাহূতের দল দূর থেকে দেখেই তৃপ্তি পায়। দেখে জন-সমাগম, দেখে কড়িতে ধুচুনী লণ্ঠনের রঙীন সারি। আসরের মধ্যিখানে রূপোর আতর-দান, পান-দান আর গোলাপ-পাশ। তারা দূর থেকে দেখে রূপোর চিকন। ফটকের দ্বারপালের চোখ এড়িয়ে কে যাবে সেখানে। গলায় ধাক্কা খেতে। ছক্কড় মহল তাই শেষ পর্য্যন্ত আর থাকতে না পেরে মুখ ছোটাতে শুরু ক'রেছে। হিংসা আর অপমানের জ্বালায়। পরশ্রী-কাতরতায়।

এখানে এত ব্যাপার, আর ভেতরে কি। অন্দরে তখন কুমুদিনী ব্যস্ত হয়ে ডাক পাঠাচ্ছেন। দাসীর পর দাসী এসে সদরে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। কোথায় সেই খোদ্ কর্ত্তা। কোথায় ম্যানেজার বাবু। কোথায় কে।

ভুল হয়ে গেছে। চরম ভুল। যার আর কোন শোধন নেই। প্রতিকারও নেই। কুমুদিনীর কানে গেছে বড় বাড়ীতে নাকি কোন সংবাদ দেওয়া হয়নি। ভুল হয়ে গেছে। পরম ভুল। যার আর ক্ষমা নেই। সময়ও আর নেই যে, গিয়ে বলে আসবে। এখন বলতে গেলে হয়তো আসবেও না কেউ, পরন্তু কথার সূত্রপাত হবে।

গানের সুর আর করতালের ঝঙ্কার তখন সপ্তমে উঠেছে। বন্দনার পর মূল কথার গান ধরেছে বাসদেও মাহাতোর পুত্রত্রয়। ভিন্‌দেশী ভাষা, ভিন্‌দেশী ধ্বনি। বড় অদ্ভুত শোনায় যেন শ্রোতাদের কানে। অশ্রুতপূর্ব্ব।

প্যালার থালায় টাকা পড়ে ঠং-ঠং। যে যেমন মানুষ সে তেমন দেয়। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির হেতুতে দু'-এক বৃদ্ধের ভাবান্তর হতে দেখা যায়। গোলাপ-পাশ হাতে নিয়ে ম্যানেজার বাবু অতিথিদের মাথায় গোলাপ-জলের ছিটে দিতে থাকেন।

কিন্তু মালিক কৈ? যার প্রজা সেই রাজার সাক্ষাৎ নেই। হোতা নেই অনুষ্ঠানে।

কৃষ্ণকিশোর পড়ার ঘরে। দু'খানা কেদারায় সামনাসামনি বসেছে দুজনে। অরুণেন্দ্র বলছে,—I am hungry. আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত। সেই সকালে খেয়ে কলেজে গেছি, কলেজ থেকে সোজা I have come to you. তোমার কাছে এসেছি। I am too hungry now.

কেদারা থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কি খাবে বল'?

পাজামার পাশ-পকেট থেকে বার্ডসাইয়ের প্যাকেট বের করলো অরুণেন্দ্র। ঠোঁটের কোণে একটা ধ'রে চকমকি ঘষতে ঘষতে বললো,—কিচ্ছু না থাকে, a glass of water only. এক গেলাস জল খাওয়াও। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে আজ তো কিসের এক ceremony দেখতে পেলাম। What's the matter?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—ও কিছু নয়। আমাদের প্রজারা এসেছে। গান গাইছে। অপেক্ষা কর, আমি বলে আসি।

কিন্তু বলবে কাকে! আহার্য্যের অভাব নেই। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। কিন্তু বললে তো আর রেহাই নেই। কার খাবার, কে খাবে—শতেক কৈফিয়ৎ দাও। কুমুদিনীর যদি কানে যায় সেই খৃষ্টান ছেলেটা এসেছে তাঁর ভিটের ভেতর, তা হলে কি আর রক্ষা আছে নাকি। কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করে অরুণেন্দ্রর মুখখানা। যেন বিবর্ণ। ক্লান্তির ছায়া নেমেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা। চোখ দু'টো যেন রক্তহীন। পাংশু। মাথার চুল রুক্ষ। কৃষ্ণকিশোর বললে,—অপেক্ষা কর, আমি বলে আসি।

পড়ার ঘরের বাইরে দরজার পাশেই বসেছিল অনন্তরাম। মনিবের

দু'-চারখানা কাপড় চুনোট করছিল এই অবসরে। ফরাসডাঙ্গার জরদ পাড়, ঢাকাই আর কালো ভেলভেট পাড়ের ধুতি। হাতের ছুরি পাশে রেখে জিজ্ঞেস করলো অনন্তরাম,—কি, কি চাই আবার? কাকে কি বলতে হবে বল' না, আমি ব'লে আসছি।

বিমূঢ়ের মত বললে কৃষ্ণকিশোর,—অনন্তদা, একজনের মত জলখাবার চাই। মায়ের কাছ থেকে কি ব'লে চাইবে? বল'না যেন অরুণ এসেছে। বলবে—

কি বলবে তা আর বলতে পারে না সে। হাসতে হাসতে অনন্তরাম বললে,—বলব'খন যে, বেড়িয়ে ছেলের ক্ষিদে লেগেছে। কিছু খাবার দাও তোমার ছেলেকে।

—তাই বলবে? বলে কৃষ্ণকিশোর।—তা আমি জানি না। তুমি যাও, দেরী ক'র না।

হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠে পড়ল অনন্তরাম। কৃষ্ণকিশোর ঢুকলো পড়ার ঘরে। দেখলো অরুণেন্দ্র বার্ডসাই খেতে খেতে গুন-গুন সুরে গান ধরেছে। কি এক ইংরেজী গান। পা দু'টোকে তুলে দিয়েছে টেবিলের 'পরে।

• ওদিকে তখন জমে উঠেছে আসর।

এখান থেকে গানের সুর শোনা যাচ্ছে। তবলার বোল্। নাট-মন্দিরে শুধু মানুষের কালো মাথা। আর সারি সারি ধুচুনী লণ্ঠন। সন্ধ্যার এলোমেলো বাতাসে দুলছে এদিক সেদিক। দূর থেকে মনে হচ্ছে সাগরের বুকে বুঝি বা বিরাট এক ময়ূরপঙ্খী দুলছে। আলোকোজ্জ্বল। অন্দরের সেই তিনতলার দালানের জানলার পাখীর ফাঁক থেকে নিঃশব্দে দেখছেন কুমুদিনী। দেখছেন তাঁর নাটমন্দির দুলছে। লণ্ঠনের রঙীন

আলো-ছায়ায়। মনটা তাঁর অশান্তির বিষাদে ভারাক্রান্ত। কর্ত্তব্যে অবহেলা হয়ে গেছে। কত যে কথা উঠবে এই সামান্য ত্রুটিতে! বড় বাড়ীতে একবার জানানো হয়নি, অথচ প্রতিবেশীদের ঢাক পিটিয়ে জানানো হল। ভুল হয়ে গেছে, পরম এবং চরম ভুল। দাসীর পর দাসী এসে খোঁজ করছে সদরে। কোথায় কৃষ্ণকিশোর। কোথায় ম্যানেজার বাবু। কোথায় কে!

—কেন এসেছি বলতে পারো? কথা বলতে বলতে সোজা হয়ে বসলো অরুণেন্দ্র। বার্ডসাইয়ের শেষাংশ জুতোর তলায় চেপে ধরলো। বললে,—কেন এসেছি, can't you guess?

অপ্রতিভ হয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর,—এসেছো, বেশ তো। কেন তা জানি না। আমিও তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে চলে এসেছি।

ঘরের দেওয়ালে ছিল একটা দেওয়ালগিরি। কম্পমান শিখা। অরুণেন্দ্রর মুখে দেখা যায় ক্ষুধার ক্লান্তি। চোখের দৃষ্টিতে যেন তৃষ্ণার ব্যাকুলতা। অনন্তরাম আসে খাবারের রেকাবী হাতে। আরেক হাতে জলের পাত্র। রেকাবীতে ক্ষীরের মোহনপুরী, নারকেল নাড়ু, পেস্তার বরফী আর ঝুরি-ভাজা। অনন্তরাম টেবিলের 'পরে নামিয়ে দিয়ে বলে,—মা যে কখন থেকে তোমাকে ডাকাডাকি করছেন! বড় বাড়ীর লোক-জনাদের নাকি বলতে ভুল হয়ে গেছে।

—তাই নাকি? বললে কৃষ্ণকিশোর।—মা কোথায় অনন্তদা?

—কোথায় আবার, অন্দরে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে অনন্তরাম।—দেখলাম তেনার মুখখানা যেন রাগে ভারী হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণকিশোরের বুক দুরু-দুরু করে। ভয় আর আশঙ্কায়। অরুণ

তাদের ভিটের ভেতরে এসেছে, মা কি জানতে পেরেছেন! কিন্তু বাড়ীতে যদি কেউ আসে তাকে কি মুখের ওপর বলে দেওয়া যায় যে—এসো না, চলে যাও। অনুরোধের অপেক্ষা করে না অরুণেন্দ্র। রেকাবী তুলে খেতে শুরু করে। লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই নেই। ক্ষুধার্ত্তের আহার। জঠরানলের জ্বালায়। রেকাবী নিঃশেষ হতে বড় বেশী সময় লাগে না। গেলাসের জল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে অরুণেন্দ্র,—আমি এসে তোমাকে আটকে রেখেছি। কিন্তু কেন এসেছি তা বোধ হয় জানো না?

তার মাথায় তখন দুশ্চিন্তা। কুমুদিনী ডাকতে পাঠিয়েছেন, নাট-মন্দিরে আসর আর অরুণেন্দ্র বাড়ীর ভেতরে এসেছে। অনেক সমস্যার তোলপাড়। কৃষ্ণকিশোর বললে,—তুমি আমাকে যে সব কথা বলেছো তার একটাও সত্যি নয়। কোথায় ডিরোজিও?

হাসতে থাকে অরুণেন্দ্র। বলে,—তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে না। আমি তাঁকে দেখতে পাই কলেজে। শুনতে পাই, he is delivering speech on the subject of classical English literature.

—তাই না কি? কৃষ্ণকিশোরের কথায় কৌতূহল।—এই রাতের বেলায় তুমি যাবে এতটা রাস্তা? ভয় করবে না?

—ভয়! হেসে ফেললো অরুণেন্দ্র।—ভয় আবার কাকে? গান গাইতে গাইতে চলে যাবো। ভয় আবার কি? I am not afraid of anyone in this world of the Almighty.

কৃষ্ণকিশোর বলে,—চৌরঙ্গীতে যে ইংরেজ দস্যুরা আছে। তারা যদি—

—Let them be. তাতে আমার ভয় কি! অরুণেন্দ্রর মুখাকৃতিতে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। সে যেন অজাতশত্রু। তার কথাগুলি শুনতে

যেন মজা লাগে কৃষ্ণকিশোরের। বলে,—কেন এসেছো বললে না?

চেয়ার থেকে উঠে পড়লো অরুণেন্দ্র। পাজামার পকেট থেকে ফস্ করে বের করলো কি একখানা বই। বললে,—আমি তোমাকে পড়াবো। তুমি ইংরিজী পড়তে চাও, I will teach you English. Have this book with you. Please try to read the alphabets.

বইখানা হাতে নেয় কৃষ্ণকিশোর। উলটে-পালটে দেখে। রেখে দেয় টেবিলের দেরাজে। দেখবে সে, পরে দেখবে। নীল রঙের মলাট। ইংরেজী ভাষার প্রথম ভাগ। প্যারীচরণ সরকারের ফার্ষ্ট বুক। অরুণেন্দ্র আরেকটা বার্ডসাই ধরায়। দরজার কাছে গিয়ে বলে,—কাল বিকেলে তুমি এসো আমাদের বাড়ীতে। আমি তোমাকে ইংরিজী পড়াবো। Now I am going. রাস্তাটা আমাকে একটু বাৎলে দাও। কোন্ দিকে তোমাদের ফটক?

বাইরে তখন আর অন্ধকার নেই। আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পূর্ণাকার চাঁদ। সুধা বিকিরণ করছেন। গ'লে পড়ছে জ্যোৎস্না। নীল আকাশের এখানে সেখানে ভাসমান মেঘের জটলা। ভেসে যাচ্ছে দূর-দূরান্তরে। লুকোচুরি খেলছেন চন্দ্ররাজ। পৃথিবীর সঙ্গে।

ফার্ষ্ট বুক। সেই জাম রঙের লেসের ঘাগরা। ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট। অপেল পাথরের মালা। বেহাত-হয়ে-যাওয়া রুমাল। কুমুদিনীর ডাক। নাটমন্দিরে আসর। আর এই বিচিত্র জীব অরুণেন্দ্র। তার মনে যেন এক ঝড়ের দোলা লেগেছে। দক্ষিণের সমীরণ? না, এলোমেলো বাতাস। দিগ্‌ভ্রান্ত।

কি গান! এত মিষ্টি! এত তার আকর্ষণ! বন্ধুকে বিদায় দিয়ে আসে সে। এতক্ষণে গানের সুর কানের ভিতর দিয়া মরমে গিয়ে

পশেছে। শুনতে পেয়েছে সত্যিই গান গাইছে কারা। ভজন গান। দোঁহা। শ্রীতুলসীদাসের।

—মা যে ডেকেছেন। পেছন থেকে বললে অনন্তরাম।

—মা আসরে আসেনি? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরামের কথায় যেন দুঃখের কাতরতা। বলে,—না, আসবেও না। কর্তা যাওয়ার পর থেকে কি আর মুখ দেখিয়েছে কারও সমক্ষে? দেখো না, তুমি যদি ধ'রে-ক'রে আনতে পারো। দিন নেই রাত নেই ঐ একখানা ঘরের ভেতরে মুখ লুকিয়ে বসে আছে! তোমাকে কিন্তুক ডেকেছেন বহুক্ষণ হল।

কৃষ্ণকিশোর পা চালায় দ্রুত।

অন্দরের মাঝ-পথে দেখতে পায় কুমুদিনীকে। মা! ডাকের সাড়া না পেয়ে নিজেই তিনি ব্যস্ত হয়ে আসছিলেন সদরের মুখে। ছেলেকে দেখতে পেয়েই বললেন,—এতক্ষণে তোমার দয়া হল বুঝি? ম্যানেজার যে বাড়ীতে এই কাণ্ড করেছে তা বড় বাড়ীতে একবার জানালে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো! কত কথা উঠবে এই নিয়ে। তুমি ছিলে কোথায়?

মুখ দিয়ে যেন কথা বেরোয় না। মিথ্যা কথা জলের মত কি আর সহজে বলা যায়? সে বললে,—টোলের একটি ছেলে এসেছিল। এই মাত্র গেল। কুমুদিনী তার কথা শেষ হতে না হতেই বললেন, —তুমি যাও না একবার বড় বাড়ীতে। যদি কেউ আসেন দেখো না একবার! সঙ্গে অনন্তকে নিয়ে যাও। ঘরে ঘরে গিয়ে বলে আসবে। বলবে, মা বললেন আপনারা গান শুনতে আসুন। যে আসে আসবে, না আসে না আসবে। আমাদের দিক থেকে—

কৃষ্ণকিশোর ভেবেছিল মা হয়তো ভীষণ রেগেছেন। দেখলো যে,

না, তেমন কিছু নয়। খুশী হয়ে বললে,—বেশ, তা এক্ষুণি আমি যাচ্ছি।

কুমুদিনী বললেন,—দেখো, কোন ঘরে বলতে যেন ভুল না হয়। আগে বটঠাকুমার ঘরে যাবে। তাঁকে বলবে। তার পর আর আর সকলকে বলবে। জ্যাঠামশাইদের বলবে, বৌদিদের, দাদাদের, আর মেয়েরা যদি কেউ থাকে তাদেরও বলবে। কিন্তু দেরী করলে আর যাওয়া না-যাওয়া দুই-ই সমান। শেষে ওঁরা বলবেন যে, আসর যখন শেষ হতে চললো তখন বলতে এসেছে!

বড় বাড়ী।

হ্যাঁ, ঐ বাড়ীই আসল বাড়ী কি না! মূল। কাণ্ড। ঐ বাড়ী থেকেই বেরিয়েছে যত শাখা আর প্রশাখা। প্রথমে ছিল একতা। তার পর ষড়রিপুর তাড়নায় বেধেছিল দ্বন্দ্ব। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে হয়েছিল ভাগাভাগি। যার ভাগে যেমন প'ড়েছে সে তেমনি পেয়েছে। ঐ বটঠাকুমার ভাগ্যে ঐ বড় বাড়ী পড়েছে। তিনি এখনও কাণ্ড আগলে ব'সে আছেন তাঁর বংশধরদের নিয়ে। বয়স তাঁর প্রায় নয়ের কোঠায়। নবাবী আমলের শেষ ভাগে মাত্র সাত বৎসর বয়সে এসেছিলেন ঐ বাস্তুভিটায়। তার পর?

তারপর কত কি। সুখদুঃখ, হাসিকান্নার জোয়ার-ভাঁটায় কত কি ঘটে গেছে। কত কে জন্মেছে—আর চলে গেছে কত কে। কত কি দেখেছেন তিনি। ঐ ফুলকুমারী। এক দিন ঐ ফুল রঙে রসে আর গন্ধে ছিল সজীব। এখনও মানুষটি আছেন, তবে সেই রঙ রস আর গন্ধ যেন উবে গেছে। ফুলকুমারী আজ ন্যুব্জ কুব্জ। লোল-চর্ম্মের বৃদ্ধা। থেলো-হুঁকোর ভক্ত এখনও। তামাকের।

বেশী দূরে নয়। বড় বাড়ী কাছেই। ফটক থেকে রাস্তায় পা দিতেই অনাহূতের দল মন্তব্য শুরু করলো। দ্বারপাল তাদের প্রবেশ করতে দেয়নি। বাধা দিয়েছে। এক পাল অপোগণ্ড। আকৃতি এবং প্রকৃতি দুই-ই তাদের সমানে। চাল-চুলো নেই নিজেদের। মুখের আক-ঢাক নেই।

এক জন বললে,—আমাদের খোদ্ কর্ত্তা-শালা আসছে। শালার ঘরের শালা!

আরেক জন তালিম দেয়,—আমরা কি এমন দোষ করলাম বাবা! গাড়ী-বাড়ী নেই ব'লে কি বাবা গান শুনতেও জানি না!

অপর এক জন ভুল শুধরে দেয় দ্বিতীয় বক্তার। বলে,—হ্যাঁ, গাড়ী-বাড়ী না থাকলে কি পাত্তা পাওয়া যায় কখনও? যায় না, যায় না, যায় না।

অনন্তরাম সঙ্গে ছিল। বললে,—ও-সব কথায় তোমার কান দিয়ে কাজ নাই। বলতে দাও না, কত লোকে এমন কত কথা বলে।

কৃষ্ণকিশোর চলতে চলতে বলে,—কিন্তু আমার বাবাকে যে গাল দিচ্ছে?

অনন্তরাম খেঁকিয়ে ওঠে যেন। বলে,—বলতে দাও না তুমি। এরা কি মানুষ? শালারা শূয়োরের বাচ্ছা।

আকাশে চাঁদ। চতুর্দ্দিক আলোয় আলোকময়! জ্যোৎস্না-ধৌত পথ। বড় বাড়ী। ঐ তো দেখা যাচ্ছে বড় বাড়ীর সীমানা। ঘর নয়, কুঠি নয়, বাড়ীও নয়—সুবৃহৎ প্রাসাদ। সাত-মহলা। মূল। কাণ্ড।

বড় বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই দু'পাশে বৈঠকখানা। সন্ধ্যার আমেজে বাবুরা বন্ধুদের নিয়ে তাস-দাবা খেলছেন। হৈ-হৈ আর হল্লা। তুরুপ আর কিস্তী-মাতের জয়ধ্বনি। ভৃত্য-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণকিশোরকে দেখেই

বাবুরা খেলা থামিয়ে মুখ ফেরালেন তার পানে। সবার বড় যিনি, তিনি বললেন,—কি হে কিশোরচাঁদ ?

কৃষ্ণকিশোর ভয়েই জড়-সড়। আমতা আমতা ক'রে বললে,—আমাদের নাটমন্দিরে নামগান হচ্ছে। মা বললেন আপনাদের আসতে।

খেলা তখন সবে মাত্র জমেছে। ইয়ার-বন্ধু আর মোসাহেবদের মুখগুলো এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা নিরাশ হয়ে পড়লো।

সবার বড় যিনি তিনিই বললেন,—আমাদের আর কেন ? যাও তুমি, অন্দরে যাও, দেখো না মেয়েরা যদি কেউ যেতে চান। আমরা যে এইমাত্তর তোড়জোড় ক'রে খেলতে বসেছি।

অনন্তরামকে সদরে রেখে অন্দরের দরজা পেরিয়ে ভেতরে যেতেই অন্ধকারে কে যেন তার একটা হাত চেপে ধরলো। ফিস-ফিস ক'রে বললো,—তুই আর আসিস্ না কেন রে কিশোর ?

সে বুঝতে পারে প্রশ্নকারী কে। বলে,—কমল দিদি ?

—হ্যাঁ রে, চিনতে পারলি না ? তুই কেন এয়েছিস ?

—আমাদের নাটমন্দিরে যে নামগান হচ্ছে। তোমাদের ডাকতে এসেছি। তুমিও চল না।

—তাই না কি ? আমাকে একলা যে যেতে দেবে না। সবাই যদি যায় তা হলে যেতে পারি।

—সবাইকেই বলতে পাঠিয়েছেন মা। যার ইচ্ছা হবে সে-ই যেতে পারে। তুমিও চল।

—ঐ তো বললাম, সবাই যদি যায়। তোকে কত দিন দেখিনি বল্ তো ?

সে এ কথার কোন উত্তর দেয় না। কি বলবে, মা বড় একটা আসতে দেয় না? কমল দিদি, কমল, কমলমণি! হাতের পরশ আর গায়ের গন্ধেই কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পেরেছে, এ আর কেউ নয়—সেই কমল দিদি। কি একটা সেণ্টের সুমিষ্ট গন্ধ, কমল দিদির কাছে এলেই সেই গন্ধ পাওয়া যায়। কমল দিদির সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে সেই মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধটা।

—তুমি জানলে কি ক'রে যে আমি এসেছি? জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণ-কিশোর।

অন্ধকার থেকে কথা ভেসে আসে।—দেখলাম যে ওপরের জানলা থেকে তুই ইদিকে আসছিস। কথার শেষে একখানা হাত নয়, দু'খানা হাত ধ'রে একেবার বুকের ভেতরে তাকে যেন টেনে নেয় কমলমণি। দুই গালে হঠাৎ চুমু খেতে শুরু করে দেয় তার। বলে,—আসতে পারিস না তুই? যখন খুশী চলে আসবি।

কি বলবে সে, মা বড় একটা আসতে দেয় না। সব কথা কি আর সব সময়ে সকলকে বলা যায়। বলে,—কমল দিদি, তোমার কি জ্বর হয়েছে? তোমার গা গরম কেন?

কমলমণির কণ্ঠে যেন বিস্ময়। নিজের বাহু থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে যেতে বললে,—জ্বর! কৈ না তো। তা হবে। তুই যা, ভেতরে যা। আমি চললাম। ঐ কে আসছে বুঝি!

অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে যায় কমলমণি। ঢুকে পড়ে কোন এক ঘরে। কমলমণি বাড়ীর ছোট কর্ত্তার মেয়ে। কৃষ্ণকিশোরের বোন হয় সম্পর্কে। সে বটঠাকুমার ঘরের দিকে চলতে শুরু করে। এদিকটায় আর তেমন অন্ধকার নেই। লম্বা বারান্দার কড়িতে একটা বেল-লণ্ঠন টিম-টিম ক'রে জ্বলছে।

বটঠাকুমা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন,—এসো ভাই, এসো। এমন সময়ে হঠাৎ? হাতের হুঁকো সরিয়ে রাখলেন ফুলকুমারী।

কেন যে সে এসেছে সে কথা শুনে তিনি তাঁর বৌ-ঝিকে বললেন একবার ঘুরে আসতে। তাঁরা সব অন্য বাড়ীর মেয়ে। মুখ বেঁকিয়ে বললেন কেউ কেউ,—এত রাত্তিরে কি আর যাওয়া যায়! জানে, এখন বললে কেউ তো আর যাবে না, তাই গিন্নী ছেলেকে পাঠিয়েছেন। আমাদের এখন কত কাজ!

তাঁদের কথায় কেমন যেন অপমান বোধ করলো কৃষ্ণকিশোর। বট-ঠাকুমাকে প্রণাম ক'রে তরতরিয়ে চলে এলো ভেতর থেকে বাইরে। তার পর সদর থেকে একেবারে রাস্তায়।

অনন্তরাম দাঁড়িয়ে ছিল প্রতীক্ষায়। তাকে দেখে বললে,—কি, কেউ আসবে না তো?

—হ্যাঁ। বললে কৃষ্ণকিশোর।

—জানতাম। আগেই আন্দাজ ক'রেছি। ত্রিশটা বছর তো কাটলো এ বাড়ীতে। সেই কুড়িতে ঢুকেছি, আর আজ পঞ্চাশের ধাক্কা। কথাগুলি যেন স্বগত করে অনন্তরাম। বলে,—চল, যাওয়া যাক্। তা না এসে এক রকম ভালই ক'রেছে। এলে এখুনি আর দেখতে হ'ত না! কার সম্মানের হানি হল তাই দেখতে দেখতেই জান বেরিয়ে যেতো। চল, চল, যাওয়া যাক্।

তাদের ফটকের সামনে তখনও জটলা। সেই তারা—যারা আসরে স্থান পায়নি। মন্তব্য করছে। টীকা আর টিপ্পনী। দ্বারপাল ফটক বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। যেন পশুশালার পশু। আর নাটমন্দিরে তখন সুর সপ্তমে চড়েছে। দূর থেকেও শোনা

যাচ্ছে সেই গানের সুর। কথা শোনা যাচ্ছে না।

কৃষ্ণকিশোর মায়ের কাছে যায়। বলে,—বড় বাড়ীর কেউ আসবেন না।

কুমুদিনী বললেন,—না আসে আমি আর কি করতে পারি? আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন ক'রেছি। তা তুমি এবার যাও, আসরে গিয়ে ব'স। কত গণ্যমান্য লোক এসেছেন। তাঁদের আদর আপ্যায়িত কর'।

কৃষ্ণকিশোর অনুনয়ের সুরে বলে,—তুমিও চল! চিকের ভেতরে বসে গান শুনবে।

সে কি কথা! সেখানে পাড়া-প্রতিবেশী কত মেয়ে-বৌ এসেছে। সেখানে যাবেন কুমুদিনী। গান শুনতে। তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই বাড়ীর লোক ব্যতীত আর কোন অপর জন কুমুদিনীর মুখ দেখতে পেয়েছে? না, তা হয় না। কুমুদিনী বললেন,—না বাবা, লক্ষীটি, আমি আর যাবো না। তুমি যাও তাড়াতাড়ি। আর তোমার ম্যানেজারকে বল, কেউ যেন প্রসাদ না খেয়ে চলে না যান।

অগত্যা সে একাই আসে। কুমুদিনী আসেন না। ম্যানেজার বাবু এসে কানে কানে বলেন,—ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরা ঐ ওদিকে সব রয়েছেন। আপনি গিয়ে তাঁদের প্রণাম করুন।

আসর তখন গম-গম করছে। কাকেও প্রণাম, কাকেও নমস্কার, আর কাকেও শুধু মুখের হাসি দেখিয়ে আপ্যায়িত করে কৃষ্ণকিশোর। ক্ষণিকের জন্য শ্রোতাদের চোখ গায়কদের দিক থেকে তার দিকে ফেরে। মালিক, তাই ফিরে ফিরে দেখে সকলে। প্যালার থালাটা দেখতে পাওয়া যায় প্রায় পরিপূর্ণ। টাকা আনা আর পয়সা। যে যেমন মানুষ সে তেমন দিয়েছে। কৃষ্ণকিশোর আসরের মধ্যিখানে বসে। গায়কদের পুরোভাগে। গান চলে দ্রুত লয়ে।

বড় ক্লান্ত মনে হয় যেন এতক্ষণে। ঘোরাঘুরি আর টানা-পোড়েনে কেমন যেন কাহিল মনে হয় নিজেকে। এত লোকের মাঝে এসে কিছু বা লজ্জা আর সঙ্কোচ হয়। চুপ-চাপ ব'সে থাকে সে।

রাত কত? গান শেষ হতেই বা দেরী কত আর। ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টায় ঘা পড়তে শুরু হয়। একটা···দুটো···পাঁচটা···সাতটা···ন'টা বাজলো। বাসদেও মাহাতো পাশেই ছিল। বললে সে,—কখন শেষ হবে বাসদেও?

—হয়ে এসেছে হুজুর। শ্রীরামচন্দ্র এখন হরধনু ভঙ্গ করবেন আর সীতা মায়ীকে সাধি করবেন। সেখানেই শেষ হবে গান। বললে বাসদেও মাহাতো।

ফার্ষ্ট বুক। ফার্ষ্ট বুক দেখতে হবে যে। ইংরেজী ভাষার প্রথম ভাগ। অরুণেন্দ্র দিয়ে গেল। বললো অক্ষরগুলো চিনতে চেষ্টা কর'। অরুণেন্দ্র পড়াবে তাকে ইংরেজী।

ঐ মেয়েটা কে! চিকের আড়াল থেকে দেখছে আর হাসছে মিটি-মিটি। চেনা-চেনা যেন মুখটি তার। কে? আইভিলতা! আইভিলতা আসবে এই আসরে! হবেও বা। লক্ষ্য ক'রে দেখে—হ্যাঁ, আর কেউ নয়। ঐ আইভিলতা।

এত দিন দূর থেকে দেখেছে। দূরের ঐ বাতায়ন-পথে। এই প্রথম দেখলো এত কাছের থেকে। দেখলো, সত্যিই আইভিলতাকে দেখতে প্রতিমার মত। আর কত গয়না পরেছে। চুণী-পান্নার গয়না। লণ্ঠনের আলো-ছায়ায় দেখায় বড় অদ্ভুত। ঠিক যেন মহারাণীর মত।

মিটি-মিটি হাসে আইভিলতা। সে হাসে না, সে শুধু তাকায়! হাসলে কে কি মনে করবে যদি কেউ দেখতে পায়। মনে মনে সে গৌরব বোধ

করে। তাদের বাড়ীতে এসেছে গান শুনতে ঐ আইভিলতা!

কিন্তু শেষ হতে কত দেরী আর? ম্যানেজার বাবু নিজে হাতে প্রসাদ বিতরণ করছেন। পালা ভাঙতে দেরী নেই বেশী। মিষ্টান্ন আর জল। আর ফলের মধ্যে পেয়ারা, শশা, শাঁকালু।

গান শেষ হতেই যে যার ঘরে ফিরে যায়। একে একে সকলে চলে যায়। কৃষ্ণকিশোর বসে থাকে বিহ্বলের মত। আইভিলতাও চলে যাচ্ছে। সে উঠলো, দেখলো, আর হাসলো। তার পর খিড়কির দরজা দিয়ে চলে গেল একেবারে। ছেলের যখন চেতনা ফিরলো তখন দেখে যে নাটমন্দিরের অতিথিদের কেউ নেই আর।

এখন আকাশের মধ্যিখানে চন্দ্ররাজ। স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার প্রবাহ। মেঘের জটলায় ঢাকা পড়েছে চন্দ্রসভা। চন্দ্রশোভা?

ফার্ষ্ট বুক! আর এখন অন্য কিছু নয়। নয় অন্য কোথাও। আহার সেরে সোজা শয্যায়। তার পর একা একা প্রথম ভাগের পড়া। ইংরেজী ভাষার প্রথম ভাগ। সে মায়ের কাছে যায় আহার সারতে।

পড়ার ঘরের দেরাজ থেকে বের ক'রে নেয় সেই বইখানা—ফার্ষ্ট বুক! ফার্ষ্ট বুক! ফার্ষ্ট বুক!

জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনী।

ভস্ম বর্ষণ হচ্ছে নাকি। এমন স্বর্ণাভ চন্দ্রিমার ছড়াছড়ি দিকে দিকে। নীল আকাশে তুষার-শুভ্র মেঘ বৈরাগীর মত ভেসে চলেছে বাতাসের বেগে। পৃথিবীর কত কাছাকাছি নেমে এসেছে। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় পূর্ণ গোলাকার ঐ স্বর্ণপিণ্ড? যাওয়া যায় সেখানে? চাঁদের দেশে? না। কেউ এখনও যেতে পারেনি সেখানে। চন্দ্রলোকে। কিন্তু কে আছে ঐ

চাঁদের রাজত্বে। পিসীমা বলেছেন, আছে। আছে একজন। শনের মত চুল, কোটরগত চোখ, লোলচর্ম্মা এক বৃদ্ধা। কাজকর্ম্ম নেই, কি করবে। ব'সে ব'সে তাই পেঁজা তুলোয় সুতো কাটে। চরকা ঘোরায় আর সুতো কাটে!

ঘরের ভেতর লণ্ঠনের স্বল্প আলো। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঝলক এসে লজ্জিত করে যেন ঐ আলোর শিখাকে। রাশি রাশি জ্যোৎস্না। কোথা দিয়ে রাত্রি চলে যেতে থাকে। প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত দেখতে-দেখতেই তন্দ্রা নামে চোখে। পড়া হয় না, শুধু দেখা হয় মাত্র। কেমন জন্তু-জানোয়ার আর পাখীর ছবি! মুরগী, হাঁস, ময়ূর, সিংহ, বাঘ, গোখরো সাপ। কি আছে এই বইয়ে যে, নিজের মা থাকতে অপরের মাতৃবন্দনা। সমগ্র ইউরোপের সর্ব্বজনীন এই একটি মাত্র ভাষা—এ্যাংলো-স্যাক্সন্ আর ব্রিটনের মাতৃভাষা। কুইনের ব্রিটানিয়ার প্রথম সোপান। প্রথম ভাগ, ফার্ষ্ট বুক!

অনুগত প্রজার রাজভক্তির কি এই প্রকৃষ্ট পরিচয়! দেশের ঠাকুর ফেলি বিদেশের—। কিন্তু অক্ষরের সঙ্গে আর পরিচয় হয় না। ছবি দেখতে দেখতেই চোখে তন্দ্রা নামে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন বাইরে প্রখর রৌদ্র। বেলা অনেক।

স্বপ্নমুখর রাত। এলোমেলো, সামঞ্জস্যহীন স্বপ্ন। যেন গান হচ্ছে। গান গাইছে বাসদেও মাহাতোর ছেলেরা। লাল আলপাকার সেই রুমালখানা এলো কোথা থেকে? ম্যানেজার বাবু ব্যস্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা করছেন। অরুণেন্দ্র বলছে,—'আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত। জল দাও, খাবার দাও।' নাটমন্দিরে লোকজনের হৈ-হৈ। চিকের আড়ালে চুণী-পান্নার গয়না-পরা একটা মেয়ে, হাসছে মিটি-মিটি। কুমুদিনী ডাকতে পাঠিয়েছেন

অন্দর থেকে। আদি-অন্তহীন একেক ঘটনার ছিন্ন স্বপ্নজাল। টাটকা স্মৃতির স্বপ্নিল রোমন্থন। রাত ফুরিয়ে কখন দিনমণির আবির্ভাব হয়েছে। সেই সঙ্গে পাখীর কল-কাকলী।

একটা চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে যেন কোথা থেকে। কে এমন অসময়ে কাঁদে। এমন ইনিয়ে বিনিয়ে, মেয়েলী কণ্ঠে! শোনা যায় কান্নার সঙ্গে টুকরো কথা। সকাতর আত্ম-বিলাপ।

স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন। এখনও কি ঘুমিয়ে আছে না কি। কৈ, না তো! ঐ তো চোখের সমুখে শুভ্র আকাশ—হলুদ রঙের কাঁচা সূর্য্যালোক। দূরে, আকাশের বহু দূরে চিল পাক খাচ্ছে ডানা ছড়িয়ে। রাস্তায় শুরু হয়েছে মানুষের কলরোল।

আর বাড়ীতে এই চাপা কান্না।

কিন্তু কাঁদে কে? এক অজানা দুর্ঘটনার আতঙ্কে উঠে পড়লো কৃষ্ণ-কিশোর। ঘরের বাইরে দালানে আসতেই দেখে কে একজন গুণ্ঠনবতী। বসে বসে কাঁদছেন। কুমুদিনী তাঁর কাছে বসে প্রবোধ-বাক্য শোনাচ্ছেন। দুঃখ ভুলতে বলছেন।

কাছে আসতেই দেখতে পায়। চিনতে পারে এ যে পিসীমা। জহর আর পান্নার মা। কুমুদিনীর ঠাকুরঝি, হেমনলিনী। কখন এলেন তিনি?

—পিসীমা! সরাসরি ডেকে ফেললো সে। মুখ দিয়ে যেন বেরিয়ে গেলো কথাটা।—পিসীমা! তুমি কাঁদছ?

হেমনলিনীর মুখে আঁচল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কাঁদছেন। বললেন, —হ্যাঁ বাবা।

—কাঁদছ কেন পিসীমা? সে যেন আর থাকতে পারে না। ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে। তুমি কাঁদছ কেন?

লজ্জিত হন কুমুদিনী। ছেলের প্রশ্নে বিব্রত হন মনে মনে। ইশারায় নিষেধ করেন। মুখে তো কিছু বলতে পারেন না—একবার শুধু চোখ বড় করেন। বলেন,—মনে কষ্ট পেয়েছেন তাই কাঁদছেন। তুমি যাও, মুখে-চোখে জল দাও। বেলা অনেক হয়ে গেছে।

হেমনলিনী যেন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। গুণ্ঠন সরিয়ে মুখ তুলে দেখেন। শিউরে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর তাঁর মুখাকৃতি দেখে। ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। কান্নার একটা আবেগ সামলে হেমনলিনীই বললেন,—না বৌঠান, ওকে লুকিয়ে কোন লাভ নেই। ওরা জানুক, ওদের জানা যে দরকার। মানুষ চিনবে না বৌঠান ?

কথার শেষে অঝোরে কেঁদে ফেললেন। দু'চোখের কোণ থেকে দরদর অশ্রুধারা। ফর্সা মুখখানা তাঁর রাঙা হয়ে গেছে।

ব্যাপার দেখে কিছুই অনুমানে বোঝা যায় না। বুঝতে গিয়ে যেন লজ্জার আর অন্ত থাকে না। হেমনলিনীর মুখখানা দেখে তারও বুঝি চোখে জল আসে। হেমনলিনী বললেন,—দেখো বাবা, তোমার পিসে-মশায়ের কাণ্ড দেখো। কাল রাত্তিরে ফিরে এসে আমাকে এই রকম মেরেছেন। কত মানা ক'রেছি, শোনেননি। লাথি মেরেছেন, জুতো মেরেছেন। খানিক থেমে আবার বলেন,—তাই ভোর হতেই লুকিয়ে চলে এসেছি তোমাদের বাড়ী। আর তো কোথাও আস্তানা নেই, তাই তোমার মায়ের কাছে এসেছি।

শুধু মুখে নয়। হাত দু'খানাও আঘাতের চিহ্নে পরিপূর্ণ। নীল রঙের কালশিটে। সে দেখে আর তার চোখ ছলছল করে। পিসীমাকে মেরেছে ! পিসীমার গায়ে হাত তুলতে পারে এমন কেউ আছে এ দুনিয়ায় ?

যার ঘরণী সেই গৃহস্বামী যদি হাত চালায় তাতে আর কার আপত্তি !

যার স্ত্রী সেই পুরুষ যদি হয় অবুঝ! শিবচন্দ্র বাবু বড় দাম্ভিক, বড় একরোখা। কিন্তু মেজাজও তাঁর তেমনি কি দিলদরিয়া। নেশার বশবর্ত্তী হয়ে যা করেন তা কি আর পরক্ষণে মনে থাকে। রাত্তিরে যা করেন, সকালে?

হেমনলিনীকে ভুল বুঝেছেন শিবচন্দ্র বাবু। এমন এক নারীকে সহধর্ম্মিণী পেয়েও তাঁর মূল্য বুঝলেন না। উনুনের ধারে ব'সে সংসার করবেন দিনের পর দিন, হেমনলিনী ঠিক সেই প্রকৃতির নারী নয়। তাঁর অসামান্য রূপের না হয় কদর না করলে, কিন্তু তাঁর অসীম গুণপনার কি কোন আদর নেই। শিবচন্দ্র বাবু যাতে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হন তার জন্য কি কম ক'রেছেন হেমনলিনী? লুকিয়ে পড়াশুনা ক'রেছেন, গান শিখেছেন। অন্য কোন নর্ত্তকীর দ্বারে যাতে না যান—এমন কি তাই নাচতেও শিখেছিলেন। নিজের হাতে সুরার পেয়ালা তুলে ধরেছেন স্বামীর মুখে। কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। শিবচন্দ্র বাবুর মন বাঁধা পড়েনি কোন মতেই। মুক্ত বিহঙ্গের মত আসমানে উড়ে গেছেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

হেমনলিনী কিছুই করতে পারেননি। পাখী কখন ফিরে আসবে সেই আশায় মুহূর্ত্ত গুণেছেন গহন রাতে। একা একা। শিবচন্দ্র বাবু ফিরে এসে প্রতীক্ষিতাকে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে জুতো আর লাথি মেরেছেন। হেমনলিনী করজোড়ে অনুনয় করেছেন,—ওগো আমি! আমি যে তোমার হেম। আমাকে তুমি মারছো এমনি ক'রে?

উন্মাদ আর উন্মত্তে কোন তফাৎ নেই। শিবচন্দ্রের মত্ত অবস্থা। পুরা একটি বোতল হুইস্কির নেশা। চতুর্গুণ শক্তিতে আক্রমণ ক'রেছেন। বাধা দিতে গিয়ে হেমনলিনী লুটিয়ে পড়েছেন ভূমিতে। শিবচন্দ্র তখন লাথি চালিয়েছেন সর্ব্বাঙ্গে।

—ওগো, আমাকে তুমি মারছো এমনি ক'রে? বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন আঘাতের ব্যথায়। অশ্রু আর রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। পরনের কাপড়খানা ভিজে গেছে রক্তধারায়। তার পর রাত শেষ হ'তেই লুকিয়ে পালকীতে উঠে চলে এসেছেন পিত্রালয়ে। কুমুদিনীর কাছে। হঠাৎ আবার কথা বললেন হেমনলিনী,—বৌঠান, আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারো? খেয়ে তা হলে জ্বালা জুড়োই। আর তো ভাই, পারি না সহ্য করতে।

—ছিঃ, এমন কথা মুখে এনো না। কি করবে বল! কুমুদিনী বলতে বলতে নিজেও যে না কাঁদেন তেমন নয়। তাঁর চোখেও জল। তবে রুদ্ধ অশ্রু। চোখ দু'টো শুধু চিক-চিক করে। বলেন,—আর কাঁদে না ভাই। বাড়ীতে আবার মহলের প্রজারা এসেছে।

প্রজারা তখন প্রাতঃস্নান সেরে নাটমন্দিরে ব'সে পড়েছে সারি সারি। কপালে তাদের শ্বেত-চন্দনের লেপন। কোরাস স্বরে মন্ত্র বলছে। ধীর-গম্ভীর সকলের কণ্ঠস্বর। নাগরী ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ। সছন্দ।

তারা এসেছে যাযাবর পাখীর মত। প্রতি বছরেই আসে একবার একেক দল। আসে বাকী খাজনা দিতে আর ফসলের বীজ কিনতে। ভুট্টা, মকাই, অড়হর, সর্ষে আর ধুঁধুলের বীজ। পাইকারী দরে কিনবে। নিয়ে যাবে আর ছড়িয়ে দেবে মাঠে। এক দিন দেখতে দেখতে মাটি চিরে অঙ্কুরোদ্গম হবে। সেই লাঙল-চষা কালো মাটি হঠাৎ এক দিন সবুজের আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে। তারপর মাঠ থেকে যাবে ব্যবসাদারের হাতে। চলবে টাকা-পয়সার খেলা। বীজ থেকে ফসলই শুধু হবে না, হবে শ'য়ে শ'য়ে টাকা। তারা এসেছে চলে যেতে। কাজ সেরেই চলে যাবে।

ব্যাপারটা যাতে লঘু হয়ে যায় সেই আশায় অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা

করেন কুমুদিনী। ছেলেকে বলেন,—তুমি কি মনে করেছো পড়াশুনোর বালাই একেবারে চুকিয়ে দেবে? কি ঠিক করলে কি?

কুমুদিনীর স্বর ঝাঁজালো। কথায় যেন রুক্ষতা। ক্রোধের আভাস। বললেন,—যাও না, পড়ার ঘরে একবার যাও না। সময় কি এমনি ক'রেই হেলায় হারায়? এমন সকালটা নষ্ট করবে?

সে প্রথমে বিস্মিত হয় মায়ের কথার ধারায়। কুমুদিনীর চোখে চোখ পড়তেই দেখে তিনি ভ্রূ কুঁচকে ইশারায় চলে যেতে বলছেন এখান থেকে। আঁচল-চাপা হেমনলিনীর চোখ দেখতে পায় না সেই ইঙ্গিত।

কৃষ্ণকিশোর সবিস্ময়ে চলেই যায় সেখান থেকে। বোঝে না এত-শত, বোঝে শুধু পিসী, তার পিসীমার গায়ে হাত পড়েছে। তাঁর মত মানুষের শরীরে প্রহারের চিহ্ন! কি পাশবিকতা!

সময় কি হেলায় হারায়। কুমুদিনীর এই কথাটিই যেন তার চেতনাকে সব চেয়ে বেশী আঘাত করলো। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্। সময় এবং প্রবাহ চির-বহমান—কারও অপেক্ষায় থাকে না।

পেছনে ছিল অনন্তরাম। কৃষ্ণকিশোর বলে,—অনন্তদা, বিছানায় একখানা বই ফেলে এসেছি। লুকিয়ে নিয়ে এসো। মা যেন দেখতে না পায়।

বই বিছানায়? ক্ষণিকের জন্য কৌতূহল জাগে অনন্তরামের মনে। এ ছেলে তো সে ছেলে নয়। না ঘুমিয়ে পড়বে। বই হবে তার শয্যা-সঙ্গী। তবে কি বই যে, এমন লুকোচুরির পাঠ? তবে হয়তো কোন অশ্লীল বই। এরই মধ্যে এতটা পাক ধরলো ছেলের মনে। গেল কি উচ্ছন্নয়?

ঘরে এসে বইখানাকে উলটে-পালটে দেখলো অনন্তরাম। দেখলো ভাষা বাঙলা নয়। সেই নীলকর সাহেবদের যে ভাষা সেই ভাষার বই। ম্লেচ্ছ ভাষার। অনন্তরাম হেসে ফেললো আপন মনে। বুঝলো এ সেই ফিরিঙ্গী ছোঁড়াটার কাণ্ড। ম্লেচ্ছদের দলে নাম লিখিয়ে নেওয়ার ওষুধ খাওয়াতে চাইছে। ল্যাজ-কাটা শেয়াল চাইছে অন্যের লেজ কাটতে। হেসে ফেললো অনন্তরাম। এমন অনেক দেখেছে সে। বহুত-বহুত। যখন নীলের চাষে কাজ ক'রেছে, দেখেছে—অজ্ঞ, নিরক্ষর, সরল গ্রামীণদের ধ'রে ধ'রে কানে খৃষ্টমন্ত্র শুনিয়েছে পাদরীরা। মন্দির আর মসজিদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। গির্জ্জা তৈরী হয়েছে এখানে-সেখানে। শাসনের পীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতে দলে দলে গ্রাম্য বাঙালী বুকে ঝুলিয়েছে যীশুর ক্রুশ। অনন্তরামের মনটা এক অনাগত আশঙ্কায় যেন ত্রস্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ।

কিশোরের বাপকে মনে পড়ে যায়। প্রভু কৃষ্ণচরণকে। তাঁর নিষ্ঠা আর ধর্ম্মকর্ম্মকে; তাঁর পাণ্ডিত্য আর বিনম্রতা। এ অঘটন ঘটলে তাঁর আত্মা অস্থির হবে; তিনি শান্তি পাবেন না। অনন্তরামের ইচ্ছা হয় বইখানাকে এখনই ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে উনুনে দিয়ে আসে। কিন্তু বই কি এই একখানা? একটা গেলে আরেকটা আসবে না?

কৃষ্ণচরণ দাতাকর্ণ ছিলেন। পাঠশালা স্থাপন আর বিদ্যোৎসাহীদেরই দান ক'রেছেন অজস্র অর্থ। ভগ্ন মন্দির সংস্কার করাতেন। শূন্য মন্দিরে বসাতেন বিগ্রহ। কসাইদের হাত থেকে টাকার বিনিময়ে উদ্ধার করতেন অসংখ্য গাভী—বিলিয়ে দিতেন তাদের, যারা গো-পালনের যোগ্য। ধর্ম্মে কারও হাত পড়লে কড়া চিঠি দিতেন তৎকালীন রাজ্যপাল—গভর্ণরকে। বাঙলার গভর্ণরকে। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান আর ত্রি-সন্ধ্যায় আহ্নিকের ব্রত

পালন করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। স্বর্গত মাতৃদেবীর পদরজ মুখে দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করতেন। আর তাঁর ছেলে—

একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অনন্তরামের বুকের অন্তস্তল থেকে। গৌরবময় অতীতের একেক ছবি দেখতে পায় যেন। সেই সব হারানো দিনের টুকরো-টুকরো ছবি।

অবসর পেলেই কৃষ্ণচরণ চলে যেতেন গায়ে উত্তরীয় চাপিয়ে। জুড়ী হাঁকাতেন স্বয়ং। কুমুদিনী বুঝতে পারতেন, কর্ত্তা চলেছেন শোভাবাজার রাজবাড়ীতে। মহারাজা নবকৃষ্ণের রাজত্বে। সেখানে আছেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। বাঙলা দেশে বিদ্যাশিক্ষা প্রচারের প্রধান পুরোহিত। মুকুটমণি। কৃষ্ণচরণ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, সেই কায়স্থ-কুলশিরো-ভূষণের পাদস্পর্শ করতেন। রাজা ধর্ম্মশীল, ঘোর আপত্তি জানাতেন। বলতেন,—ভায়া, শেষে কি মহাপাতকী করবে?

কৃষ্ণচরণ সশ্রদ্ধায় উত্তর দিতেন,—বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে। আপনি পূজনীয় ব্যক্তি, আপনি যে শব্দকল্পদ্রুম রচনা ক'রেছেন!

রাজা হাসতেন বিনয়ের হাসি। তার পর দুজনে চলতো শাস্ত্রীয় বিদ্যার আলোচনা। তর্ক-বিতর্ক। বাদানুবাদ।

অনন্তরাম পড়ার ঘরে আসতেই সুর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর,—অনন্তদা, পিসীমার কি হয়েছে বল' তো?

বইখানা সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বললে অনন্তরাম,—কি আর হবে? যা হয় তাই হয়েছে।

—কি হয়েছে? তার কথায় সাগ্রহ কৌতূহল।

অনন্তরাম।—হবে আর কি, তোমার গুণধর পিসে মদ টেনে এসে ঠেঙ্গিয়েছেন। আহা, এমন লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রীকে ধ'রে মারে! তোমার পিসীর

মত মেয়ে আর আছে না কি একটা? এ তল্লাটে?

—পিসেমশায়ের কি অন্যায় বল' তো! ছিঃ! কৃষ্ণকিশোরের কথায় সহানুভূতির সুর।

অনন্তরাম।—অন্যায়! এক-আধ বোতল পান করলে কি আর তিনি মানুষ থাকতে পারেন! অমানুষ হয়ে যান। নেশা হয়, উত্তেজনা হয়। তাই মারা-ধরা করেন।

কৃষ্ণকিশোর বলে—কেন?

অনন্তরাম কি ভাবতে থাকে যেন। ক্ষীণ হাসির সঙ্গে হঠাৎ বলে,—কেন? জানিস, রাধিকা চোখে কাজল পরেছিলেন। অনুরাগের কাজল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ। তখন যেদিকে তাকান সেদিকেই দেখেন অনুরাগ। মাতালও তাই নিজে পঙ্ক-কুণ্ডে থেকে চতুর্দ্দিকে পাঁক দেখতে পায়। নিজে দোষ ক'রে অপরের দোষ দেখে। তোর পিসে দোষ দেখেছেন, তোর পিসী নাকি তাঁকে অবহেলা ক'রেছে। তাতেই রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে হাত-পা চালিয়েছেন।

—অনুরাগ কি অনন্তদা? কেমন যেন অস্বাভাবিক ব্যগ্রতার সঙ্গে কথাটা বলে ফেললে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম হাসলো একটু। খুশীর হাসি নয়। তার ব্যগ্রতা দেখে হাসলো। চুপি-চুপি বললে,—অনুরাগ? কেন, তোর কারও প্রতি হয়েছে নাকি!

—যাঃ। বল' না তুমি। বিরক্তির সঙ্গে বলে সে।

কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকে অনন্তরাম। তার পর বলে,—মুখ হাত ধুয়েছো?

কৃষ্ণকিশোর।—হ্যাঁ।

অনন্তরাম।—তা হলে জলখাবার এনে দিই, খাও। খেয়ে একটু পড়তে

ব'স না কেন। মা এত ক'রে বললেন।

কৃষ্ণকিশোর।—বল' না ছাই।

অনন্তরাম আবার নীরব থাকে। কিছু বলে না। খানিক তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বলে,—ঐ দেখো না কেনে অনুরাগ কাকে বলে! আমি যাই তোমার খাবার আনি গে।

হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনন্তরাম। অট্টহাসি হাসতে হাসতে।

কে? কৃষ্ণকিশোর জানলার বাইরে দেখলো। অদূরে এক গৃহের প্রায় শিখর-দেশের বাতায়ন-পথে দাঁড়িয়ে কে একজন। এলায়িত উড়ন্ত কেশরাশি, আর ঘন খয়েরী রঙের শাড়ী। কে আবার? সেই আইভিলতা। আজ আর চোখ তার ইদিকে নয়। কোন্ আকাশপানে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। কেন?

ম্যানেজার বাবু ঘরে প্রবেশ করলেন। হাতে এক তাড়া চাবি। বললেন,—একবার যদি এসে দাঁড়াতেন। ছোট বাবুর বাজনার ঘর খুলে যন্ত্রগুলি তুলে রাখতে হবে। অনেক মূল্যবান সামগ্রী আছে সে ঘরে। চাকর-বাকর কে কোথা থেকে কিছু একটা—

তখন সে বইয়ের পাতা খুলে ব'সেছে। পড়তে শুরু ক'রেছে, ব্যাকরণ-কৌমুদীর আত্মনেপদী রূপ। তে, আতে, অন্তে—সে, আথে, ধ্বে—এ, বহে, মহে। লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ ইত্যাদি। বই থেকে মুখ তুলে বললে,—এখন নয়। একটু অপেক্ষা করুন।

—যে আজ্ঞে! বলতে বলতে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ম্যানেজার বাবু। যেন কত অপ্রস্তুত হয়ে প'ড়েছেন।

ছোট বাবু। কৃষ্ণকান্ত।

কৃষ্ণচরণের অনুজ। বয়সে অনেক তফাৎ দুজনে। দাদা আর ভাইয়ে। বড়ভাই ছোটভাইকে কখনও বুঝতে দেননি যে, সে পিতৃহীন। তার মুখে হাসি না দেখলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলতেন। ছোট ভাইকে পালন করে-ছিলেন নিজের ছেলের মত। আর কৃষ্ণকান্ত ছিলেন দুর্দ্দান্ত, যাকে বলে গিয়ে দামাল। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে. বেড়াতেন ঘোড়ার পিঠে চেপে কলকাতা শহরে। সেই ঘোড়া থেকে প'ড়েই তাঁর মৃত্যু হয়। সেই ঘোড়াই হয়ে দাঁড়ালো যত কাল! বুকের পাঁজর একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল। কৃষ্ণচরণ কোন মতেই ভাইকে রক্ষা করতে পারলেন না। অকালে তাই কৃষ্ণকান্ত চ'লে গেছেন।

কৃষ্ণকান্তর দুই রূপ ছিল।

প্রকৃতির এ-পিঠ আর ও-পিঠ। আলো আর অন্ধকারের মত। পূর্ণিমা আর অমাবস্যা। সারাদিন হাতে থাকতো ঘোড়ার বল্‌গা আর দিনান্তে হাতে তুলে নিতেন একটি "তত" যন্ত্র! রুদ্রবীণা। দিনে চিৎকার-ধ্বনিতে বাড়ী মাথায় ক'রে তুলতেন। আর রাতের বেলায় বাদ্যযন্ত্র শোনাতেন নানা ঝঙ্কারে—রুদ্রবীন।

কৃষ্ণকান্তর বাজনার ঘরে শুধু বাজনা।

দেওয়ালে হেলানো। মাটিতে বসানো। আলনায় ঝোলানো। সারি সারি যন্ত্র আর মধ্যে মধ্যে মাথা সমেত বাঘের ছাল। দেওয়াল থেকে মেঝেয় এসে হাঁ ক'রে রয়েছে। চিরকাল ঐ হাঁ ক'রেই রয়েছে। যত রাজ্যের বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহের বাতিক ছিল কৃষ্ণকান্তর। যেখানে যা পেয়েছেন, এনে সাজিয়ে রেখেছেন। তত, শুষির, আনদ্ধ আর ঘন বাদিত্রের সভা বসিয়ে গেছেন যেন। সভার মধ্যিখানে পারস্যের একরঙা কার্পেট একখানা। ঘন লাল রঙ, নক্সাকাটা। ভেলভেটের। আর গোটা কয় তাকিয়া আছে। নেই শুধু সভাপতি।

বাসদেও মাহাতোর ছেলেরা কাল গান গেয়েছিল। তাই কৃষ্ণকান্তর বাজনার ঘরের তালায় হাত পড়ে। বেরিয়েছিল হারমনিয়ম, এক জোড়া তবলা আর করতালি। তাদের যথাস্থানে রাখতে হবে, নির্দ্দিষ্ট জায়গায়। যেখানে যেমনটি ছিল। ম্যানেজার বাবু তাই এসেছিলেন। চেয়েছিলেন মনিবের উপস্থিতি, নতুবা দরজা খোলা সমুচিত হবে না হয়তো।

মূল্যবান সামগ্রীর মধ্যে ঘরে আছে চারটি ধাতব মূর্ত্তি। নিরেট রূপোর। পোষা ভেড়া হাতে পরীদের মূর্ত্তি। ডানা-কাটা প্রায় উলঙ্গ পরী। ঘরের চার কোণের তেকোণা ব্রাকেটে দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে হাতীর দাঁতের নারীমূর্ত্তি। বাজারে পাওয়া যায় না, অর্ডারী মাল। চার জাতের নারীমূর্ত্তি—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী আর হস্তিনী।

কৃষ্ণকান্তর চাকর ছিল রঞ্জন। হাতে তৈরী চাকর। সেই রঞ্জনের হেফাজতে থাকতো ঐ বাজনার ঘর। কৃষ্ণকান্তর ঐ বাদ্য-মন্দির।

মনিব চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনও বিদায় নিয়েছে। চিরকালের মত দেশে চলে গেছে। আর আসেনি। কৃষ্ণকান্ত তাকে নিজে পড়াতেন। রঞ্জন নাকি ইংরেজীও পড়তে পারতো। কৃষ্ণকান্ত বলতেন,—পারিস তো ম্লেচ্ছ ভাষা শিখে ফ্যাল্। তাদেরই রাজত্ব হয়েছে এখন। কদর হবে দেখবি।

•

বাজনার ঘর খোলা হবে।

কৃষ্ণকান্তর বাদ্য-মন্দির। আবছা-আবছা মনে পড়ে কৃষ্ণকিশোরের। মনে পড়ে সেই অদ্ভুত মানুষটিকে। পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। মাথায় বাবরি চুল। আজানুলম্বিত বাহু। সুবিশাল চক্ষু। দুধের মত রঙ। মনে পড়ে যখন কাকাবাবু সারা বাড়ীতে ঘোরাফেরা করতেন তখন তাঁর

একটি হাত ধ'রে ঝুলতো কৃষ্ণকিশোর। সস্নেহে তাকে হাতে নিয়ে কৃষ্ণকান্ত ঘুরে বেড়াতেন বাড়ীময়। কারণে-অকারণে চিৎকার ক'রে ডাকতেন যখন তখন,—বৌঠান, বৌঠান, বৌঠান!

হাসি-ভরা মুখে কুমুদিনী এসে দাঁড়াতেন। বলতেন,—ডাকছো ঠাকুরপো? তা কি আস্তে ডাকতে নেই?

কৃষ্ণকান্ত হাসি চেপে বলতেন,—হ্যাঁ, ডাকছি। ডেকে ডেকে তো সাড়াই পাই না। গলা ভেঙ্গে যায়। বলছিলাম, আজ কি বার বল' তো?

কুমুদিনী এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেন না। হাসতে হাসতে চলে যেতেন। বলতেন,—পাঁজীতে দেখো না ভাই। আমার অত-শত মনে থাকে না।

কৃষ্ণকান্ত চাপা হাসির সঙ্গে বলতেন,—তবে কি মনে থাকে আমার দাদাটিকে? কুমুদিনী সে কথারও কোন উত্তর দিতেন না। হাসতেন শুধু। হাসতে হাসতে কোন এক ঘরে ঢুকে পড়তেন তামাসার মাত্রা যাতে আর না বেড়ে যায় সেই জন্যে।

ব্যাকরণ-কৌমুদী। পাণিনির অনুসরণে রচিত।

বর্ণ-বিভাগ, সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ব বিধান, শব্দরূপ, বিভক্তির আকৃতি, ধাতুরূপ, কৃৎ প্রকরণ, বিভক্তি নির্ণয়, কারক, তদ্ধিত, স্ত্রীপ্রত্যয় আর বহুবিধ জটিল বিষয়। এক নাগাড়ে দিনের পর দিন পড়তে পড়তে এদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এক রকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে বললেই হয়। তবুও পড়তে হয়, অভ্যাস রাখতে হয়। অনভ্যাসে ভ্রান্তি আসতে পারে, স্মৃতি-বিভ্রান্তি।

কিন্তু ঐ শিরোমণি পণ্ডিত!

চতুষ্পাঠীতে গিয়ে নিয়ম মত পড়তে তার আপত্তি নেই। শিরোমণি তর্করত্ন আমাদের স্বদেশী বিদ্যার হাটে এক নামজাদা আড়ৎদার। রাজা-রাজড়াদের দক্ষযজ্ঞের দান-দক্ষিণার লম্বা ফর্দে শিরোমণি তর্করত্নের নাম প্রায় শীর্ষদেশেই থাকে। শিরোমণি, হয়তো কেন, সত্যি সত্যিই শিক্ষা-দানের রীতি সম্বন্ধে অদ্ভুত যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু—কিন্তু শুধু যদি পঠন-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, পণ্ডিত মশায়ের সাগ্রহ কৌতূহল! শিরোমণি পাঠশালার হাটে ঘরের কথা জিজ্ঞেস করেন। কারণে অকারণে কথা বলেন গৃহস্থ কথায়। স্থাবর আর অস্থাবর সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের কথায়। কেমন যেন অস্বাভাবিক কৌতূহল। শিরোমণির কথায় কোথায় যেন লোভের আভাস।

লোভের আরেক নাম কাম।

আকাঙ্ক্ষা। পরদ্রব্যাভিলাষ। লিপ্সা। কৃষ্ণকিশোর নিজের চোখে দেখেছে শিরোমণির চোখে লোভাতুর কুটিল হাসি। মুখে যেন হিংসা। তার মনে পড়ে যায় কোথায় যেন শুনেছে কার কাছে। না, ঐ পণ্ডিত মশায়ের মুখেই শুনেছে। দেখেছে, সেই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করতে করতে পণ্ডিত মশায়ের মুখাকৃতিতে এসেছে অদ্ভুত পরিবর্তন। মনের আয়নায় হয়তো নিজের মুখখানাই দেখতে পেয়েছেন। শ্লোকটা হচ্ছে—'পরবিত্তাধিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে। অভিলাষো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥'

অর্থাৎ, অন্যের বিত্তের আধিক্য দেখিয়া যাহার হৃদয়ে লোভ ও অভিলাষ জন্মায় না, সে-ই দ্বিজশ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিকীর্ত্তিত হয়। কিন্তু শিরোমণি তর্করত্ন—

কিন্তু ঐ মেয়েটা কেন এমন আকাশপানে তাকিয়ে আছে? কেন দেখছে না রোজকার মত। কেন হাসছে না। কেন?

—এই দেখো কেনে, আবার বুঝি এক ফ্যাঁসাদ বাদিয়ে বসলো! দরজার বাইরে বসেছিল অনন্তরাম, ফটকে যেন কাকে দেখেই কথাগুলো স্বগত করলে। অনন্তরাম ব'সেছিল ছেলেকে জলখাবার খাইয়ে। ব'সে ব'সে পড়ছিল সেও। তেল-চিটচিটে কি একটা খাস্তা কাগজের পাতলা বই। বোধ হয় ঢপ-কীর্ত্তনের বটতলা সংস্করণ।. কিংবা হয়তো খেমটা-সঙ্গীতের বই।

—কে অনন্তদা? কে আবার ফ্যাঁসাদ করলে? ঘর থেকে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর। সে জানে অনন্তরাম শুধু শুধু কথা কইবে না।

অনন্তরাম।—কে আবার? তোমার পিসে আসছেন। টলছেন না এই যা রক্ষে। সঙ্গে আবার তেনার গুণধর ব্যাটা দু'টিও রয়েছেন দেখছি।

কৃষ্ণকিশোর ভয়ে ভয়ে বলে,—তুমি ব'সে থেকো না অনন্তদা। মাকে গিয়ে খবর দাও, শীগ্রি যাও।

পিসেমশাই। শিবচন্দ্র বাবু।

দিনমানে যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকেন ততক্ষণই তিনি মানুষ। এমন মানুষ যে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। মিষ্ট কথা, অমায়িক ব্যবহার, হাসি-ভরা মুখ—শিবচন্দ্র বাবুর নাকি শত্রু নেই এ দুনিয়ায়। শুধু টাকা দেখিয়ে নয়, মিষ্টি কথায় তিনি বশ করেছেন যে গেছে তাঁর কাছে। যে গেছে সে আর ফিরতে চায়নি।. ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সন্ধ্যা সাতটার পরে আর তাঁর কাছে কেউ যেতে চায় না। শিবচন্দ্র বাবুকে তখন কেউ কোথাও খুঁজে পাবে না। হদিস পাওয়া যাবে সেই শিমলের কাছাকাছি এক বাড়ীতে। শিবচন্দ্র বাবু তখন—

—পড়া হচ্ছে না কি? বাহা রে বাহা রে, কেমন হীরের টুকরো

ছেলে তোরা ছাখ্। পড়ার ঘরের দরজায় এসে শিবচন্দ্র হাজির হ্লেন। ভাঙ্গা গলায় বললেন কথাগুলি। তাঁর পেছনে তাঁর দুই ছেলে। জহর আর পান্না। তাদেরই দেখতে বললেন হীরের-টুকরোকে। তারা দেখতে দেখতে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

বই সরিয়ে সে উঠে এসে শিবচন্দ্রের গ্লেজড্-কীডের চক্চকে জুতোর ধূলো খানিকটা নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালে। শিবচন্দ্র হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন। বললেন,—থাক্ থাক্, হয়েছে হয়েছে। বৌঠান কোথায় বাবা?

—মা অন্দরে আছেন। আপনি চলুন না। জহর পান্না, যা না তোরা, মায়ের কাছে যা না।

কৃষ্ণকিশোর এই কথা ক'টা বলে অভ্যাসের রীতিতে। তাঁরা এলেই বলতে হয় এমন কথা। এতদিন পর্য্যন্ত এই একই ধারায় কথা বলে এসেছে। তবে তাঁদের নিজেদের মধ্যে যদি কোন রকম কিছু একটা অশান্তির গোপন ছায়া পড়ে থাকে, তাতে তার যে কি কর্ত্তব্য সে নির্দ্দেশ তখনও পর্য্যন্ত তো পাওয়া যায়নি কুমুদিনীর কাছ থেকে। এ অবস্থায় তিনি যা বলবেন সে তাই করবে। যেমন বলবেন তেমন।

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় ঢং-ঢং শব্দে অনেকগুলো বাজলো না? কত বেলা হ্ল? কলকাতা শহরে এই সময়টা আলো দেখে কিছুই আন্দাজ হয় না। ক'টা? ন'টা, দশটা, না এগারোটা? শিবচন্দ্র আগে আগে যান। পেছনে যায় তারা তিনজন। সে দেখে জহর আর পান্নার মুখ দু'টো গম্ভীর। পিসে যাতে শুনতে না পায় তাই কৃষ্ণকিশোর ফিস-ফিস ক'রে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে রে?

জহর আর পান্না প্রায় একসঙ্গে নিজেদের তর্জ্জনী মুখে তুলে যে ইঙ্গিত করলে তার অর্থ, চুপ করো। কি হয়েছে, এখন এখানে সে কথা বলা যায় না।

অন্দরের দরজা পেরিয়েই শিবচন্দ্র ভাঙ্গা গলায় ডাকলেন,—বৌঠান, বৌঠান কোথায় গেলে গো ?

কিছুই যেন হয়নি। কুমুদিনী হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালেন। বললেন,—কি হুকুম, বলুন।

শিবচন্দ্র প্রথমেই পায়ের জুতো খুলে সাষ্টাঙ্গে একটা প্রণাম করলেন কুমুদিনীর পায়ে। ভক্তিসহকারে।

কুমুদিনী পেছনে সরে যেতে যেতে বললেন,—ছি ছি, কি করেন বলুন তো! মনে হচ্ছে, খুব একটা দরকার পড়েছে। তা নইলে হঠাৎ এমন আসা হয় না তো!

শিবচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন,—আজকের প্রণাম বৌঠান অকারণে নয়। যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ বলছি।

পেছনে তারা তিনজন জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। কথা থামিয়ে হঠাৎ তাদের এক ধমক দিয়ে বললেন শিবচন্দ্রবাবু,—যা না তোরা, সদরে খেল্‌গে যা না দু'দণ্ড!

তারা তিনজন তখন যাত্রার নবাবের দ্বার-রক্ষকের মত হুকুম পেয়ে নীরবে চলে গেল সেখান থেকে। শিবচন্দ্রবাবু তখন বললেন,—বৌঠান, ভাই, জানো তো একটু কারণ-টারণ পান করি। সেই কারণেই কাল রাতের বেলায় এক অঘটন ঘটিয়ে ব'সে আছি। বুঝে নাও বৌঠান, কি হতে পারে। এখন সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আমার ঘরের লক্ষ্মীটিকে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

কুমুদিনীর মুখ সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টি স্থির। স্নেহের সুরে বলেন,—লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে আছে? আপনার লক্ষ্মী তো আর যাবে না। আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘরেই থাকবে। তাকে আমরা যেতে দেবো না।

শিবচন্দ্রবাবু যুক্তকরে বললেন,—মার্জ্জনা চেয়েছি বৌঠান। আবার পায়ে পড়বো? বল' তো—

হেসে ফেললেন কুমুদিনী। বললেন,—যেতে দিতে পারি দু'টি সর্ত্তে।

—কি? সে সর্ত্ত আমি নিশ্চয়ই পালন করবো। শিবচন্দ্রবাবুর কথায় তখনও দম্ভ। অব্যাহতি পাওয়ার দ্রুত সিদ্ধান্ত।—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পালন করবো।

কুমুদিনীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। বললেন,—কি ভাবে আপনি তাকে মেরেছেন বলুন তো! সে যে কি জিনিষ তা কি আপনি জানেন না? আপনি কত অনিয়ম করেন, সব সে সহ্য করে হাসি-মুখে।

—হ্যাঁ বৌঠান, তা তো আমি অস্বীকার করি না। তুমি এখন সর্ত্ত দু'টো বল' না। শিবচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পড়েন কথা বলতে বলতে।

—প্রথম সর্ত্ত হচ্ছে, আপনাকে কথা দিতে হবে আমার কাছে যে, কোন দিন আর আমার ঠাকুরঝির গায়ে হাত তুলবেন না। আর দ্বিতীয় সর্ত্ত হ'ল, হেমনলিনীর পায়ে ধ'রে আপনাকে বলতে হবে নিয়ে যাওয়ার কথা। কুমুদিনী কথার শেষে হাসলেন। দৃঢ়, কঠিন, শুষ্ক হাসি।

—সে আর এমন বেশী কথা কি? শিবচন্দ্র বললেন,—নিশ্চয়ই বৌঠান, নিশ্চয়ই। তুমি যা বলবে তাই করবো আমি। তুমি তো জানো, আমি কখনও কথার খেলাপ করি না। কোথায় সে? হেম কোথায়?

—আমার শ্বশুরের ঘরের মাটিতে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে সে। যান আপনি আগে যান। কি ক'রেছেন কি? প্রতিমার গায়ে পা তুলেছেন? এক্ষুণি গিয়ে তাকে—আর বললেন না কুমুদিনী। চলে গেলেন সেখান থেকে অন্যত্র। একেবারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে সেখান থেকে বললেন,—আর তাও, হেম তো এখন যেতে পারবে না। আমি যে তার খাওয়া-দাওয়ার

ব্যবস্থা ক'রেছি। আপনি আগে যান তার কাছে, গিয়ে—আর বলেন না কুমুদিনী।

শিবচন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে চলেন। শ্বশুরের ঘরে? হেমনলিনীর পিতার ঘর। কৃষ্ণকিশোরের কর্ত্তা-দাদুর ঘর।

জহর-পান্নাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে আসতেই দূরে ফটকের কাছে দেখলো মূর্ত্তিমানের আবির্ভাব! ভাবলো, ব্যাপার কি? পেয়ে বসলো নাকি? আসছে হন্ত-দন্ত হয়ে। ঝ'ড়ো-কাকের মতো চেহারা! নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। অরুণ। অরু। হঠাৎ এ সময়ে কেন? কলেজের সময়ে। খামখেয়ালীর আবার কি খেয়াল হ'ল কে জানে। জহর পান্না প্রায় একসঙ্গেই বললে,—কে রে কিশোর? সায়েব বুঝি?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হ্যাঁ। তবে বাঙলাও একটু-আধটু বলতে পারে।

—সে কি হে? সায়েব? আমরা তা হলে মামীর কাছে পালাই। জহর পান্না প্রায় একসঙ্গেই কথাগুলি বললে। সত্যিই তারা সেখানে আর না দাঁড়িয়ে অন্দরের দিকে পিছু হাঁটে। সাহেবের ভয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—মাকে যেন বলিসনি। সায়েবটা ভিক্ষে নিতে এসেছে। এক্ষুণি চলে যাবে আবার।

জহর বললে,—তা না হয় বলবো না। তুইও পালিয়ে আয় না। যদি কামড়ে দেয়?

সে হাসতে হাসতে বলে,—ব্যাচারী পয়সা নিয়েই চ'লে যাবে। আহা, খেতে পায় না।

পান্না বললে,—সাহেব? আমি ভাই নেই।

তারা সত্যি সত্যিই আর সেখানে থাকে না। মামীর আঁচলের তলায় গিয়েই লুকোয় হয়তো।

—কি অরুণ? এমন কলেজের টাইমে যে? সাগ্রহে বললে কৃষ্ণকিশোর।

একেবারে কাছাকাছি এসে অরুণেন্দ্র ধীর-গম্ভীর স্বরে বললে,—

I come not, friends, to steal away your hearts :

I am an orator, as Brutus is.

......I only speak right on.

কৃষ্ণকিশোর অবাক হয়। তার কথা শুনে। কি বলছে অরুণেন্দ্র! এমন গ্রীক ভাষায়? সে বললে,—আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

অরুণেন্দ্রর মূর্ত্তি কেমন আজ ছন্নছাড়া। মুখে যেন কেমন বিষণ্নতার কালো ছায়া। কথায় বুঝি অসংলগ্নতা। আবার অরুণেন্দ্র বললে,—If you have tears, prepare to shed them now. চোখে যদি জল থাকে অশ্রুপাতের জন্য প্রস্তুত হও।

বড় বিশ্রী লাগে তার এই হেঁয়ালীপনা। সে বললে,—কেন? কেন? কেন?

অরুণেন্দ্র আরেক দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,—আমার বোন বোধ হয় আর বাঁচবে না। খুব অসুখ লিলির। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে এসেছি তোমার কাছে সাহায্য চাইতে। She is lying unconscious. My beloved playmate Lilian is senseless now.

সাহায্য? ভিক্ষা?

কৃষ্ণকিশোর ভাবলো, তবে কি তার তামাসার কথা এমন প্রকটভাবে সত্যি হয়ে উঠলো। অরুণেন্দ্র বললে,—আমার বাবা, ঐ নর্ম্মান বিনয়েন্দ্র লোকটা একটা পাষণ্ড। লিলিয়ান is so ill, তাই বললাম, টাকা দাও—let me call for a doctor. তা বললে, আমার income fixed, আমার কাছে টাকা কৈ? তাই এসেছি তোমার কাছে। Kindly lend me

at least twenty rupees. বিশ রুপেয়া।

অসুখ। সেই ডালিম-রাঙা ঠোঁটে আজ কথা নেই! সে অজ্ঞান হয়ে আছে। অসুখ। ছায়া, লিলি, লিলিয়ানের অসুখ। কি অসুখ!

—কি হয়েছে? সে জিজ্ঞেস করে অবাক্ সুরে।

অরুণেন্দ্র বললে,—That I know not. তাই তো এসেছি তোমার কাছে। টাকা নিয়ে ডাক্তার দেখাবো। দেখে এসেছি—high, high fever. অনেক বেশী জ্বর। Body যেন তার পুড়ে যাচ্ছে।

জ্বর! সে বললে,—তুমি দাঁড়াও। আমি টাকা দিতে বলি।

কাছারী থেকে নায়েব মশাইকে কাছে ডেকে কাণে কাণে যা বলবার তাই বলে দেয় কৃষ্ণকিশোর। নায়েব মশাই একবার বলেন,—টাকাটা তবে কোন্ খাতায় খরচা ফেলবো?

সে বললে,—দাতব্য খাতে! আগে টাকাটা এনে দিন। বিশেষ জরুরী।

সবই তোমার। চাবিটি শুধু নায়েবের হাতে। নায়েব টাকাটা এনে দেন। অরুণের হাতে দিতে দিতে বলে কৃষ্ণকিশোর,—এ টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না। তুমি নিয়ে যাও।

অরুণেন্দ্র দুঃখ-কাতর হাসির সঙ্গে বললে,—তুমি একবার দেখতে যাবে না তাকে? My beloved Lilianকে?

—দেখতে যাবো! তা যাবো'খন। তুমি যখন বলছো নিশ্চয়ই যাবো। যাবো সেই বিকেলে। আমাদের বাড়ীতে আজ কয়েকজন আত্মীয় এসেছেন। কেমন? কৃষ্ণকিশোর কথা বলে যেন শুষ্ক কণ্ঠে। তার চোখে যেন দুশ্চিন্তার চাউনি। কথায় জড়তা।

অরুণেন্দ্র টাকাটা পকেটে পুরে দ্রুত-পায়ে চলে যায় ইংরেজীতে কি একটা ছড়া কাটতে কাটতে। বলতে থাকে—

O ! Judgement ! thou art fled to brutish beasts,
And men have lost their reason !

অরুণেন্দ্রর এই ক্ষোভ বিনয়েন্দ্রর বিরুদ্ধে। ডাক্তার ডাকতে লোকটা টাকা দেয় না। তাও তার নিজের মেয়ের জন্যে। বলে কিনা income fixed. চিকিৎসার অভাবে যদি লিলিয়ান—

একটা যেন ঝড় ব'য়ে গেল। চলে গেল অরুণেন্দ্র। কৃষ্ণকিশোর এক বিশ্রী মন নিয়ে ধীরে ধীরে চললো অন্দরের দিকে। সেখানে আবার কি কুরুক্ষেত্র হচ্ছে কে জানে। যেতে যেতে দেখা হ'ল পিসেমশায়ের সঙ্গে। শিবচন্দ্র বললেন,—ও বেলায় এসে তোমার পিসীমাকে, বাবা, নিয়ে যাবো। তোমার মা-ঠাকরুণ ছাড়লেন না এখন। আমি চললাম। আমার অনেক কাজ সারা দিনে।

পিসীমা থাকবেন ও-বেলা পর্য্যন্ত। অন্য দিন হলে কত যে সে আনন্দ করতো। কিন্তু আজ? আজ আর সে কিছু বললে না এ কথায়। গমনোদ্যত শিবচন্দ্রর গ্রেজড্-কীডের জুতোর ধূলো নিয়ে শুধু মাথায় ছোঁয়ালে। তার পর আবার চললো অন্দর পানে। তার চোখে তখন সেই ডালিম-রাঙা ঠোঁট আর রহস্যপূর্ণ সেই অদ্ভুত চোখ দু'টো ভাসছে। তারই অসুখ? কি হয়েছে কি!

কি হয়েছে, তা কি আর ভেবে বলা যায়! না দেখে? কি হয়েছে তা তো শুধু ডাক্তারেই বলতে পারে। কৃষ্ণকিশোর ভাবে,—কি বলবে ডাক্তার?

তা কেবল ডাক্তারই জানে। সে শুধু ভাবছে, বিকেল হবে কখন? ঘড়ি তো ঘোড়া নয়। ঘড়ি ঘড়ি। যেতে যেতে সে শুধু ভাবে, বিকেল হবে কখন? কখন বিকেল হবে!

ঘড়ি তো ঘোড়া নয়। ঘড়ি ঘড়ি। বিকেল যখন হবার তখন ঠিক হবে। প্রতীক্ষা-ব্যাকুল মুহূর্ত্তগুলো কি এত চট ক'রে শেষ হয়! বিনিদ্র রজনী?

—চৈত্র মাসের শেষ পক্ষ। বৎসরান্তের সময়।

কলকাতা শহর এ সময়টা গুল্‌জার হয়ে উঠে।

নীল ষষ্ঠী, শিবরাত্রি, চড়ক আর গাজনের উদ্যোগে শহরের ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে যায়। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। দিন নেই, রাত্তির নেই, উড়ো-খৈ-বাউণ্ডুলের দল হল্লা আর চিৎকারে যে-যার পাড়া মাতিয়ে তোলে। কোথাও চিৎপুরের হর, কারও মাঠে সিঙ্গির বাগানের প্যালা, কোথাও বা মেয়ে-পাঁচালী, আবার কোথাও কোথাও গেঁজেল কবিদের লড়াই শুরু হয়ে যায়। মদের দোকানের সদর রাস্তা যথা-সময়ে বন্ধ হলেও খিড়কির দরজা খোলা থাকে। ঢাক আর ঢোলের শব্দে এ-পাড়া সে-পাড়া মাতোয়ারা। রাস্তায় বেকার কুকুরগুলোর খেউ-খেউ রব যেন চাপা পড়ে যায়। মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোর-বাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগাছির গলি, আহিরীটোলার চৌমাথা ও বিশেষতঃ বাগবাজারের গাঁজার আড্ডাগুলো ক্রমে ক্রমে জমায়েৎ হয়। শহরেও বাসিন্দারা বুঝতে পারে যে একটা বছরের বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে। এসেছে শিবরাত্রি আর চড়কপূজোর দিন। গাজন আর নীল ষষ্ঠী।

ঢাকের বাদ্যি শুনে চড়্‌কীর পিঠ সড়্-সড়্ করে। কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুতের কাজে লেগে পড়ে। ছুতর, গয়লা, গন্ধবেনে ও কাঁসারীর দল সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় জরীর

টুপী, কোমরে চন্দ্রহার ও সিপাইপেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোচা ক'রে প'রে তারকেশ্বরের ছোপানো গামছা কাঁধে নিয়ে বিল্বপত্র-বাঁধা স্থতো গলায় জড়িয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ে। আনন্দের কারণ কি না বাবুদের বাড়ীতে গাজন!

অন্য দিকে ডুলে, বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরী স্থতো গলায় দিয়ে আপন আপন বীর-ব্রতের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে প্রত্যেক মদের দোকানে, পতিতালয়ে ও লোকের উঠোনে ঢাক ও ঢোলের সঙ্গতে নেচে বেড়ায়। গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেরা ঢাকীর পেছন-পেছন ছুটে বেড়ায়। ঢাকের চামর, পাখীর পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর ধ'রে টানাটানি করে।

বোকো-মাখানো রেশমী রুমাল গলায় জড়ানো বাবুরা মৌতাতের আশায় যে যার বাহন ও মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে যার যার আড্ডার দিকে পা বাড়ান। লোকলজ্জার ভয়ে কেউ বা তাঁর গাড়ীর জানলা ফেলতে নিষেধ করেন কোচম্যানকে। কেউ কেউ একেবারে কারও তোয়াক্কা না ক'রেই নিজের শত্রুপক্ষকে হাসাতে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়েছেন। বেল ফুলের মালার ভুরভুরে গন্ধে শহরের বাতাসও যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। বরফ আর জল-কচুরীর মূল্য বেড়ে গেছে। যত চাহিদা তত মূল্য।

ভেতরে যেতেই জহর আর পান্না প্রস্তাব করলে,—চল্ না, চড়কের মেলা দেখে আসি। মামীকে বল্ না।

কৃষ্ণকিশোর কি এক চিন্তায় তখন বিভোর হয়ে আছে। বললে,—এই দুপুরে মা কি যেতে দেবেন?

পান্না ঠোঁটের কোণে হাসি লুকিয়ে বললে,—চল্ না। কত মজা

দেখতে পাবি। কত রকমের কত কি। সঙ্, পুতুল-নাচ, ভোজবাজী, আরও কত কি!

জহর স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে,—বুলবুলির লড়াই, খেমটা নাচ, উলঙ্গ পরীর তাণ্ডব নৃত্য!

পান্না বললে,—আঃ দাদা, তুই চুপ কর্ তো। এ-সব এখানে বললে মামী ওকে আর যেতে দেবে?

জহর বললে,—কেন দেবে না শুনি? আমাদের বুঝি ঘরের ভেতরে বসে থাকতে হবে?

দুপুর। দ্বিপ্রহর। প্রখর সূর্য্যতাপ। প্রচণ্ড রোদ্দুর।

মানুষ তৃষায় কাতর। আকাশে চাতকের ডাক। মাটি উত্তপ্ত। জল চাই, জল। চৈত্রের দাবদাহে বাতাসেও যেন প্রবহমাণ অগ্নিকণা। তবুও উত্তাপের প্রখরতাকে উপেক্ষা ক'রেই পথে মানুষ চলে। উৎসবের কলকাতার পথে-ঘাটে কাতারে-কাতারে মানুষ। তিল ধারণের স্থান নেই কোথাও। চতুর্দ্দিক কোলাহলমুখর। চড়ক, শিবরাত্রি, গাজন! ঘন ঘন ঢাকের বাদ্যি।

এই বাজনা শুনেই মন উড়ু-উড়ু ক'রেছে জহর আর পান্নার। ভেতরে আর থাকতে চাইছে না তাই। যেতে চাইছে ফটকের বাইরে। ঐ জন-সমুদ্রের গড্ডলিকায়। ঐ স্রোতে ভাসতে।

যেখানে নিষেধ নেই সেখানে। যেখানে গেলে আর কেউ বাধা দেওয়ার থাকবে না, সেই উন্মুক্ত আনন্দের হাটে যেতে চায় জহর আর পান্না। আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা নয়। এই মুহূর্ত্তেই।

*

পিসীমা কুমুদিনীর চোখে জল দেখেছে সে। দেখেছে শরীরে তাঁর

আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন। অত্যাচার-ক্লিষ্ট মুখখানায় দেখেছে গভীর দুঃখের ছায়া। দেখেছে সরল-চিত্ত ঐ নিরুপায় পিসীমাকে। ক্রন্দনরত।

সে বললে,—বেশ তো যাবি'খন। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে যাওয়া যাবে।

অনন্তরাম কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। কৃষ্ণকিশোরের কথা শেষ হ'তেই বলে,—হ্যাঁ, আমিও সেই কথাটি বলতে এসেছি। তোমার মা বললেন যে, আহার প্রস্তুত। চল সব, খাবে চল। তার পর খেয়ে-দেয়ে যার যেথায় খুশী যাও।

কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পারে অনন্তরামের কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেন এত দৃঢ়। কৃষ্ণকিশোর জানে, কি তার পছন্দ আর কি অপছন্দ। কে পছন্দের আর কে নয়। অনন্তরাম সত্যিই মন থেকে চায় না যে, সে ঐ অপোগণ্ড দু'টোর সঙ্গে মিশুক। ঐ অকালপক্ক দু'টোর সঙ্গে—

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তোরা মায়ের কাছে যা। আমি স্নান সেরে এখুনি আসছি।

অনন্তরামের কথার ধরণ দেখে জহর আর পান্না নির্ব্বাক হয়। রান্না-বাড়ীর দিকে এগোয়।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—অনন্তদা, ভারীকে বল, জল দেবে স্নানের ঘরে।

অনন্তরাম বললে,—তা না হয় বলছি। কিন্তুক যাওয়াটা কোথায় হবে শুনি একবার?

সে হেসে ফেললো। বললে,—চড়কের মেলা দেখতে।

—আর কিছু নয়? অনন্তরাম বললে।—সে আমি তোমাকে নে যাবো সঙ্গে ক'রে। ওরা যেখানে ইচ্ছে যাক্। বুঝলে?

সে আবার হেসে ফেলে। বলে,—এত বয়স হ'ল, তবুও তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হবে?

অনন্তরাম হাসতে হাসতে বললে,—হ্যাঁ। বয়েসটা তোর কত হ'ল শুনি একবার ?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—এই বৈশাখে সতেরো শেষ হবে। সাবালক হতে আর ক'মাস। জানো অনন্তদা ?

—জানি না আর, খুব জানি। তাহলে তো দেখছি তোর দু'টো পাখনা গজাবে ! অনন্তরাম কথার শেষে হাসে। ক্ষীণ হাসি। সাবালকত্ব-প্রাপ্তির এদিক-ওদিক দুদিক মনে পড়ে যায় অনন্তরামের। সুদিক আর কুদিক। ভাল আর মন্দ দিক। তাই হাসি তার ক্ষীণ। খানিক বা ভয়ার্ত্ত বলা যেতে পারে।

বাবুদের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে অনন্তরাম দেখতে পেয়েছে অনেক কিছু। এ বাড়ীর আনাচে-কানাচে যারা এসেছে, একে একে তাদের দেখেই সকলের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে নেমেছে সে। দার্শনিক বিচারের সিদ্ধান্ত। ও-বাড়ীর যদু সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেবদের কথায় পরিচালিত হতে গিয়ে মাত্র কয়েক বছরে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি ফুঁকে দিয়েছে। সে-বাড়ীর মধু পিতার মৃত্যুর পরেই ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে দু'-হাতে টাকা উড়িয়ে চোখের সামনে ফতুর হয়ে গেল এই সেদিন। মধুর মাসতুতো ভাই শ্যামও বাদ সাধেনি। শ্যাম নাকি কাগজের টাকার ফানুষ তৈরী করিয়ে আকাশে উড়িয়েছিল দেওয়ালীর দিনে। শেষে একটা লক্ষ্ণৌওয়ালীর রূপে দিশাহারা হয়ে সে পাল্লা দিতে চায় এক ঝানু শেঠজীর সঙ্গে। শেঠজীই শেষ পর্য্যন্ত লাভবান হয়। শ্যাম সব খুইয়ে ব'সে থাকে—পূর্ব্বপুরুষের একখানা জামিয়ার তার সম্বল হয়।

সুতরাং এই শেয়ালটিও যে তাদের ডাকে সাড়া দেবে না, তার কি কোন স্থিরতা আছে ? কৃষ্ণকিশোরও যে একদিন এমনটি হবে না, তা কেউ

কি বলতে পারে? মানুষের মন যখন, তখন এত প্রলোভনের মাঝে থেকে সেও কি পারবে আত্মরক্ষা করতে কোন চরম পরিণামের হাত থেকে? পারে যদি, সে তো অনেক মঙ্গলের কথা।

—কি ভাবছো কি, এমন চোখ কপালে তুলে?—বললে কৃষ্ণকিশোর।

সত্যিই আকাশে চোখ রেখে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চেয়েছিল অনন্তরাম। ভাবছিল ঐ সব চোখে-দেখা নন্দদুলালদের কথা। সবই ঐ এক ধারার। কাঁচা টাকার খেলা খেলতে গিয়ে কাঁচা ঘুঁটিদের অকালে পেকে যাওয়ার ইতিবৃত্ত। আজকের নবাব আর কালকের ফকিরদের গুপ্তকথা।

—ভাবছি না কিছু। ভাবছি যে, তুই তো সাবালোক হবি। সেই কথাই ভাবছি আর কি! অনন্তরাম কথা বলে কেমন আস্তে আস্তে। বিষণ্নতার সুরে।

ম্যানেজার বাবুর কথা মনে পড়ে যায়। কৃষ্ণকান্তর বাজনার ঘর খুলতে হবে, তাই ডাকতে এসেছিলেন তিনি। বাজনা তুলে রাখতে হবে। যথাস্থানে। বহু মূল্যবান সামগ্রী আছে ঐ ঘরে, তাই গিয়ে একবার দাঁড়াতে ডেকেছিলেন। কৃষ্ণকিশোর বললে,—অনন্তদা, ম্যানেজার বাবুকে বল' ঘর খুলতে। আমি আসছি।

বিরক্ত হয় অনন্তরাম। বলে,—এখন আবার কোন্ ঘর খোলবার তাড়া পড়লো।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—কাকাবাবুর বাজনার ঘর। কি কি বাজনা বেরিয়েছিল, সেইগুলো তুলে রাখতে হবে।

অনন্তরাম বললে,—অ। ছোটবাবুর বাজনার ঘর—। কথা বলতে বলতে থেমে যায় সে। হয়তো অনেক কথা মনে পড়ে যায়। কৃষ্ণকান্তর কথা, আর ঐ বাজনার ঘরের কথা। অনন্তরাম সদরের দিকে এগোয়।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল, এও আরেক হেঁয়ালী নয় তো।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র যে সমাচার তার কানে পৌছে দিয়ে গেল, তা হয়তো আদপেই সত্যি নয়। মন-গড়া কথা। খেয়ালীর প্রলাপোক্তি। অরুণের বিকৃত মস্তিষ্কের বিকাশ। তাই এ ঘটনাকে মিথ্যা মনে হয় তার। মনে মনে একেক বার বিব্রত হলেও, বড় বেশী রেখাপাত করে না এই দুঃসংবাদ। সত্যি যদি হয়, তাতেই বা তার কি এসে যায়। কে তারা? কি সম্পর্ক তাদের সঙ্গে? দু'দিনের সামান্য পরিচয়ে কি প্রয়োজন ঘনিষ্ঠতার। তাও যদি বা নিজেদের সমাজের মানুষ হ'ত। তারা যে ধরণের মানুষ, তাদের কোন সমাজ নেই। তাই নেই কোন সামাজিকতার চক্ষুলজ্জা। কৃষ্ণকান্তর বাজনার ঘর—

অনন্তরামের বেশ মনে আছে, ছোটকর্ত্তা বলতেন,—এটা ঘর নয়, এ আমার মন্দির। সুরের মন্ত্রে পূজা করতে হয় এই মন্দিরে। তেমন তেমন পূজা হলে দেবতাকে লাভ করা যায়। যন্ত্র বাজিয়ে মেঘ ডাকিয়ে বর্ষণ পর্য্যন্ত হয়। বিষধর সর্পকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়। এ আমার যন্ত্র-মন্দির।

সেই বাজনার ঘর খোলা হবে। অনন্তরামের ইচ্ছা হয় একবার গিয়ে দেখে সেই ঘর। দেখে, কে কি অবস্থায় আছে। অনেক দিন যাওয়া হয় না সে-ঘরে। গেলে যে মনটা কেমন আইঢাই করে! ছোটকর্ত্তাকে মনে পড়ে যায়। মাটির মানুষ ছিলেন; পরম ত্যাগী পুরুষ। তাঁদের সংসার ভেঙ্গে যাবে তাই বিয়ে পর্য্যন্ত করেননি। চিরকুমার অবস্থায় চলে গেছেন। দু'টো সংসার হতে দেননি আর।

বিয়ের নাকি কথা উঠেছিল কৃষ্ণকান্তর।

কুমুদিনী তুলেছিলেন কথাটা। সম্বন্ধ পর্য্যন্ত স্থির ক'রে ফেলেছিলেন। খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজবাড়ীর কোন-এক ডাকসাইটে রূপসী—এক

মোমের পুতুলের সঙ্গে। কথাটা যখন কৃষ্ণকান্তর কানে পৌঁছলো তিনি তখন কাকেও কিছু না ব'লে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। 'সংসার পাতবে তোমরা, আমি সংসার ত্যাগ করব'—এই ছিল নাকি তাঁর বক্তব্য।

সেই সংসার শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে হল কৃষ্ণকান্তকে। পিতার তুল্য দাদার বুকে শেল বিঁধিয়ে চ'লে গেলেন। কৃষ্ণচরণের যা অবস্থা হ'ল তা নাকি কেউ চোখে দেখতে পারেনি। তিনি প্রায় উন্মাদের মত হয়ে গেলেন। শ্রাদ্ধের কাজকর্ম্ম চুকে যাওয়ার পরে তিনি বুঝতে পারলেন, ভাই নাকি তাঁর কোথাও যায়নি। কোথায় গেছে, এখুনি ফিরে আসবে। এই এলো বুঝি।

কৃষ্ণচরণ মুখে অন্ন তুলতেন না।

আহারের সময় হ'লে দেখতেন—"দু'টো আসন আছে, না নেই?" না থাকলে, আসনেই বসবেন না। আহারে ব'সে নীরবে চেয়ে থাকেন দরজার দিকে চোখ রেখে। যেন প্রতীক্ষা করেন।

কুমুদিনী মিনতি করতেন,—আপনি খেতে শুরু করুন। সে এসে ঠিক খাবে। আমি তাকে খাওয়াবো নিজে ব'সে থেকে।

কৃষ্ণচরণ সহজ সুরে বলতেন,—তুমি তো জানো কুমু, আমি কখনও একলা খেতে বসিনি। সে আসুক, এলে আমাকে ডাকবে।

কথা বলতে বলতে আসন থেকে উঠে পড়তেন কৃষ্ণচরণ। অনাহারে দুর্ব্বল শরীর কাঁপতো ঠক-ঠক ক'রে। লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে একেবারে ফটকের কাছে চলে যেতেন। সেখান থেকে গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করতেন ভাইয়ের নাম ধ'রে। অনেক ডেকে সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতেন। এসে আর বিছানায় যাওয়ার অবসর হ'ত না, কাছারীর সামনেই ঐ শ্বেতপাথরের মেঝেয় শুয়ে পড়তেন। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য সম্বিৎও হারিয়ে ফেলতেন।

তখন আমলা আর লোক-জনেরা নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে পড়তো যে যেখানে। তাদের চোখ ফেটে জল আসতো। অথচ কারও এক পা এগোবার সাধ্য নেই যে, এসে খানিক সান্ত্বনা দেবে। এসে ধরবে তাঁকে।

কুমুদিনীও অন্দরের একটা জানলায় পাষাণের মত দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিছু করতে পারতেন না। শুধু অশ্রুপাত করতেন।

অনন্তরাম মাঝ-পথে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিল একটা থাম ধ'রে। কৃষ্ণকিশোর পেছন থেকে বলে এবার,—অনন্তদা, তোমার কি হ'ল বল' তো?

চমকে উঠলো যেন অনন্তরাম। আবার চলতে শুরু করলো। বললে,—হবে আর কি! ভাবছি তুই তো এ্যাদ্দিনে সাবালোক হচ্ছিস। তাই ভাবছি আর কি!

—তাতে এত ভাবনার কি আছে? কৃষ্ণকিশোর শুধোয়।

অনন্তরাম তার দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা মনে করে। বলে,—না, ভাবনার তেমন আর কি আছে! তবুও একটা তো পরিবর্ত্তন হবে তোর। তুই তখন কি আর এমনটি থাকবি? বদলে যাবি কত।

অনন্তরামের কথার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে না সে। বলে,—সে আবার কি? বদলে যাবো কেন?

হেসে ফেললো অনন্তরাম। বললে,—সবাই যে বদলায় রে! তোরও ভোল বদলে যাবে। তুইও কি আর বাকী থাকবি?

সে তবুও বোঝে না, কি বলতে চায় অনন্তরাম। কিসের অদল-বদল? বলে,—আচ্ছা সে দেখা যাবে'খন। তুমি ম্যানেজার বাবুকে ডাকো দেখি। ঘর খুলতে বল'।

ম্যানেজার বাবু এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তিনি সেই তখন থেকে

চাবির তাড়া হাতে নিয়ে বাজনার ঘরের দরজায় খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নাকি একসঙ্গে দু'টো কাজে হাত দেন না। হাতের কাজ শেষ না হলে অন্য কাজের কথা চিন্তাও করেন না। যেটি ধরবেন সেটিকে আগে শেষ করবেন, তারপর অন্য কথা।

কৃষ্ণকিশোর তাঁকে প্রতীক্ষা করতে ব'লেছিল। সেই তখন থেকে তিনি প্রতীক্ষাই করছেন। ওদের আসতে দেখে দরজার চাবি খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে স'রে দাঁড়ালেন এক পাশে। অনন্তরামকে বললেন,—অনন্ত, মাঝের হল্-ঘরে বাজনা তিনটে রয়েছে। তাঁবেদারদের বল', বয়ে নিয়ে আসবে একটি একটি।

যন্ত্র-মন্দির অন্ধকার। তমসার গহ্বর যেন একটা।

অন্ধকার? ঘরের চারি দিকের জানলা বন্ধ রয়েছে যে। ন'মাসে-ছ'মাসেও খোলা হয় না। আর এ বাড়ীতে এখন কে এমন ওস্তাদ আছে যে ঐ ঘরে ব'সে আসর জমাবে রাতের পর রাত? কে বুঝবে ঐ যান্ত্রিক মর্ম্মকথা? তাই আর এ-ঘরে কোন ব্যক্তির গমনাগমন নেই।

—একটা জানলা খুলুন ম্যানেজার বাবু! কিছু দেখতে পাচ্ছি না। —কৃষ্ণকিশোর দেখবার জন্যেই বলে কথাটা। কাকার মৃত্যুর পরে সেই কবে কোন্ কালে একবার না দু'বার এ-ঘরের ভেতরে এসেছিল। কি আছে মনে নেই। কেবল মনে আছে শুধু বাজনা। শুধু ঝন-ঝন আর শুধু টুং-টাং।

ম্যানেজার বাবু সন্তর্পণে এগিয়ে একটা জানলা খুলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ এক ঝলক আলো এসে খানিকটা অন্ধকার লুপ্ত করলো। ঘরে এখনও আট জোড়া জানলা আছে। প্রকাণ্ড ঘর।

বাজনা দেখেই যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। লিলিয়ানের বাজনা। সেই যে কোন্ এক ভেতরের ঘর থেকে ভেসে এসেছিল সেই বাজনার সুর—পিয়ানো না অর্গানের, কে জানে। হয়তো বা ভায়োলীন বাজিয়েছিল

লিলিয়ান। কিন্তু অরুণেন্দ্র যদি সত্যিই মিথ্যা না ব'লে সত্যি ব'লে থাকে! যদি উন্মাদের প্রলাপ আর মাতালের মাতলামি না হয়ে হয় বাস্তব সত্য!

—আর দু'টো জানলা খুলতে আজ্ঞা করেন? ম্যানেজার বাবু আরও তমসা ভেদ করবার প্রয়াস পান।

—না, আর দরকার নেই। আপনি দেখুন কে আনতে গেলো। হাত থেকে পড়ে যেন ভেঙ্গে চুরমার না হয়ে যায়!

কৃষ্ণকিশোর কথাগুলো বলে কি যেন ভাবতে-ভাবতে। যে জন্যে জানলা খোলায়, সে কথা আর মনে থাকে না। দেখতে এসে আর দেখার কথা মনে থাকে না। অনেক দিন দেখেনি তাই দেখতে চেয়েছিল। ম্যানেজার বাবু বলেন,—হ্যাঁ, আমি দেখি। বলেন আর বেরিয়ে যান ঘর থেকে। যেন এতক্ষণ যাওয়াই তাঁর উচিত ছিল, এমন একটা ভাব দেখান।

কি দেখবে কি?

দেখে চিনতে পারলে তবে তো। কোন্‌টা যে কি, সে কি তা জানে নাকি! জানে কার কি ব্যবহার? শুধু জানে বাজনা, বাজাতে হয়। এ যেন ভরা-যুবতীর অশেষ বিরহ। বাজিয়ে নেই, বাজনা কি হবে। বাঁশী বাঁশুরিয়ার হাতের—শ্রীকৃষ্ণের হাতেই বাঁশরী!

কি দেখবে কি!

ঐ তো পিনাক। তার পাশে আলাপিনী। তার পর মহতী বীণা। তত-যন্ত্রের সর্ব্ব পুরাতন ও সর্ব্বপ্রধান ঐ বীণা। মহর্ষি নারদ সর্ব্বদা ব্যবহার করতেন। মহতীর অপর নাম তাই নারদী-বীণা। তার পর রয়েছে একটা সুর-বাহার। তার পরে রুদ্রবীণা, ত্রিতন্ত্রী, আনন্দ-লহরী, আরও কত কি।

কি দেখতে চায় সে? ঐ সারি সারি বসানো ঐ মূক যন্ত্র দেখে কি জানবে সে? পারবে তাদের মুখে কথা ফোটাতে? তাদের বুকের ভাষা? ওপাশে মৃদঙ্গ, ঢোলক। তবলা কয়েক জোড়া। জোড়ঘাই। একটা অনেক দিনের পুরানো ডমরু। ডম্বরু—ডুগডুগি—দেবাদিদেব মহাদেবের বাদন-যন্ত্র। তার পরে—

—একটু পাশ দেবেন দয়া ক'রে। ম্যানেজার বাবু পেছনে এসে বলেন। তাঁর পেছনে আরও তিনজন। তাদের হাতে বাজনা।

কৃষ্ণকিশোর যেন চম্‌কে ওঠে কথা শুনে। অরুণেন্দ্রর কথা যদি সত্যি হয় তা হলে কি হবে, সেই চিন্তাই তাকে এখন অস্থির করছে। একেক বার মনে হয়, যদি সত্যি হয় তাতেই বা কি? তবুও—তবুও কোথায় যেন একটা কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনতে পায় সে। লিলিয়ানের সেই চোখ দু'টোর গোপন ইশারায় কি সাড়া দিতে চায় তার মন! দেখতে চায় লিলিয়ানকে? শুনতে চায় তার মৃদু কণ্ঠের কথা। কিন্তু দিন ফুরিয়ে বৈকালের আগমন না হ'লে—

ম্যানেজার বাবু যন্ত্রগুলি সাজিয়ে রাখেন যেখানে যার জায়গা। অন্ধকারে ফস্‌ফরাসের মত জাজ্বল্যমান কি ঐগুলো! শিশির-জলে সূর্য্যালোকের মত এমন চিক-চিক করছে! মূর্ত্তি—নারীমূর্ত্তি—ঢাকাই রূপোর চারটি প্রতিমূর্ত্তি—হস্তিনী, শঙ্খিনী, চিত্রিণী আর পদ্মিনী। আপন আপন ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চার দেওয়ালের মধ্যিখানে।

অনন্তরাম ঘরের ভেতরে আসে না আর।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। এ-ঘর যার হেফাজতে ছেড়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত, সেই রঞ্জনকে মনে পড়ে। সকলের অসাক্ষাতে রঞ্জনের সঙ্গে চলতো তার মনের কথার আদান-প্রদান। তারা দুজনে ছিল

পরস্পরের বন্ধু, এ-বাড়ীর নিম্নস্তরের বেতনভুক্দের দলের নেতা। ঐ রঞ্জন একদিন এ-বাড়ীতে অশান্তি বাধিয়েছিল নিজের ভুলে। কৃষ্ণকান্তর চরিত্রে দোষ দিয়েছিল। বড় কর্ত্তার কান ভাঙাতে চেয়েছিল ছোট কর্ত্তার বিরুদ্ধে।

কৃষ্ণকান্ত প্রতিদিন ভোরে উঠে বাড়ীর বাইরে যেতেন। শহর তখনও থাকতো সুপ্তিমগ্ন। পূবের আকাশে সূর্য্যোদয়ের লালিমা ফুটে উঠতো আর কৃষ্ণকান্ত গরদের জোড় প'রে বেরিয়ে যেতেন বাড়ী থেকে। একা যেতেন। কা'কেও সঙ্গে নিতেন না।

রঞ্জন বড় কর্ত্তার কানে কথাটা তুলে দিয়েছিল। বলেছিল,—ছোটবাবু বোধ করি রাতে বাড়ীতে থাকছেন না।

—সে কি রে! কৃষ্ণচরণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয় কথাটা শুনে। হতচেতনের মত হয়ে পড়েন। ভাবেন, বিবাহ না ক'রে এই আত্মতৃপ্তির কি প্রয়োজন? বহুভোগের লালসা? কৃষ্ণচরণ বলেন,—সে কি রে! কি বলছিস তুই?

লুকোচুরির দরকার নেই।

অনুজকে ডেকে সরাসরি ব'লেছিলেন,—তোমাকে বিবাহ করতে বলা হ'ল, তা করলে না। তুমি কি আমাদের বংশের সুনাম বিনষ্ট করবে?

কৃষ্ণকান্ত আকাশ থেকে পড়েন। বলেন,—আমি তোমার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলাম না। কি বলতে চাও তুমি?

কৃষ্ণচরণ বলতে লজ্জা বোধ করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে বলেন, —তুমি রাতের বেলায় কোথায় যাচ্ছো নাকি বাড়ী থেকে বেরিয়ে? কোন বারনারীর কাছে?

হেসে ফেলেছিলেন কৃষ্ণকান্ত অগ্রজের বক্তব্যে। হাসতে হাসতে বলেছিলেন,—তোমার সময় হবে এখন?

কৃষ্ণচরণ বলেন,—হ্যাঁ, কেন হবে না।

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—তা হ'লে তোমার গাড়ীতে ঘোড়া জুততে বল'। তুমি চল' আমার সঙ্গে।

কৃষ্ণচরণ ভেবে-চিন্তে বলেন,—কোথায় যেতে হবে?

কৃষ্ণকান্ত ক্ষুব্ধ মনে বলেন,—কেন, আমি যেখানে যাই।

কৃষ্ণচরণ রুষ্ট চিত্তে বলেন,—সেই বারনারীর গৃহে আমাকে নিয়ে যেতে চাও! কেন?

আবার হেসে ফেলেন কৃষ্ণকান্ত। এবারে একেবারে অট্টহাসি। হাসতে হাসতে বলেন,—চল' না, গেলেই দেখতে পাবে সেই বারনারীকে।

কৃষ্ণকান্তর কথামত জুড়ীতে উঠে দুজনে যাত্রা করেন তৎক্ষণাৎ। কোচম্যান আবদুলকে প্রথমেই তাঁর গন্তব্যের নির্দ্দেশ দিয়ে দেন কৃষ্ণকান্ত। গাড়ী এসে দাঁড়ায় বরানগর চিৎপুরের চিত্রেশ্বরীর মন্দিরের সমুখে।

গাড়ী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণকান্ত চিত্রেশ্বরীর পুরোহিতের শরণাপন্ন হন। তাঁকে বলেন,—মশায়, একবার আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনি বলুন তো। আমি ভোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেবীর পূজা করতে আসি। তিনি অনুমান ক'রেছেন, আমি বারনারীর গৃহে যাওয়া-আসা করি।

পুরোহিত কৃষ্ণকান্তকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। দূর থেকে দেখেই ছুটে এসেছেন। কথাটি শুনে জিব কেটে তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। বলেন,—এ কি অসম্ভব উক্তি! চলুন চলুন, আমি গিয়ে তাঁকে বলছি। ছি, ছি, ছি!

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—দাদা-ভাই, আমি লোক-দেখানো ধর্ম্ম করতে চাই না। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে আসি।

কৃষ্ণচরণ আদ্যোপান্ত শুনে কোন দ্বিরুক্তি করেন না। শুধু বলেন,—আচ্ছা, তুমি গাড়ীতে ওঠ'। এই আবদুল, গাড়ী হাঁকাও।

দেবী চিত্রেশ্বরী হয়তো সকলের অগোচরে হাসে!

দুই ভাই হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরে যান।

বাড়ীতে পা দিয়েই বড়কর্ত্তা হুকুম করেন,—শালা শূয়ার-কা-বাচ্ছাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে আন তো যেমন অবস্থায় আছে!

আমলা আর ভৃত্যের দল ঠকঠকিয়ে কাঁপতে শুরু করে। কার প্রতি এই হুকুম! এই রোষ-উক্তি?

দুজন পাইক হাতের বর্শা রেখে আদেশ পালন করতে এগিয়ে আসে। বলে,—কে হুজুর? হুকুম করুন, তার গর্দ্দান আপনার পায়ে এনে দেবো।

কৃষ্ণচরণ ক্রোধে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে বলেন,—ঐ হারামীর বাচ্ছাকে! ঐ মিথ্যেবাদীটাকে! ঐ শালা রঞ্জনকে। শূয়োরের বাচ্ছাকে এই মুহূর্ত্তে হাজির করবি এখানে।

কৃষ্ণকান্ত এতক্ষণে বুঝতে পারেন সংবাদদাতার নাম। বিস্মিত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। বলেন,—দাদা, তুমি মাথা-খারাপ ক'র না। ওকে আমি জবাব দিয়ে দিচ্ছি এখনই।

—জবাব দিবি! গর্জ্জন ক'রে ওঠেন কৃষ্ণচরণ।—এই যে ছাখ না কি করতে হয়!

খর্ব্বকায় রঞ্জন বলির পাঁটার মত ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়ায় কাছারীর সমুখের প্রাঙ্গণে। কৃষ্ণচরণ ক্রোধান্ধ হয়ে তার পেছনে গিয়ে একটা পদাঘাত করেন সজোরে। লাথি মারেন। রঞ্জন চার হাত শূন্যে উঠে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে যায়। জানুতে তার আঘাত লাগে। তারপর থেকে রঞ্জন চলতো খুঁড়িয়ে। চিরদিনের মত একটা অঙ্গ তার আহত হয়ে থাকে। মিথ্যাকথা বলার শাস্তিস্বরূপ।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে থাকে।

সূর্য্য ঠিক আকাশের মাঝখানে। ঘড়ি-ঘরে ঢঙ ক'রে বাজলো একটা। ঘরে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকেই একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে আসছিল, ম্যানেজার বাবু বললেন,—তা হলে আজ্ঞা করেন তো কুলুপ এঁটে দিই।

সে বললে,—হ্যাঁ। জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিন।

ম্যানেজার বাবু বলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। নিশ্চয়ই বন্ধ ক'রে দেবো।

কৃষ্ণকিশোর চলে যাচ্ছে, ম্যানেজার আবার বলেন,—আর একটি নিবেদন ছিল। বলছিলাম কি, খেয়ে-দেয়ে একবার আদালতে যেতে হবে। ফিরতে সেই পাঁচটা বেজে যাবে আপনার। দলিল-পত্র দেখা-দেখিতেই—

কৃষ্ণকিশোর বলে,—কেন বলুন তো?

ম্যানেজার বাবু কুলুপে চাবি দিতে দিতে বলেন,—হুগলীতে হুজুরের কিছু জমি-জায়গা আছে, হুজুর বোধ হয় জানেন না। কতকগুলো মুসলমান প্রজা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। কোন রকমে একটা মকদ্দমা একবার যদি খাড়া করতে পারি তো তাদের আমি ভিটে ছাড়াবার ব্যবস্থা ক'রে তবে ছাড়বো। এখানকার আদালতে এখন বলছে যে, মামলা কলকাতা থেকে হুগলীর আদালতে তুলে নিয়ে যেতে হবে। সেই কারণে আপনার দলিল-পত্র দেখতে চেয়েছে। আর তা ছাড়া এ মামলা লড়বে আপনার ব্রিটিশ গভরমেণ্ট। ম্যানেজার বাবুর মুখে হাসির রেখা মারে। বলেন,—আপনার বকলমের এষ্টেট যারা দেখা-শুনা করছে।

মামলা কেন? কেন কোর্ট-ঘর? রফা হয় না কোন মতে। একটা এমন কোন চুক্তি করা যায় না, যাতে আর আদালতে ছোটাছুটি করতে

হয় না। কৃষ্ণকিশোর এত কথার উত্তরে বলে না কোন কথাই। শুধু বলে,—তা যাবেন তাতে আর কি।

ভেতর থেকে মায়ের আহ্বান আসে।

জহর আর পান্না আসনে ব'সে প'ড়েছে নাকি। আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা ক'রতে পারছে না। এসো তো এসো, নয় তো তারা পাতে হাত দেবে বলছে। কথাগুলো বিনোদা এসে বলে,—সদরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। বাণের মত যেন কথাগুলো কানে গিয়ে বর্ষায়। কৃষ্ণকিশোরের মনে হয় বিনোদার মুখখানা যেন রামায়ণের ছবির সীতার পাহারা-রত সেই চেড়ীগুলোর চেয়ে একটুও পৃথক্ নয়।

অনন্তরাম এ বাক্যবাণের প্রত্যুত্তর দেয়। বলে,—বল্‌গে যা খেয়ে-দেয়ে যে-যার ঘরে ফিরে যাক্। খেতে কে মানা ক'রেছে কে? ইস্—

বিনোদা ফিক ক'রে একবার হাসে। হাসির রেশ টেনে বলে,—তুই মুখ্‌পোড়া কথা কচ্ছিস্ কেন! তুই থাম্ না। আমি তোকে ব'লেছি?

কৃষ্ণকিশোরের পেছনে দাঁড়িয়ে অনন্তরামও সে-হাসির বিনিময় দেয়। অনন্তরামও একটু হাসে। প্রেমের দেবতা মদনও বোধ করি সকলের অলক্ষ্যে একটু হাসেন তার পোড়া কপালের জন্যে, আর গোপন প্রেমের এমন পাত্র-পাত্রীর মিলন দেখতে পেয়ে।

বিনোদা হাসির জের টেনে ঘুরে চলে যায় অন্দরে। অনন্তরাম পেছন ফিরে-ফিরে তাকায় আর দেখে ঐ গজেন্দ্রগামিনীকে। ঐ বিনোদাকে নিয়েই একটা দুর্দ্দান্ত রকমের কলহ-বিবাদ হয়ে যায় অনন্তরামের সঙ্গে রঞ্জনের। তখন কৃষ্ণকান্ত জীবিত ছিলেন। সে আরেক কাহিনী। সে পুরানো কথার আর প্রয়োজন নেই এখানে।

স্নানাগার থেকে গিয়ে দেখলো জহর আর পান্না কখন উঠে পড়েছে। তারা তখন পান মুখে পুরছে। পান আর দোক্তা। কৃষ্ণকিশোরকে দেখেই জহর এগিয়ে এসে বললে,—মামীকে বললুম তোর যাওয়ার কথা। আপত্তি করলেন। বললেন, পিসীমা এসেছেন, আজ আর ও কোথাও যাবে না। তা যাও তোমার পিসীর আদর খাওগে যাও এখন ভাল ছেলেটির মত। আমাদের কি, আমরা কেমন মজা ক'রে মেলা দেখে আসবো!

তাই যা।

মুখে আর কথাটা বলতে পারে না সে। মনে মনে বলে। সেই বিশ্রী দুঃসংবাদটা শোনা পর্য্যন্ত মেজাজ কেমন যেন তার বিগড়ে আছে। সেই অসুখের সংবাদ শুনে। সেই শান্ত সরল মেয়েটা, যার বড় দু'টো চোখ আর ডালিম রঙের ঠোঁট—সেই মেয়েটার অসুখ! না, তা হয়তো নয়। ঐ অরুণেন্দ্র হয়তো টাকার প্রয়োজনে ব'লেছে এতগুলো কথা—যার মূলে কোন ভিত্তি নেই। আহা, তাই যেন হয়!

জহর আর পান্না চলে যায় পান চিবোতে-চিবোতে।

খেতে ব'সে মুখে যেন ভাত ওঠে না।

পিসীমার শরীরে ক্ষতচিহ্ন দেখে আর কি কারণে যেন ইচ্ছা হয় না রোজকার মত ব'সে ব'সে তারিয়ে খেতে। আহার্য্য নেড়ে-চেড়ে উঠে পড়ে হঠাৎ। কুমুদিনী আহা আহা ক'রে ওঠেন। বলেন,—সে কি, উঠে পড়লে? খেলে না কিছু?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—খেয়েছি, আর পারছি না।

কুমুদিনী ছেলের মুখ দেখেই বুঝতে পারেন কি একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নেমেছে যেন। কিছু বলেন না।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—পিসীমা কোথায় মা?

কুমুদিনী বলেন,—যাও না তুমি, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো না। বল' মা ডাকছেন। কর্ত্তা-দাদুর ঘরে তিনি আছেন। আমি তাঁর খাবার দিতে বলি।

শুয়ে শুয়ে একখণ্ড 'বঙ্গদর্শন' পড়ছিলেন পিসীমা। কৃষ্ণকিশোর গিয়ে ডাকতেই হেমনলিনী হাসতে হাসতে নেমে আসেন। এই কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি যেন ভুলে গেছেন তাঁর সকল ব্যথা। গত রাত্রির কোন কথাই আর যেন মনে নেই তাঁর। স্বামীর মত্ততা আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মনে-মনে তিনি যা স্থির ক'রেছিলেন, তার সব কিছুর ওলট-পালট হয়ে গেল। হেমনলিনী ভেবেছিলেন, পিত্রালয় থেকে আর ফিরবেন না। বৌঠানের সেবা-দাসী হয়ে প'ড়ে থাকবেন এখানে। লোকে নানা কথা বলবে? তা বলুক। কিন্তু শিবচন্দ্র এসে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে যে-ভাবে কাকুতি-মিনতি ক'রে গেলেন, তাতে তাঁর সকল কষ্টের লাঘব হয়ে গেছে। স্বামী পায়ে হাত দিয়েছেন, তাতে তাঁর নিজেকে প্রথমে পাপের ভাগী মনে হয়েছিল। মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে-ছিলেন,—ক্ষমা করো। তার পরেই মনে পড়েছিল স্বামীর পায়ে তিনি তো দাসখৎ লেখেননি, শিবচন্দ্রই প্রথম মিলনের দিনে তাঁর পায়ে আলতা দিয়ে লিখেছিলেন আমাদের সেই চিরাচরিত প্রথার দাসত্ব-স্বীকারের বাঙলা মন্ত্র। নাম সই করেছিলেন! স্ত্রী তো আর দাসী নয়, দেব-দেবীর সমতুল্য।

হেমনলিনী খেতে বসেন হাসতে হাসতে। কুমুদিনী সমুখে এসে পাখা হাতে বসেন। মাছি তাড়ান। ননদিনীর মুখে খুশীর আভাস দেখে তিনিও যেন খানিক আশ্বস্ত হন এতক্ষণে। তাঁর মুখেও হাসির রেখা দেখা দেয়।

কিন্তু অরুণেন্দ্রর কথা যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়!

কৃষ্ণকিশোর বিব্রত বোধ করে। অন্দর থেকে সদরের দিকে এগোয় একটা মিঠে পান মুখে দিয়ে। টম্ কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসে। কোথা থেকে দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসে। তার পায়ে-পায়ে চলে।

তৈলাক্ত অনন্তরাম! দৈনিক দু' পলা তেল অনন্তরাম অঙ্গে মাখে। বুকে তেল ডলতে-ডলতে অনন্তরাম বললে,—খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, এখন একটু বিশ্রাম কর'গে যাও। সেই বিকেল নাগাদ আমার সঙ্গে যাবে চড়কের মেলা দেখতে।

কৃষ্ণকিশোর হাসতে হাসতে বললে,—মেলা দেখবো না। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যেয়ো।

কৃষ্ণকিশোর হাসে, কিন্তু হাসি কৃত্রিম। নকল হাসি। বৈঠকখানায় গিয়ে ঝুলন্ত ঝাড়গুলোকে দুলিয়ে দিয়ে ফরাসে এলিয়ে পড়লো সে অবলীলায়। হরেক রঙের আভা ফুটিয়ে তুলতে লাগলো আলো। ঠুং-ঠাং শব্দের তরঙ্গ উঠলো ঘরে। টম্ তক্তাপোষের তলায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

ওরা কারা! কে অরুণেন্দ্র? না লিলিয়ান?

কারা ওরা যে, সে এমন ব্যস্ত হবে একজনের শারীরিক অসুস্থতায়। দরজার খসখসগুলো ফেলে দিয়ে যায় একটা তাঁবেদার। জল ছিটিয়ে দিয়ে যায়। স্নিগ্ধ শীতল হয় ঘরটা। চোখে যেন ঘুমের জড়তা নামে। ইতি-উতি ভাবতে ভাবতে কখন হয়তো তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই সকাল থেকে চ'লেছে একটা চাপা অশান্তির আলোড়ন। ক্লান্তিতে ঘুম আসে চোখে। কৃষ্ণকিশোর ঘুমিয়ে পড়ে কখন।

খাওয়া-দাওয়া ক'রে, খসখস ফাঁক ক'রে অনন্তরাম একবার দেখে

যায়। কি করছে তাই দেখে। ঘুমন্ত দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার অন্দরের দিকে চলে। অন্দর এখন ফাঁকা। বৌঠান আর পিসীমা ওপরের ঘরে ব'সে ব'সে মনের কথা কন। সুখদুঃখের কথা। বিনোদা এখন কোথায়?

সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

ক্রমে ক্রমে দিন শেষ হয়। সূর্য্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়ে। ঘড়ি-ঘরে এক ঘণ্টার অন্তরে যথারীতি বেজে যায় দু'টো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। পাঁচটা বেজে যাওয়ারও অনেক পরে হঠাৎ যেন ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলতেই মনে হয় কৃষ্ণকিশোরের, এ কি রাত ফুরিয়ে যে ভোর হয়ে গেছে!

বিভ্রান্তি। রাত ফুরিয়ে ভোর নয়, দিন ফুরিয়ে প্রায় রাত্রি। এমন ভুল অসম্ভব নয়। দিবানিদ্রার শেষে ঘুম ভাঙলে অনেকেরই এমন ভুল হয়। এ একটা স্বাভাবিক বিভ্রম।

ঘুম থেকে উঠেই অনন্তরামকে দেখে কৃষ্ণকিশোর বলে,—আবদুলকে বল' গাড়ী বের করবে। আমি বেড়াতে যাবো।

—বেশ তো। তুই প্রস্তুত হয়ে নে। অনন্তরাম খুশী মনেই বলে।

—আমি প্রস্তুত। কৃষ্ণকিশোর বলে,—তুমি মাকে ব'লে এসো, আমি বেড়াতে যাচ্ছি।

মা শুনে বলেন,—ওমনি পিসীমাকে তাঁর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে বল'। তিনি তৈরী হয়ে আছেন।

পিসীমাকে তাঁর বাড়ীতে নামিয়ে কোচম্যান জিজ্ঞেস করে তার গন্তব্য। কৃষ্ণকিশোর শেষ পর্য্যন্ত বলে,—সেই রিপন ষ্ট্রীটে চল'।

কোচবক্সে অনন্তরাম। সে শুধোয়,—সত্যিই তা হলে মেলা দেখবি না?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—না, দেখবো না। অনন্তদা, জোরে হাঁকাতে বল আবদুলকে।

পথের লোকজনকে থতমত খাইয়ে জুড়ী ঘাড় বেঁকিয়ে দৌড়য়। আবদুলের এক হাতে রাশ, অন্য হাতে ঘুরন্ত চাবুক। আর পায়ে বাজায় ঘন-ঘন ঘণ্টা। ঢং, ঢং, ঢং শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে তোলে যেন।

রিপন ষ্ট্রীটে গাড়ী পৌঁছতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। নর্ম্মান লজের ফটকে গাড়ী ভিড়তেই কৃষ্ণকিশোর দেখতে পায় গাড়ী-বারান্দার নীচে কালো-পোষাক-পরা অনেক লোক। কালো রঙের এক রকমের পোষাক সকলের। নত মস্তকে সকলে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। শোকের ছায়া নেমেছে নর্ম্মান লজে। তাই যে ঐ শোকের পোষাক! কৃষ্ণকিশোর অবাক হয়ে দেখে।

গাড়ী থেকে নেমে গাড়ী-বারান্দার কাছাকাছি যেতেই দেখতে পায়, কয়েক জন কালো পোষাকের লোক। তাঁদের কাঁধে একটা লম্বা কালো বাক্স। কালো কাপড়ের আবরণে ঢাকা। তাঁরা ধরাধরি ক'রে বাইরে নিয়ে আসছেন। তাঁদের পেছনে আসছে ঐ তো অরুণেন্দ্র। ঠিক যাযাবরের মত তার আকৃতি। অশ্রু-সজল চোখ। শোকের আবেগে ফর্সা মুখখানা যেন তার লাল হয়ে উঠেছে।

কি হয়েছে কি?

বন্ধুকে দেখেই এগিয়ে আসে অরুণেন্দ্র। কম্পিত কণ্ঠে বলে,—Lilian is gone, ঠিক দু'টোর সময়। Just at two, she has left us in grief and sorrow.

স্তব্ধ-বিস্ময়ে অরুণেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করে,—কি হয়েছিল কি?

অরুণেন্দ্র বলে,—Malaria. Dangerous type of Malaria.

ম্যালেরিয়া! সামান্য মশা যে রোগ বহন করে—বাঙলার বৈশিষ্ট্য সেই

ম্যালেরিয়া। প্রতিদিন কত লোক এই অসুখে মৃত্যুবরণ করছে বাঙলা দেশে। যে অসুখের বাহক ঐ মশককুল?

শবদেহ ফটকের বাইরে চলে যায় দেখতে দেখতে। বিনয়েন্দ্র মুখে পাইপ ধরিয়ে অনুসরণ করেন নত-মস্তকে। তাঁর মত কঠিন প্রকৃতির মানুষের চোখেও জলের ধারা দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কোন কথা বলে না। শুধু শোকার্ত্ত স্তব্ধতা।

অরুণেন্দ্র বললে,—তুমি কি করবে! তুমি বাড়ী ফিরে যাও। একবার Lilianএর sense ফিরে এসেছিল। তোমার কথা বলেছিলাম। সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজেছিল ঘরের ভেতর। তোমাকেই—

কৃষ্ণকিশোর তাকিয়ে থাকে অবাক-বিস্ময়ে। যেন ঝড় বইছে তার চোখের সামনে। ঝড়, ঝঞ্ঝা আর ঘূর্ণিবাত্যা। অরুণেন্দ্র বললে,—তুমি যাও, বাড়ী যাও। আমাকে যেতে হবে সঙ্গে। কথা বলতে বলতে এগোতে শুরু করে ধীরপদে। সেও এগোয় তার পেছন পেছন। অরুণেন্দ্র যেতে যেতে বলে কি একটা ছড়া, যার একবর্ণ অর্থ সে বুঝলো না। অরুণেন্দ্র বলে,—

> There is no Death! What seems so is transition.
> This life of mortal breath
> Is but a suburb of the life elysian,
> Whose portal we call Death.

বলতে বলতে ফটকের বাইরে যায় অরুণেন্দ্র। দেখে শবদেহ চ'লে গেছে অনেক দূরে। অরুণেন্দ্র ছুটতে শুরু করে। সে শুধু অবাক চোখে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে, রাত্রি নেমেছে। আর পাৎলা অন্ধকারে ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে ঐ কালো পোষাকের মানুষগুলি—আর লিলিয়ানের কফিনটা। চার্চ্চের ঘড়িতে তখন মৃদু-মন্দ ধ্বনি শুরু হয়েছে। অবিরাম

বেজে চলেছে ঘড়ি, জলতরঙ্গের শব্দে। মূঢ়ের মত কৃষ্ণকিশোর চেয়ে থাকে শুধু। শব-যাত্রা এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

রিপন ষ্ট্রীটের তু'পাশে গাছের সারি। গাছের ছায়ায় যেন ঘুমিয়ে আছে যত বাড়ী আর এই রাস্তা। দেবদারু, ঝাউ আর অশ্বত্থের পঙ্‌ক্তিতে রিপন ষ্ট্রীটের আঁকা-বাঁকা পথ এখন ঘন অন্ধকার। রাত্রির প্রাক্কালে গাছে-গাছে বাসায়-ফেরা পাখীর কূজন শুরু হয়েছে। কাক আর চড়াই। শালিখ আর বুলবুলি। কারও কারও ঘরের চুল্লীতে আগুন প'ড়েছে। চিমনী বেয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশের কোলে। গাছের চূড়ায়। কেউ বা আবার ঘরে লণ্ঠন জ্বেলেছে। রেড়ীর তেলের লণ্ঠন। খোলা জানলা থেকে দেখা যাচ্ছে কম্পমান আলোর শিখা।

রিপন ষ্ট্রীটের মানুষ কি আজ স্তব্ধ হয়ে থাকবে!

এ তল্লাটের নেটিভদের সব চেয়ে যে-মেয়েটা ভাল ছিল সেই আজ কি না সকলকে ছেড়ে চ'লে গেল এই মাত্র! চ'লে গেল শোকের তুফান তুলে? প্রতিবেশীদের কেউ কেউ ফটকের বাইরে বেরিয়ে প'ড়েছে। দেখছে, শবযাত্রা দেখছে। এক দল কালো পোষাকের শোকার্ত্ত মানুষ। নত মাথায় এগিয়ে চলেছে। আর তারা বহন ক'রে নিয়ে চ'লেছে সেই মেয়েটিকে। ঘুমন্ত লিলিয়ানকে?

আর চার্চ্চের ঘড়িটা তখনও পাখীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবিশ্রান্ত বেজে চ'লেছে। কি বিশ্রী শুনতে লাগে আজ ঐ যান্ত্রিক আওয়াজ। কিন্তু ঘড়ি তো আর কারও হাত-ধরা নয়। কারও সুখ-তুঃখের অপেক্ষায় থাকবে না। অন্য সময় ঐ শব্দ-ঝঙ্কার কত মানুষের মনে খুশীর উল্লাস জাগিয়ে তোলে, কত শিশুর কানে সুরের মূর্চ্ছনা। স্তব্ধতার তাল কেটে দিচ্ছে যেন। বিশ্রী লাগছে শুনতে।

দেখতে দেখতে কৃষ্ণতায় ঢেকে গেল দিগ্বিদিক্। রাত্রির প্রথম পদক্ষেপে অন্ধকারের অদৃশ্য কল্লোল। রাত্রি, সেও তার পক্ষ বিস্তার করবে। ধীরে ধীরে, মৃদুমন্দ ছন্দে নামবে রাত। আলো গতিশীল, দুরন্ত তার বেগ। অন্ধকারের গতি কৈ ?

লিলিয়ানের কফিন বহুক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গেছে পথের বাঁকে।

এই পল্লীর ছায়া, মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। কিন্তু অন্ধকারে এত অপেল পাথর কোথা থেকে এলো! শিশির-বিন্দুর মত টুপ-টুপ যেন ঝ'রে পড়ছে এখান-সেখান থেকে। পাখীরা কি এখন ডাক থামিয়ে কান্না শুরু ক'রেছে! নর্মান লজের গাড়ী-বারান্দায় মাধবীর ঝাড়ে কুঁড়ি ফুটছে। হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে ফুটে উঠছে মাধবীর স্তবক। অপেল, না ঐ গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল!

কিন্তু মাটিতে, রাস্তায়, গাছে আর অন্যের বাড়ীর কিনারায় কি এত মাধবীর ছড়াছড়ি! কোথা থেকে ঝ'রে পড়েছে টুপ-টুপ। স্বর্গ থেকে? দেবশিশুরা পাখা মেলে উড়ে এসেছে স্বর্গ থেকে। মুঠো-মুঠো অপেল লিলিয়ানের যাওয়ার পথে ছড়িয়ে দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছে হাসতে হাসতে। অপেলের আসমানী চিকণে কত রঙের ঝিলিক! না না, মণি-মাণিক্যের ছটা নয়, চোখের জলের ফোঁটা। গাছের পাখী আর ঐ দেবশিশুরা কি কাঁদতে শুরু করলো?

কারও অশ্রুকণাও নয়।

ঐ ফুটন্ত মাধবীর স্তবক দেখে মনে পড়ছে লিলিয়ানের সেই মালা। কানের দুল আর কণ্ঠের মালা!

হঠাৎ কথা শুনে চমকে উঠেছিল কৃষ্ণকিশোর। নর্মান লজের ভেতর থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে কে একজন অতর্কিতে একটা হাত তার ধরেছে!

তাকে দেখেই চম্‌কে উঠেছে। এ কি বীভৎস নারীমূর্ত্তি! কে? কি চায়? মেরুদণ্ডহীন শরীর, মুখের দাঁতগুলো নেই। মাথায় পক রুক্ষ কেশ। কি এক জ্বালায় ক্লিষ্ট শরীর তার থরো-থরো কম্পমান। অঙ্গের শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়ছে। হাত ধরতে ফিরে তাকাতেই বৃদ্ধা বললে,—আইয়ে, ভিতরমে আইয়ে!

বুড়ীর চোখ দু'টোতে জল টলমল করছে! কিন্তু কে এ? কি চায়? আজকে দুপুরে ঠিক বেলা দু'টোর সময় এই বাড়ীর যে মেয়েটি পরলোক যাত্রা ক'রেছে, তারই প্রেতমূর্ত্তি নয়তো! রাশি রাশি বিক্ষিপ্ত অপেল পাথর দেখতে দেখতে এ কি দেখলো সে! কে তার সমুখে এখনও সশরীরে দাঁড়িয়ে এমন কাঁপছে। এখনও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে না। এখনও, এখনও!

কোচবাক্স থেকে এতক্ষণ সব কিছু লক্ষ্য ক'রেছে অনন্তরাম। এতক্ষণ শুধু চুপচাপ দেখেছে—দেখেছে বাড়ীতে পৌছতে না পৌছতেই কার একটা মৃতদেহ কারা কাঁধে ব'য়ে নিয়ে গেল—দেখেছে সেই উড়ো-খৈ ফিরিঙ্গি ছেলেটাকে। এতক্ষণ শুধু দেখেছে। বুড়ী হাত ধরতেই গাড়ীর মাথা থেকে হেই-হেই করতে করতে নেমে এসেছে। কৃষ্ণকিশোরের কাছাকাছি গিয়ে ব'লেছে,—এ সব ঝামেলায় আসা কেন? কোথাকার কে মরেছে, তাদের সব ছোঁয়াছুঁয়ি করলে তো!

বুড়ীর কান নেই অনন্তরামের কথায়। সে তখন হাত ধ'রে দস্তুরমত টানছে। বলছে,—আইয়ে না, ভিতরমে আইয়ে। শোকের একটা অস্ফুট শব্দ যেন বুড়ীর কথায়। একেক বার দু'হাতে কপাল চাপড়ায় আর বিড়-বিড় করে বুড়ী। চোখ দু'টোতে তার জল টলমল করে।

কে? ডাকিনী, যোগিনী, প্রেতিনী!

না। একজন বয়োবৃদ্ধা। বার্দ্ধক্যে পৌছে এই চরম আঘাতে অসহ্য

হয়ে উঠেছে সে। যেন ঠিক উন্মাদিনী। প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল অশরীরী কোন আত্মা এই অদ্ভুত রূপে বুঝি দেখা দিয়েছে। কিন্তু আত্মা কি কাঁদে? কাঁদে যে মানুষ। বুড়ী মানুষ, তাই আর থাকতে পারছে না। কি করছে নিজের খেয়াল নেই। ধনুকের মত অবয়ব তার কাঁপছে।

অনন্তরাম কাছে আসতেই আর কোন ভয় থাকে না। অনন্তরাম বুড়ীকে জিজ্ঞেস করে,—তুমি কে? কি চাই?

তার ব্যস্ততা ক্ষণেকের জন্য ক'মে যায় হয়তো। বুড়ী কেমন স্থির হয়ে যায় যেন। অচঞ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ফটকের দিকে। ময়লা শাড়ীর লুটন্ত আঁচলটা খুঁজতে খুঁজতে বলে,—আমি। আমি আয়া আছি। বুড়ী কথার মাঝে থামে। কি যেন ভাবে। বলে,—ঐ যে, কত আদমী নিয়ে গেল। ঐ লিলিকে আমি—

কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে গেল ছুটতে ছুটতে। বোধ হয় মনে পড়তেই ছুটে দেখতে গেল শবযাত্রা কত দূরে। কোথায়, লিলি এখন কোথায়। একেই চোখে দৃষ্টি নেই, দূরের বস্তু নজরে পড়ে না। তবুও সে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে—যেদিকে ওরা ঐ লিলিকে নিয়ে চললো।

কোন্ দিকে গেল লিলিয়ান। কোথায় গেল?

আয়ার কথা শুনে তার মনেও প্রশ্ন জাগে—সত্যিই, গেল কোথায়? কৃষ্ণকিশোর অনন্তরামের দিকে তাকায়। কিচ্ছু দেখতে পায় না। অনন্তরামের রঙের সঙ্গে আর কোন পার্থক্য থাকে না অন্ধকারের। এক জোড়া পেঁচা কোন্ গাছে পালা ক'রে ডাকতে শুরু ক'রলো। অন্ধকারের আমেজ পেয়ে পাখা ঝাপ্‌টে গাছ থেকে উড়লো আকাশে। রিপন ষ্ট্রীটের আঁকা-বাঁকা পথে অন্ধকার কেঁপে উঠলো তাদের ডাকে।

এই কয়েক মুহূর্ত্ত আগে থেমে গেছে চার্চ্চের ঘড়ি। এখন শুধু অন্ধকার থম-থম করছে। আর একটা এলেমেলো হাওয়া বইছে থেকে-থেকে। পথের ঝরা পাতা খড় খড় উড়ছে তখন।

বুড়ী ফটক থেকে হতাশ হয়ে ফিরে অনন্তরামের হাতটা ধরলো। কাঁপা গলায় বললে,—ভিতরমে আইয়ে। লিলি ভিতরমে হায়।

সে কি! বুড়ী বলছে কি!

অনন্তরাম হেসে ফেললো, তার কথার ধরণ-করণ শুনে। দুঃখের অকপট হাসি। বললে,—চল্ তো কিশোর। দেখাই যাক্ না কি ব্যাপার। ছুঁয়ে যখন ফেলেছিস—

অনেক দূরে পেঁচা দু'টো আরও কয়েক বার ডাকলো। কর্কশ সুরে।

পায়ের তলায় কি? হঠাৎ চম্‌কে উঠলো কৃষ্ণকিশোর। বালিয়াড়ী পাথর আর নুড়ি। ফটক থেকে গাড়ী-বারান্দার নীচে পর্য্যন্ত কাঁকর আর পাথর। পায়ের তলায় নুড়ি পাথরের মর্ম্মর। অপেল কোথায় এখানে?

বৃদ্ধা এখনও অনাহারে রয়েছে।

গত কাল লিলি যখন থেকে আর কিছু মুখে দিলে না, একেবারে ঘুমিয়ে পড়লো, সেই তখন থেকে সেও খেতে ভুলে গেছে। ভুল ক'রে ক'বার জলের কলসীর ঢাকা খুলে ফেলেছিল আজকে। শেষ পর্য্যন্ত নাকি খায়নি এক ফোঁটাও জল। কিন্তু কিছু যে দেখা যাচ্ছে না। এমন কি পাশের মানুষকে। কাকেও কেউ দেখতে পায় না। অনন্তরাম বললে,—চল' কোথায় যেতে হবে।

বৃদ্ধা তখন দরজার মুখে। বলছে,—আইয়ে জী।

ওরা দুজনেই চম্‌কে উঠলো। কখন চলে গেল এখান থেকে! ওরা দরজার কাছে যেতেই বৃদ্ধা চুপিচুপি বললে,—বাতি লিয়ে আসি।

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। অনন্তরাম ফিস-ফিস করলে,—তোমার যত বেলেল্লা কাণ্ড!

কৃষ্ণকিশোরের মুখে কথা নেই। হতচেতনের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

আলো নিয়ে আসে বৃদ্ধা। হাতে এক জ্বলন্ত লণ্ঠন। ধোঁয়ার কালো আবরণে কাচগুলো অকেজো। আলো আছে কি নেই। কালি প'ড়েছে চিমনীতে। সারা রাত ধিকি-ধিকি জলেছে যে। পলে পলে পুড়েছে ঐ লণ্ঠনের শিখা। কাল রাতভোর জ্বলেছে কোথায় কোন ঘরে। লিলিয়ানের জ্বর যখন নাকি প্রায় সাড়ে পাঁচ ডিগ্রী। জ্বরের ঘোরে দু'-একটা কথা ব'লেছে। কি বলেছে কেউ বুঝতে পারেনি।

ঐ লণ্ঠনের দীপ্তি পথ দেখায় অন্ধকারে। আয়া আগে-আগে যায়। ওরা তার পেছনে। যেন এক গুহার ভেতরে চ'লেছে। অন্ধকার গুহা।

যেন ঠিক জেলখানা! হবে নাই-বা কেন? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাড়ী। তাদের মনের মত তৈরী। হলের মত ঘর আর বিরাট বিরাট দরজা। কালের পরিবর্ত্তনে কোম্পানীর হাত থেকে বেরিয়ে যায় নীলামের ডাকে। হাতফের হয়। কোম্পানীর হাত থেকে যায় এক এষ্টেটের হাতে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর খাস-দখলে। ইংরেজের পিঠে-ভাগের পুরস্কারে পাওয়া। স্বর্ণময়ী দাতব্যের টাকার প্রয়োজনে নাকি হাতছাড়া করেন। চৌরঙ্গীর এক সায়েব রাতারাতি কিনে ফেলেছিল। নর্ম্মান বিনয়েন্দ্রর বাবা কিছু বেশী দিয়ে সেই সায়েবের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন।

একটা ঘরের দরজায় পৌছে আয়া হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো। ঘরের ভেতরে অন্ধকার নয়; আলো জলছে। দেওয়ালের বাতিদানে দু'টো বাতি

জলছে। আর কারা ওরা বসে আছে না? কেমন যেন শোকের প্রতিমূর্ত্তি চুপচাপ ব'সে আছে রাতের ভীরু পাখীর মত। বাতির আলোর চাঞ্চল্যে তাদের চোখের তারা চিক-চিক করছে। আয়াকে আর ওদের তুজনকে দেখে তারা শুধু দেখলো গ্রীবা বেঁকিয়ে মাত্র। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো ঘরের ঐ শূন্য শয্যায়। যেখানে এখন কেউ নেই, শুধু শয্যা।

আয়া গলা কাঁপিয়ে বললে,—এই লিলির ঘর আছে। মেয়ে ক'টা লিলির বেথুনের বন্ধু। পড়ার বন্ধু।

পাড়ার বন্ধু নয়, পড়ার বন্ধু। সতীর্থ। চার জন, শোকে মুহ্যমান হয়ে ব'সে আছে। তাদের মক্ষীরাণী যে উড়ে গেছে কোন্ আকাশে!

আয়া ঘরের ভেতরে যায়। যারা ব'সে আছে তাদের একজনকে দেখিয়ে বলে,—এর নাম ইসাবেলা স্যামুয়েল।

নামের অধিকারিণী চোখ তুলে তাকালেন মাত্র। আর কিছু নয়।

আয়া বললে,—ওর নাম আছে এমিল নিকোলাস।

যাঁর নাম তিনি ক্ষণেকের জন্যে একবার স্পন্দিত হয়ে উঠলেন যেন। পাষাণের মূর্ত্তির যেন ঘুম ভাঙলো।

আয়া বললে,—আর ওর নাম লেনা, লেনা ঘোষ। লিলির সই।

বাতি আর লণ্ঠনের আলোতে দেখা যায় আয়ার ঘর্ম্মাক্ত কপালে উল্কীর নক্সা। তু'টো উড়ন্ত টিয়া পাখী।

লেনা ঘোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার বক্ষোদেশ কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। লেনা দেখছিল লিলিয়ানের পিয়ানোটা। ঘরের ভেতরে আছে এক পাশে। যেন এই শোকের সমব্যথীর একজন—মূক, তাই প্রকাশ নেই।

আয়া হাতের লণ্ঠন মাটিতে নামিয়ে বললে,—আর ও, ওই মেয়েটাকে

লিলি নিজে সাজিয়ে দিতো। কোন জঙ্গলের কোন এক রাজপুত্তুরের সঙ্গে সাদি দিতো। ওর নাম বেলা ডিভাইন।

বেলার চোখ দু'টো সত্যিই ফুলে উঠেছে। প্রচুর কেঁদেছে সে। এখনও হয়তো কাঁদছে। বেলাই মৃত্যু-সংবাদ প্রথম পেয়ে ফুলের রাশি নিয়ে চ'লে এসেছে। রাশি-রাশি হলদে গোলাপ। তাজা, টাটকা। এসেছে এমিলি আর ইসাবেলা। লেনা সেই ভোরে এসে আর ফিরতে পারেনি। যদিও সে থেকেও তার সইকে ফেরাতে পারেনি। ঠিক দু'টোর সময় দেহ ত্যাগ ক'রেছে লিলিয়ান। নর্ম্মান অরুণেন্দ্র তখন তার শিয়রে দাঁড়িয়ে যীশুর বাণী শোনাবে, না সেই শেষ মুহূর্ত্তে সে আবৃত্তি ক'রেছে কি এক ইংরেজী কবিতার পঙক্তি। তার তখন মনে প'ড়েছে কবি শেলীর দু'টি পঙক্তি।

How wonderful is death !

Death and his brother sleep.

চৈত্র-দিনের দিক্‌হারা বাতাসে জলন্ত বাতির শিখা দু'টো টলতে শুরু করলো। বাইরের অন্ধকারে সোঁ-সোঁ শব্দ উঠল হঠাৎ। গাছ-গাছড়া দুলছে বাইরে, ঢ'লে পড়ছে যেন। ঘর্ষণের শণ-শণ ধ্বনি ভেসে আসছে। কোথায় কোন দূরের গাছে আবার ডাকছে পেঁচা! তীক্ষ্ণ কর্কশ ডাক কালপেঁচার। আর ডাকছে ঝিঁ-ঝি; অবিরাম, অবিশ্রান্ত। রাতের পশুপাখী আর কীট-পতঙ্গ বিবরের বাইরে বেরিয়েছে। যখন অন্যান্য সকল জীব নিদ্রায় অচেতন থাকবে, তখন জাগবে তারা। গভীর তমসায় যখন দৃষ্টি হারাবে কেউ, তখন তাদের চোখে ফিরে আসবে সজাগতা।

লিলিয়ানের সতীর্থদের পরিচয় দেওয়া শেষ হ'তেই আয়া দেখায় একটা আয়না। বেলজিয়াম কাচের একটা ওভ্যাল আয়না। আয়া সেই আয়নার

তলদেশের ব্রাকেট থেকে খামচা মেরে তুলে নেয় কি কতকগুলো। দু'হাতে সমুখে মেলে ধরে। বলে,—লিলির গয়না।

এক ঝলক আলো ঠিকরোয় যেন। সেই আসমানী চিকণ। সেই অপেলের মালা আর দুল। লিলির সাধের সঙ্গী—সদাক্ষণ প'রে থাকতো। কৃষ্ণকিশোরের চোখ দু'টো ঝলসে উঠলো যেন। আয়া সেগুলোকে রেখে দিল ব্রাকেটে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কি সব বললো বিড়-বিড় ক'রে। চোখ দু'টোকে মুছে নিল শাড়ীর আঁচলে। ঘরের চতুর্দ্দিকে দেখলো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আর কি আছে দ্রষ্টব্য! লিলি আর এমন কি ফেলে রেখে গেছে এ ঘরে। আয়ার চোখ প'ড়েছে এতক্ষণে। যেন তড়িৎ-গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। সঙ্গে-সঙ্গে উঠলো ঝঙ্কার! বেতালা, বেসুরো। আয়া আর কোন কথা বলে না। একটা কালো আবলুস কাঠের পিয়ানোর বুক জড়িয়ে মাথা এলিয়ে দেয় সেখানে। মাথা আর তোলে না। ঐ বেসুরো ঝঙ্কারের রেশ কাটতেই শুনতে পাওয়া যায় গুমরানি। আয়া কাঁদছে শিশুর মত!

সতীর্থদের নিষ্পলক চোখ এবার ফিরলো ঐদিকে। ঐ পিয়ানোতে। তাদের কেউ কেউ ক্ষণেকের জন্য একবার ফুঁপিয়ে উঠলো যেন। যন্ত্র মূক, তাই, নয় তো তার বুকেও হয়তো শোকের উদ্বেগ শোনা যেতো। সেও যেন অসহায়ের মত এক পাশে এই শোকের অংশ গ্রহণ করতে চায়।

অনন্তরাম বললে ফিসফিসিয়ে,—মরেছেটা কে? কার জিনিস দেখাচ্ছে বুড়ি?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—অরুণের বোন। ছায়া, লিলি, লিলিয়ান।

অনন্তরামের বুকের ভেতর থেকে কথাগুলো শোনা যায় যেন। সে বলে,—আহা। দেখেছিস, বুড়ীর লেগেছে দেখছিস! হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছে যে, লাগবে না?

বাড়ীতে কি আর মানুষ নেই এই ক'জন ছাড়া।

আর কোন ঘরে আলো জ্বলছে না। শুধু এই ঘরের দেওয়ালের বাতি-দানে ঐ জ্বলন্ত বাতির শিখা। আর কে থাকবে কে? লিলিকে বাদ দিলে থাকে ঐ নর্ম্মান অরুণেন্দ্র আর তার বাবা। তাঁরা গেছেন লিলির পিছু-পিছু। আর আছে এই আয়া। বার্দ্ধক্যে তার শরীর অক্ষম। নয় তো সেও যেতে চেয়েছিল অধীর আগ্রহে। লিলিয়ানের যে সব আত্মীয় তাকে নিয়ে যেতে এসেছিল তারাই নিষেধ করলো, নয় তো আয়া আর একা থাকতে চায়নি। সে বায়না ধরেছিল,—আমাকেও লিলির সঙ্গে মাটিতে পুঁতে দাও। আমি থাকবো লিলির কাছে।

অনন্তরাম বললে,—চল্, এবার ফেরা যাক্। রাত অনেক হ'ল। তোর মা আবার ভাববেন।

কৃষ্ণকিশোর আরেক বার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় এই ঘরের চতুর্দ্দিক। এই ঘর ছিল তার অদেখা। যেন এক রহস্যপুরীর মত। এই ঘর থেকেই শুনতে পাওয়া যেতো লিলিয়ানের গান। আর ঐ বাজনার সুর-ঝঙ্কার। দেখতে-দেখতে সেও বললে,—হ্যাঁ, চল' অনন্তদা।

চোখে জল নেই। তবুও যেন চোখে অশ্রুর আবেগ। এক লুকানো আঘাতের অসহ্য কষ্ট—যার প্রকাশে কোন দোষ নেই, আছে লজ্জা। অধিক ব্যথায় কাঁদে না কেউ-কেউ। চোখে জল আসে না। নিরুক্ত ব্যথায় নাকি জ্বলে যায় দুঃখের জ্বালায়। বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না মুখে—অন্তর অঙ্গার হয়ে যায়। দুজনে বাড়ীর বাইরে আসতেই দেখলো শুদ্ধ অন্ধকার। কোন্ দিকে ফটক?

অনন্তরাম বললে,—হাত ধর্ আমার। ঐ যে ফটক ঐ দিক পানে। ঐ তো রাস্তায় তোর গাড়ীর আলো জ্বলছে।

আবার সেই আলোর বিন্দু। অন্ধকারে সোনালী আলো জ্বলছে, না সেই অপেল দেখছে চোখে। যেদিকে তাকায় সেদিকে। জ্বলছে আবার নিবে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ভ্রান্তিতে নিশ্চুপ হয়ে থাকে কৃষ্ণকিশোর। মাধবীর স্তবক ? অপেল ? খদ্যোৎ—জোনাকি, জ্বলছে আর সঙ্গে সঙ্গে নিবে যাচ্ছে সেই মুহূর্ত্তে। আকাশের সোনালী নক্ষত্র নেমে এসেছে এত কাছাকাছি ! উড়ে বেড়াচ্ছে মর্ত্ত্যের অন্ধকারে ?

গাড়ীর কোচবাক্সের দু'পাশে পেতলের লণ্ঠন। অন্ধকারের দিক্-নিশানা ! দু'টো জ্বলন্ত চোখের মত দপ-দপ করছিল অদূরে। রিপন ষ্ট্রীটের জনহীন আঁকা-বাঁকা পথ—দু'পাশে গাছের সারি—সর্পিল গতিতে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারের গহ্বরে। কাদের বাড়ীতে পোষা-কুকুর একটা ডাকছিল। ভাল জাতের কুকুর—ডাক শুনেই মালুম পাওয়া যায়। ডাকে তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে।

—ভেতরে যে এত ব্যাপার তা তো অনুমান করি নাই ! ব'ললে অনন্তরাম। গাড়ীর দরজা খুলতে-খুলতে।

জুড়ীর একটা ঘোড়া খটাখট্ পা ঠুকলো।

গাড়ীর ভেতরে ব'সে সে বললে,—কি আবার ব্যাপার দেখলে ?

গাড়ীর দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিয়ে অনন্তরাম বলে,—ব্যাপার গুরুতর। ভেতরে যে ছিল একটি, তা তো অনুমান করি নাই। পাখী উড়ে গেল তো ?

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো যেন তার। অনন্তরামের শেষ কথাটা শুনে। পাখী ? কার পাখী, কে পুষলো ! কি পাখী যে ধরা দিলো আর সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গেল আকাশে। কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করে,—ভেতরে আবার কি ছিল ?

অনন্তরাম গাড়ীর দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার, তাই দেখা

যায় না। অনন্তরাম হাসে। কাকেও হাতে হাতে ধ'রে ফেলার চাপা হাসি। বলে,—ভেতরে একটি মেয়ে ছিল। আমাকে লুকিয়ে এই সব হচ্ছে! আমি ভাবতাম যে, ঐ ফিরিঙ্গী ছোঁড়াটাই বুঝি। তা এখন দেখে-শুনে যা বুঝলাম তাতে তোমার—

—চল' চল'। অনন্তরামের কথার মাঝেই সে কথা ধরলো।—চল' অনেক রাত্রি হয়েছে। বাড়ীতে গিয়ে কথা হবে।

—তা তোমার দুঃখের যথেষ্ট কারণ রয়েছে! তবুও কথা বললে অনন্তরাম। বললে,—তা আমাকে একবার বল' নাই তো? আহা, দেখতে পেলাম না মেয়েটিকে!

ভিখারীর দুঃখই গুপ্তধন। ছিন্ন কাঁথায় তার লাখ-বেলাখের স্বপ্ন। হারানো অতীতের দুঃখেই দুঃখী মুহ্যমান। রাজা-উজীরের দুঃখ? নিশানা না দেখিয়ে হঠাৎ যাদের দুঃখ দেখা দেয়। সেই অজানা অনুভূতি যখন এক তৃপ্ত হৃদয়কে আঘাত করে তখন? শতেক দিনের ব্যথায় কাতর যে, তার দুঃখ কি? একদিনের হঠাৎ শোকেই জর্জ্জরিত হয় বিত্তবান।

অন্ধকারে নিজেকে পর্য্যন্ত দেখা যায় না। গাড়ীটা একবার মচমচিয়ে দুলে উঠতেই সে বুঝলো যে, অনন্তরাম উঠে প'ড়েছে কোচবাক্সে। জুড়ীর একটা ঘোড়া বার-কয়েক নাকে-মুখে চিঁহি-চিঁহি করতেই গাড়ী চলতে থাকে পাথরের পথে খটাখট শব্দ তুলে। রিপন ষ্ট্রীটের বুকের উপর দিয়ে চললো জুড়ী। ঘণ্টা বাজিয়ে।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্রর মুখের কথা বিশ্বাস না ক'রে যে অন্যায় কৃষ্ণকিশোর করলো, তার দুঃখ প্রকাশের কোন পথ নেই। ছুটন্ত গাড়ী। ঠিক এই

মুহূর্তের জন্যই সে যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষায় ছিল। কৃষ্ণকিশোর চাইছিল একটু ফাঁকা জায়গা—যেখানে সে খানিক একা থাকতে পাবে। আর কেউ থাকবে না, শুধু সে থাকবে। ব'সে ব'সে ভাববে ঐ পালিয়ে-যাওয়া পাখীকে। কিন্তু পাখী কি ঐ একটি। আরও কত পাখী আছে তো! কত রকমের, কত দেশ-বিদেশের। এত থাকতেও ঐ উড়ে-যাওয়া পাখীর কথাই বারে-বারে ভেসে ওঠে তার কানে। লিলিয়ানের মিষ্টি-মিষ্টি কথা।

গাড়ী ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লো আচম্‌কা, কোচম্যান রাশ টেনে ধ'রেছে তাই রক্ষে। নয় তো একটা মানুষের মৃত্যু হ'তো গাড়ীর চাকার তলায়। অন্ধকারে ঘণ্টা বাজানো সত্ত্বেও বুঝতে পারেনি। গাড়ীর একেবারে মুখোমুখি হ'তে তবে ভয়ে উঠে পড়েছে। কোচম্যান আর অনন্তরাম চীৎকার ক'রে উঠেছে। গাড়ী হঠাৎ থামতেই কৃষ্ণকিশোরের চিন্তায় ছেদ পড়লো যেন। জিজ্ঞেস করলো,—কি হ'ল অনন্তদা! গাড়ী থামালো কেন?

একটা ফিরিঙ্গী মাতাল। এই পাড়ার কাছাকাছি কোথায় থাকে। মদ খেয়ে আর ঘরে ব'সে থাকতে পারে না। লোক হাসাতে বেরিয়ে পড়ে পথে। কোন' দিন হাসে, কোন' দিন গান গায়, আবার কোন' দিন বা মনের দুঃখে কাঁদে, পথে ভিড় জমিয়ে। ইংরেজী ভুলে গিয়ে বাঙলা বলতে শুরু করে। ভাঙা-বাঙলা। কে নাকি তাকে মদ খেতে নিষেধ ক'রেছে এবং বলেছে যে,—মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের পরিণাম ভয়ঙ্কর। তাতেই ফিরিঙ্গী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের সঙ্গে ঘুষি পাকিয়ে যুদ্ধ চালিয়েছে। গাড়ীর ঘণ্টা শুনতে পায়নি। আর কোচম্যানও তাকে দেখতে পায়নি অন্ধকারে—তবুও বাঁচিয়েছে একেবারে কাছাকাছি।

ফিরিঙ্গীর নেশা ছুটে গেছে জুড়ী ঘোড়াকে দেখে। যেতেই—এক লাফে উঠে বলেছে,—Oh, dog !

Dog ? ফিরিঙ্গী নেশার ঘোরে কথাটাকে উলটে নিয়েছে নিজের মনের মত। 'Oh, God !' বলতে গিয়ে বলেছে ঐ কথাটা। গাড়ী তাকে বাঁচিয়ে আবার ছুটতে শুরু করে। চৌরঙ্গীতে এসে আলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দোকানে আর লোকের বাড়ীতে আলো জলছে। মানুষের ভিড় জমেছে এখানে সেখানে। জাত-সাহেবরা বিবিদের হাত ধ'রে বেরিয়ে প'ড়েছে হাওয়া খেতে। সরকারী পুলিশ আর সিপাইরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে যে-যার জায়গায়। কর্জ্জন-পার্কে ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যাণ্ড পার্টি বাজনা শুরু ক'রেছে। ঘোড়ায়-টানা ট্রামগুলো মন্থর গতিতে মানুষ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। চিৎপুর আর হাওড়ার দিকের যত যাত্রী। কিন্তু কিছু দেখতে যেন ভাল লাগে না। শুধু ভাল লাগে ঐ উড়ে-যাওয়া পাখীটাকে ভাবতে। পাখীটার কথাই শুধু মনে পড়ে। কত শান্ত আর কত মিষ্টি ছিল তার প্রকৃতি—কত সরল আর কত নম্র।

চৌরঙ্গী পেরিয়ে কলুটোলার চৌমাথায় গাড়ী আসতেই আবার শোনা যায় মানুষের কলরোল। দেখা যায় জনতা। ফেজ আর তাজোয়া। কলুটোলার মসজিদে তখন নমাজের পর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে। যে যার ঘরে ফিরে চলেছে। পাঁটা, রাঁমছাগল, আর দুম্বাগুলো বেওয়ারিস মালের মত ঘোরাফেরা করছে। মোরগ আর মুরগীর পাল সপরিবারে রাস্তার আবর্জ্জনা খুঁটে খাচ্ছে তখনও। আঁস্তাকুড়ে কুকুরের দল কামড়া-কামড়ি করছে। একটা গাঁটকাটাকে ধ'রে জনা কয়েক মুসলমান বেদম মারছে। জুতোর দোকানের আলোয় নাগরার জরি চিক্-চিক্ করছে,

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। পেঁয়াজ আর রসুনের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারী। গাড়ীর ঘণ্টা বাজিয়ে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কোচম্যান আর সইস দুজনে মিলে তারস্বরে চীৎকার করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বলছে,—এই সামনাওয়ালা ভাগো!

ভাল লাগছে না এই অবিরাম জনস্রোত। এই হৈ-হৈ আর হুলস্থুল। এই আলোর পথ আর এই পথিকদের। বাড়ী ফিরতে মন চাইছে—বাড়ীতে ফিরে কোথাও একটা নির্জ্জন ঘরে গিয়ে চুপ-চাপ ব'সে থাকতে। কেউ আর থাকবে না সেখানে।

জহুরী জহর চেনে। বৃদ্ধ হ'লে কি হবে গাড়ীটা কাছাকাছি আসতেই চিনে ফেলেছে দোকানী। বোতল-সবুজ রঙের পাল্কী-গাড়ী। পালিশ-করা। দোকানের আলো চেকনাই মারছে যেন। দোকানী ভাবলো, চক্ষের নিমেষে গাড়ীটা যদি চ'লে যায় নাগালের বাইরে। খদ্দের যদি হাত-ছাড়া হয়ে যায়!

কলুটোলার বুকের উপর বাবুদের সেই মার্কা-মারা জুড়ী দেখতে পেয়ে দোকান ছেড়ে কোন্ এক দোকানী সরাসরি নেমে এসেছে রাস্তায়। চলন্ত ঘোড়ার লাগাম ধ'রে থামিয়ে ফেলেছে গাড়ী। বাবুদের সেই পুরাতন ভৃত্য অনন্তরামকে দেখতে পেয়েছে। ঐ দোকানীর এক সাবেকী খদ্দের এই বাবুরা। বছরে প্রচুর টাকার মাল কিনতেন।

স্ফূর্ত্তি, জর্দ্দা, হিং, জাফরান, গোলাপ-জল, কেওড়া, আতর আর ফুলেল তেল। কৃষ্ণচরণ আজীবন এই দোকান থেকে কিনেছেন। যখন যা দরকার হয়েছে কিনেছেন এই মিঞার কাছেই। মিঞা ঠকায়নি কখনও, আসল মাল দিয়েছে। একেবারে প্রথম শ্রেণীর!

গাড়ী থামতেই অনন্তরাম বললে,—কি মিঞা, তোমার যে আর পাত্তাই নেই! কেমন আছো কেমন?

মিঞা গাড়ীর দরজায় এসে কুর্নীশ করে। মেতি-মাখানো দাড়ীতে হাত বুলিয়ে বলে,—হুজুর, কিছু দিয়ে দিই গাড়ীতে?

কৃষ্ণকিশোর অনেক দিনের এক পরিচিত মুখ হঠাৎ দেখতে পেয়ে একটু অবাক হয়। কোথায় ছিল বুড়ো এত দিন! মিঞা সাহেব বেঁচে আছে এখনও? বললে,—কি মিঞা সাহেব?

মিঞা দাড়ীতে হাত বুলোয় আর বলে,—গাড়ীতে হুজুর কিছু দিয়ে দিই? হুজুরের ওখানে যাবো এক দিন। মাল দেখে পরখ ক'রে দাম দিয়ে দেবেন। মাইজী ভাল আছেন তো?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হ্যাঁ, ভাল আছেন। কিন্তু কি দেবে কি?

কি আর দেবে, খসখস? গ্রীষ্ম-দিনের সুস্নিগ্ধ সুগন্ধি। যার গন্ধের আস্বাদ পেয়ে ঐ মেয়েটা পর্য্যন্ত সাগ্রহে খোঁজ ক'রেছিল। কোন রকম লজ্জা না পেয়ে একান্ত নির্ব্বোধের মত হাত পেতে চেয়ে নিয়েছিল সেই লাল রঙের রুমালখানা। সেই লিলিয়ান আজ ঠিক বেলা দুই ঘটিকায় ইহলোক ত্যাগ ক'রেছে, তা কি জানে নাকি মিঞা!

মিঞা বলছে,—হুজুর, গুলাব দিই? গাজীপুরের গুলাব! কৃষ্ণকিশোর কি ভাবছিল! মিঞার কথা শুনে যেন ফিরে এলো এই পৃথিবীতে। বললে,—কি দেবে? গোলাপ?

মিঞা বললে,—যা বলবেন হুজুর। গঙ্গামের চম্পা, জৌনপুরের গন্ধরাজ? হাসনাহানা, লক্ষ্ণৌয়ের টাটকা হাসনাহানা ভি আছে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হাসনাহানা?

মিঞা আবার বলে,—তেহেরানের কস্তুরী? গাজীপুরের মতিয়া, বেল, জুঁই ভি আছে। যা হুকুম করবেন।

—বেলা, জুঁই, মতিয়া ? বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে না যে, কোন্‌টা। মিঞা যা বলছে তারই পুনরুক্তি করছে।

মিঞা থামে না, তার মালের ফিরিস্তি শেষ করে। বলে,—মহীশূরের চন্দনা দিই হুজুর ? দিল্ খুস্ হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই দাও! বললে সে বিহ্বলের মত। মিঞা বললে দিই, তাই সেও বললে,—হ্যাঁ, দাও। তাই দাও।

অনন্তরাম এক লাফে রাস্তায় নেমে পড়লো। বললে,—চল' মিঞা, কি দেবে আমার হাতে দিয়ে দেবে। এই গাড়ীর ভিড়ে তোমাকে আর আসতে হবে না।

মিঞা বললে আদাব জানিয়ে,—যাবো এক দিন হুজুর বাড়ীতে। কথার শেষে দোকানের দিকে পেছন ফিরলো। অনন্তরাম মিঞার একটা হাত ধ'রে পেরিয়ে দিলো বাকী পথটুকু।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ফিরে এলো একটা শিশি হাতে নিয়ে। দু'-ভরি মালের ওজনের শিশি। বললে,—মিঞা দিলে। এখন তা হলে বাড়ী ফেরা যাক্ ?

সে বললে,—হ্যাঁ। গাড়ী তুমি থামালে কেন ?

ওপরে উঠতে উঠতে অনন্তরাম বলে,—বুড়ো যে নাছোড়বান্দা! ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ফেললে।

গাড়ী আবার চলতে শুরু করে। কলুটোলার চৌমাথা ছাড়তেই ফাঁকা রাস্তা পাওয়া যায়। কোচম্যান নতুন উদ্যমে চাবুক ঘোরাতে শুরু করে। গাড়ী দৌড়য়।

আর বেশী দূরে নয়, আর নয় বেশীক্ষণ। তবুও যেন এই অলস মুহূর্ত্ত-গুলো কত অসহ্য। কত ধীরে ধীরে, কত দেরীতে একেকটা মুহূর্ত্ত শেষ

শেষ হচ্ছে। মহাকালের গতি কি থেমে যেতে চাইছে !

মুসলমান পাডার পর হিন্দু পাড়া। খুশীর উল্লাসে নাচছে। উৎসব দিনের অফুরন্ত আনন্দে। শিবরাত্রি, চড়ক, নীল-ষষ্ঠী আর গাজনের একত্র উৎসবে। চিৎপুরের রাস্তায় তার খানিক্ রেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পেঁয়াজ আর রশুন থেকে বেল-ফুলের নির্য্যাস এলো কোথা থেকে! উড়ু উড়ু বাতাসে জুঁই আর বেলের আমেজ। আর হাওয়ায়-হাওয়ায় নূপুর আর তবলার ধ্বনি। হারমনিয়মের।

অনন্তরাম কোচম্যানকে চুপি-চুপি বললে,—চল' চল' বেরিয়ে চল'। এক ফোঁটা ছেলেটাকে এ পাড়ায় দেখলে আর রক্ষে থাকবে ? দা-দেইজীরা রটিয়ে দেবে যে—

কিন্তু ঘোড়ার লাগাম যে আলগা হচ্ছে না। আলগা হ'লে দুর্ঘটনার ভয় নেই ? মানুষগুলো যে ছিটকে পড়বে দু' পাশে। জুড়ীর ক্ষুর-বাঁধানো লাথি খেয়ে সামলাতে পারবে ? তাই গাড়ীর বেগ ক'মে যায়। গাড়ীর দোতালায় ব'সে ব'সে অনন্তরাম দু'পাশের বারান্দায় চোখ বুলোয়। বিবিরা সব পালকের হাত-পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে ইদিক-সিদিক তাকাচ্ছেন বাঁকা চোখে। আপন আপন কাকাতুয়া, ময়না, লালমোহন আর টিয়াদের মুখে ছোলা ধরছেন কেউ কেউ। পোষাপাখী, রাত হয়েছে তাই আর বোল্ বলছে না, শুধু ঠোঁট ফাঁক ক'রে বিবিদের আঙ্গুলে কামড় মারছে। ওদিকে রাত্রি ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে আকাশের বুকে।

ওরা আবার কারা ?

দেখেই মেজাজটা যেন রুক্ষ হয়ে যায়। এক দল মানুষ, কাছারীর দালানে। কারা ওরা ? হ্যাঁ, মনে পড়ে যায়, চণ্ডীমহলের প্রজারা আজ

ফিরে যাবে চণ্ডীমহলে। আজ রাতের ট্রেনে। গাড়ী এখনও ফেরেনি, মালিকের সঙ্গে দেখা না ক'রে তারা যেতে পারেনি। তাই অপেক্ষা করছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে।

ম্যানেজারবাবু এগিয়ে এলেন। বললেন,—এদের তো ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তবে যেতে চায়।

চণ্ডীমহলের প্রজাদের মুখে কোন কথা নেই। ছেড়ে চলে যাওয়ার বিয়োগ-ব্যথায় নীরব। বাসদেও মাহাতো একবার শুধু বললে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে,—হুজুর, কসুর মাফ করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলের মাথা কাছারীর দালানে একবার নত হ'ল। প্রণামন্তে যে যার বহনের জিনিষ হাতে নিয়ে একে-একে নামলো দালান থেকে প্রাঙ্গণে। বাসদেও মাহাতো বললে,—আসি হুজুর!

সে কিছু বলে না। চুপ-চাপ ব'সে থাকে। একটা বেতের কেদারায়। বিদায়কালে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানাতে হয়, সেটুকুও আর মনে পড়ে না। ম্যানেজারবাবু যান তাদের ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে। দু'টো পাল্কীতে উঠে তারা যাত্রা করে। পাল্কীদারেরা বাবুদের প্রজাদের কাছ থেকে দু'-চার মুদ্রা বকশিশের লোভে দ্রুত ছুটতে শুরু করে রাস্তা কাঁপিয়ে।

সমুখে অনন্ত অন্ধকার ব্যতীত আর কেউ নেই সেখানে। কেবল দূরের এক দালানে ব'সে ব'সে এক বুড়ো পেশকার হিসাবের খাতার পাতা ওলটাচ্ছে চোখে চশমা এঁটে। তার সামনে একটা লম্পর শিখা পুড়ে যাচ্ছে দপদপিয়ে।

অনন্তরাম অন্দর থেকে ঘুরে এসে বলে,—মা যে ছেলের খোঁজ ক'রছিলেন! মেলায় যাওয়া হয়েছিল কিনা শুধোচ্ছিলেন।

—তুমি কি বললে? বললে সে চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে। বেতের কেদারায় মাথা এলিয়ে দিয়ে।

—বললাম যে, না, যায় নাই। মিথ্যে কেন বলব? বলেছি যে—এই একটু ফাঁকায় জুড়ী ছুটিয়ে এসেছি, যাই নাই কোথাও।

—মা কোথায় রয়েছেন? চোখ মুদে জিজ্ঞেস করলো সে। মাথা না তুলে।

অনন্তরাম বললে,—বৌমা এখন লক্ষ্মীর পাঁচালী শুনছেন। পাড়ার কে একজন মেয়েছেলে প'ড়ে শোনাচ্ছে। ভাল ক'রে দেখি নাই, কে।

কৃষ্ণকিশোর উঠে পড়লো কেদারা থেকে। চললো মায়ের কাছে। অনেক্ষণ দেখতে পায়নি মাকে। এখন কেন যেন ঐ মায়ের কাছেই যেতে চায়। কেমন যেন আর ভাল লাগে না এই অন্ধকারের কৃষ্ণতা।

অনন্তরাম পেছন থেকে বললে,—জামা-কাপড় না ছেড়ে যেন মায়ের কাছে যেও না! তিনি শুনলে আমার আর বাঁচোয়া থাকবে না।

মৃতের ঘরে ঢুকেছিল। লিলিয়ানের ঘরে। ছোঁয়াছুঁয়ি। শুদ্ধাচার। অস্পৃশ্যতা। অনন্তরামের কথাগুলোকে কানে নিয়ে সে অন্দরের দিকে চলে। যেতে যেতে একেক জায়গায় দেখে আবার সেই অসহ্য অন্ধকার। অন্ধকার, আর অন্ধকার!

এবার আলোর আভাস।

দুঃসহ অন্ধকারের পর যেন এক ঝলক আগুনের বিকিরণ। আগুনের মত রঙ; মুখে যেন সৌম্যের প্রশান্তি। উজ্জ্বল দীপের আলোয় উদ্ভাসিত। গলায় বস্ত্রাঞ্চল, করজোড়ে ব'সে আছেন নীরবে, কখনও বা যুক্তকর কপালে স্পর্শ করছেন। তাঁর সম্মুখে চওড়া লাল পাড়ের পট্টবস্ত্র-পরিহিতা পরম রূপবতী কে একজন সধবা রমণী। তিনি পাঠরতা। হাতে তাঁর বটতলার লক্ষ্মীর পাঁচালী। নাতি-উচ্চ স্বরে পড়ছেন তিনি। একটা গ্রাম্য সুরের ক্ষীণ তরঙ্গ বইছে যেন সেখানে। পাঠিকার পৃষ্ঠদেশে ঘন কৃষ্ণবর্ণ আলুলায়িত

কেশ। দুই হাতে গালার লাল বালা। আর গোছা গোছা গিনি সোনার চুড়ি। দীপের আলোয় ঝলমল করছে। কুমুদিনী শুনছেন আর তিনি পড়ছেন।

এক দিকে একটা পিলসুজের সুউচ্চ শিখরে ঘৃতের প্রদীপ। সতেজ শিখা জ্বলছে দপ দপ।

এক ঝলক আলো। স্বর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম, আলোকদাত্রী—জননী। ঐ তো ব'সে রয়েছেন দীপের পাশে। মুখে তাঁর আলো-করা স্বর্গীয় দ্যুতি। আয়ত আঁখিযুগল যেন ভক্তিভরে আচ্ছন্ন। ছেলেকে আসতে দেখেই পাঠিকাকে বললেন ধীর কণ্ঠে,—এইখানে বৌ আজ বিরতি হোক্। আবার আগামী কাল বৈকালে এসো।

পাঠিকা মৃদু হাসির সঙ্গে পাঠে বিরত হলেন। পার্শ্বস্থ মসিপাত্র হ'তে জরির কলম তুলে অদ্যকার পাঠ-শেষ চিহ্নিত করলেন। পাঁচালী রেখে ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। কুমুদিনী তাঁর চিবুক ধ'রে বললেন,—রাজরাণী হও মা! সীঁতির সিঁদুর অক্ষয় হোক্।

কৃষ্ণকিশোর ঘরে ঢুকে দেখলো সবিস্ময়ে। কে এই নারী! এমন বিচিত্র বেশ, এমন অপূর্ব্ব রূপ! প্রণাম শেষে উঠতেই পাঠিকা এক বার অপাঙ্গে তাকালেন। কৃষ্ণকিশোরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। শেষে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু। লুকানো চাপা-হাসি।

কুমুদিনী সে-হাসির শব্দ শুনতে পেলেন না। সে শুধু দেখলো। গমনোদ্যতা এই নারীর ওষ্ঠাধরে হাসির খেলা। আর মিশি-দেওয়া দাঁত কয়েকটি। এক সারি মুক্তা যেন। হাসির শেষে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলেন না। গুণ্ঠনের দীর্ঘতা ঈষৎ বর্দ্ধিত ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। হাতের চুড়ির গোছা শুধু অবাধ্যের মত বাজলো

যখন-তখন রিনিঝিনি আওয়াজে। মহিলার পদদ্বয়ে কালচে-লাল আলতার প্রলেপ। মহিলা অদৃশ্য হলেন দরজার বাইরে। আরও অনেক দরজার বাইরে তাঁকে যেতে হবে। গতি দ্রুত হ'ল তাঁর।

কুমুদিনী বললেন,—এসো, এখানে বসবে এসো।

পাঠরতা মহিলার ছেড়ে-যাওয়া শূন্য আসন। পশমের নক্সা তোলা। কিন্তু সব আগে যে বেশ-বদলের প্রয়োজন। মৃতের পরিবারের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে। কুমুদিনী জানলে কি আর স্থির থাকবেন! শুনলে?

সে বললে,—বেরিয়েছিলাম, রাস্তার কাপড়-জামা। ছেড়ে আসছি আমি।

কুমুদিনী ক্ষীণ হাসলেন। ছেলের শুদ্ধাচারের মাত্রা-জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। তবুও মন তাঁর অনেক দিন থেকে যেন ভাঙতে শুরু হয়েছে। যে দিন থেকে পড়ায় দেখেছেন ছেলের বীতরাগ, যেদিন থেকে ছেলে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করেছে। যেদিন কৃষ্ণকিশোর তাঁর উপস্থিতিতে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিয়েছে গুরুমশাইকে। ঐ পণ্ডিত মশাইকে। কুমুদিনী যেন ছেলের হাল ধরতে পারছেন না। চিনতে পারছেন না ছেলের চোখে কোন্ রঙ; ছেলের গতিবিধি যেন ধরতে পারছেন না।

বংশে কোন্ কুলাঙ্গারের জন্ম হ'ল!

কেমন ছেলের জন্ম দিলাম! কত সময়ে বিমনায় এই একটি কথাই চিন্তা করেন কুমুদিনী। তাঁর মাতৃত্বের লজ্জা অনুভব করেন। পরিবারের অন্যান্য দেখা ও না-দেখা মানুষগুলিকে দেখতে পান চোখের সামনে। বিদ্যার জাহাজ সব, টুলো পণ্ডিতের কঠিন শিক্ষাধারায় আস্নাত।

ঐ যে জানলার বাইরে দেখা যায় দূরে, ঐ বড়বাড়ীর বাবুরা? কেউ কেউ অসৎ হ'লেও একেক জন কৃতী সন্তান এই বংশের। বড়বাড়ীর

শুধু পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ এবং আরও কয়েকজন ব্যতীত অন্যান্যের পরিচয় এখনও ব্রাহ্মণ-সমাজ সগর্ব্বে ঘোষণা করে। বাঙলার জমিদারগণ এই বংশের প্রতি আশা পোষণ করেন। শুধু ঐ দুরাচারিগণ ব্যতীত আর সকলের প্রতি সমাজ শ্রদ্ধাশীল। আর সকলের একজনও ব'সে থাকেন না। কেউ গবেষণা করেন, কেউ অধ্যাপনা করেন, কেউ ব্যবসায়, আবার কেউ বা কেবলমাত্র নগদ-নারায়ণের বিনিময়ে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকী কারবার করেন। শুধু ঐ পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি ব'সে ব'সে দিনের পর দিন কাটিয়ে চ'লেছেন। তাও যদি বাড়ীতে স্থিতি হয়ে অলস দিনগুলো অতিবাহিত হ'ত! সময়ে-অসময়ে গৃহের বাহিরে যাতায়াত করেন পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। কিন্তু আর আর সকলের চোখ নেই সেদিকে। তাঁরা কাজের মানুষ, আপন কাজেই বিব্রত। কোথা দিয়ে যে দিন যায় তা তাঁরা জানতেই পারেন না।

ছেলে যদি কুলাঙ্গার হয়!

তার আগে যেন মৃত্যু হয় কুমুদিনীর। নিজেদের, একেবারে নিজের শ্বশুরকুলের, স্বামী আর দেওরের পরিচয় তিনি পেয়েছেন। সেই বংশের নাম যদি ডুবে যায়। আর সেই গ্রহ নয়, উপগ্রহটি কিনা তাঁরই গর্ভজ। চারি দিকে চোখ মেলে কূল-কিনারা যেন দেখতে পান না।

পাঠিকাকে বিদায় নিতে দেখেই দুজন চাকরাণী দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে। কালো রঙের চেহারা, রঙ-বাহার কাপড় পরেছে। গায়ে রূপোর ভারী-ভারী গয়না। মাথার চুল আলুথালু, পিঠের ওপর খোঁপা অবহেলায় ঝুলে প'ড়েছে। খোঁপায় টাটকা চাঁপা। হাতে ফুলের সাজি। বাতাসে সুবাস। চাকরাণী নয়, মালিনী।

ওরা ভূমিদানের প্রজা। বসবাস করে এষ্টেটের জমিতে। স্বামীরা বাগান পরিচর্য্যা করে। গাছ-গাছড়ার তদারক করে। পুকুর থেকে

জল ব'য়ে এনে বাগানের কৃত্রিম নালা পূর্ণ করে। মাটি কুপোয়। কলম কাটে। আর নাটমন্দিরের ত্রিসন্ধ্যা পূজার নিমিত্তে ফুল তুলে সাজি ভ'রে দেয়। ঘরের মেয়েরা সেই সাজি খাস মা-ঠাকরুণের ঘরে পৌঁছে দেয়। কুমুদিনী সেই ফুলের বোঝা একটি একটি দেখে দেন স্বহস্তে। ফুলের রাশিতে যদি নষ্টফুল থাকে তৎক্ষণাৎ পরিহার করেন সেই পুষ্প। বার-বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন ফুলদানি সাজাতে।

মালীরা মা-ঠাকরুণের জন্যে অনেক কৌশলে পূর্ণ করে ফুলের সাজি। থরে-থরে সাজায় ফুল। একেক স্তরে রাখে একেক জাতের।

মা-ঠাকরুণের পরিশ্রম হবে তাই আর মিশ্রিত করে না ফুলের প্রাচুর্য্য। ফুল আর বিল্বপত্র। দূর্ব্বা আর তুলসী।

দীপের কম্পমান শিখায় হঠাৎ সচকিত হন কুমুদিনী। গুণ্ঠনে মুখাবৃত করেন। মনে করেন কেউ বুঝি আসে। কার যেন ছায়া। সলাজ অভ্যাস। কেউ আসে না। কারও ছায়া নয়। দীপের শিখা হাওয়ায় কেঁপে উঠেছে। দরজার বাইরে অপেক্ষমান দুজন মালিনী। টাটকা ফুলের গন্ধ পেয়েছেন কুমুদিনী। বুঝতে পেরেছেন ফুলের সাজি এসেছে। মালিনীরা এসেছে। কুমুদিনী উঠে চললেন নৈবেদ্যর ঘরে। সেখানে ব'সে তিনি ফুল বেছে দেবেন পুষ্পপাত্রে। সূতার কাপড় ছেড়ে পরবেন পট্টবস্ত্র। মালিনীদের দেখে বললেন,—আয়, আমার সঙ্গে আয়।

মালিনীরা হাসতে হাসতে পিছু নেয় তাঁর। খানিক এগিয়ে দেখতে পান নিজের ছেলেকে। প্রায়ান্ধকার দালানে দাঁড়িয়ে আকাশ-পানে যেন তাকিয়ে আছে কৃষ্ণকিশোর। একাগ্রচিত্তে কি দেখছে কে জানে! আকাশের এক প্রান্তে ঘষা-কাচের মত একফালি চাঁদ। নিস্তেজ আর পাণ্ডুর। আর কয়েকটা নক্ষত্র, ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। দপ-দপ জ্বলছে।

কুমুদিনীর পদধ্বনি শুনতে পায়নি সে। একেবারে চোখাচোখি হতেই যেন অপ্রস্তুত হ'ল কৃষ্ণকিশোর।

একটু বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞেস করেন কুমুদিনী,—পোষাক ছাড়তে গেলে না? একলাটি দাঁড়িয়ে কেন?

সত্যিই এমন অকারণে এখানে কেন? এ বাড়ীর মহলে-মহলে এত জায়গা থাকতে অন্দরের এই দালানে? পোযাক বদলাতে নিজের ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। বেশ নির্জ্জন এই দালানটা। কেউ কোথাও নেই। দালানের সামনে একফালি মাটিতে পাশাপাশি কয়েকটা পেঁপে গাছ। পাতাগুলো যেন হাত মেলে আছে। ডালের ভিড়ের ফাঁক থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চন্দ্রালোক। মেঘের আস্তরণে লুকিয়ে আছে চাঁদ। ঘষা-কাচের মত।

এখানে আশ্রয় নেওয়ার একমাত্র কারণ নির্জ্জনতা। নিজের ঘরে গিয়ে বসলেও রেহাই নেই। অনন্তরাম এখনই গিয়ে হাজির হবে। বলবে এটা-সেটা কথা। কোন রকমে যাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তাই দেখতে গিয়ে ভঙ্গ করবে শান্তি। কৃষ্ণকিশোর তখন লজ্জায় বলতে পারবে না অনন্তরামকে, চলে যাও এখান থেকে। স্নেহের আতিশয্যে অনন্তরাম সঙ্গ ছাড়তে চায় না যে! ঠিক ছায়ার মত থাকে সঙ্গে-সঙ্গে।

মা'র কথার যে কি উত্তর দেবে সেই কথাই ভাবতে থাকে সে। কুমুদিনী আবার বলেন,—কি, হয়েছে কি? এখানে কেন?

কৃষ্ণকিশোর কোন কথা খুঁজে পায় না। কি হয়েছে কি তার বিস্তারিত বিবরণ মনে পড়ে। এক অচিন্ত্যনীয় ঘটনা, অপ্রত্যাশিত এক দুর্ঘটনা চোখের সামনে ঘটে গেছে আজ। একটা মেয়ে, যাকে মাত্র কয়েক দিন সে দেখেছে, তারই অকাল-মৃত্যু হ'ল। একেবারে না ব'লে চলে গেল!

এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে প'ড়েও কি কেউ বাঁচতে পারে?

দুর্দান্ত অসুখ—ম্যালেরিয়া, ভয়ঙ্কর রকমের ম্যালেরিয়া—বাঙলার গ্রাম-গুলিকে ধীরে ধীরে শ্মশানে পরিণত করতে চায়, উজাড় করতে চায় বাঙালী জাতিকে। কিন্তু এ রোগের ওষুধ কি? এ ব্যাধির নেই কোন চিকিৎসা? ক্ষণেকের জন্যে মনটা যেন বিদ্রোহ করে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে। কানের কাছে কতকগুলো মশা কখন থেকে ভন-ভন করছে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—না, কিছু হয় নি।

উত্তর শুনে মনে মনে বিরক্ত হলেন কুমুদিনী। ভাবলেন, এ আবার কি কথার ছিরি। তবে কেন এখানে? এই জনহীন তল্লাটে! একটু যেন রহস্যের রেশ পান কুমুদিনী। চোখে নামে বিস্ময়ের ঘোর। বলেন, —তার চেয়ে যাও না, বই খুলে একটু বসতে যাও না। সময় কি এমনি ক'রে নষ্ট করে? কি করবে কে জানে। কিছু জানবে না, কিছু শিখবে না, এ বাড়ীর মান নষ্ট করবে?

কুমুদিনীর কথা যখন শেষ হ'ল সে তখন সেখানে আর নেই। মা'র কথা শুরু হতেই বুঝেছে, এ কথার জের কোথায় গিয়ে থামবে। বুঝেই চ'লে গেছে সেখান থেকে। দোতালার সিঁড়ির দিকে এগিয়েছে। নিজের ঘরের দিকে। কথা শুনতে গররাজী নয় সে, কিন্তু কুমুদিনীর পেছনে যে আরও দুজন রয়েছে। মালিনীরা দুজন। তাদের উপস্থিতিতে কুমুদিনী ব'লে যাবেন আর সে শুনে যাবে? তার চেয়ে অপমান কি হ'তে পারে আর? সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় যায় সে।

টম্ কোথা থেকে এক লাফে এসে পায়ে-পায়ে জড়ায়। তার গলার ঘন্টি শব্দায়িত হয়। সিক্ত জিহ্বা হয় বহির্গত।

নৈবেদ্যর ঘরে আছেন ব্রাহ্মণ-কন্যা কয়েক জন। বয়োবৃদ্ধা বিধবা জনা-কয়েক। পরিধান, আহার এবং থাকার খুঁটি পেয়ে মন্দিরের সেবা

করেন, পূজার তৈজস-পত্র মাজা-ঘষা করেন, দীপের সল্‌তে পাকান আর মালা গাঁথেন।

কুমুদিনী ফুলের রাশির একটি-একটি ফুল পরীক্ষা ক'রে দেন আর তাঁরা চোখে চশমা এঁটে মালা গাঁথতে শুরু করেন। গঙ্গাজলের কলসীর পাশে ব'সে ব'সে। নৈবেদ্যর ঘরে ফল, চাল, মিষ্টান্ন, তৈজস-পত্র আর গঙ্গাজল থাকে। সারি সারি মাটির কলসী, শুধু গঙ্গোদক।

সেবিকাদের একজন মালিনীদের কাছে যায়। মালিনীরা ফুলের সাজি নামিয়ে রাখে ভূমিতে। সেবিকা গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে সেই সাজি এনে আজাড় ক'রে দেয় নাটমন্দিরের সাজিতে। কাঁচা বাঁশের সাজি থেকে পেতলের সাজিতে যায় ফুলদল। তারপর অনেক পরে যাবে দেবতার কণ্ঠে, ঠাঁই পাবে চরণে। সচন্দন হবে তখন।

কুমুদিনী ঘরে এলেই একটা আসন পেতে দেওয়া হয় তৎক্ষণাৎ। তিনি সেই আসনে ব'সেন। গঙ্গাজলে হস্তক্ষালন করেন। তার পর একটি-একটি ফুল—

মালীরাও জানে মা-ঠাকরুণ স্বয়ং ফুল সাজাবেন পুষ্পপাত্রে। মালার জন্য ফুল বেছে দেবেন। বিল্বপত্র, তুলসী, দূর্ব্বা সাজিয়ে দেবেন। তারা তাই থরে-থরে সাজিয়ে দিয়েছে একেক জাতের ফুল। কুমুদিনী ফুলের রাশি আর পুষ্পপাত্র সমেত অধিষ্ঠিত হন। এক দিকে সেবিকাদের একজন চন্দন ঘষছে আপন মনে। শ্বেত-চন্দনের পাত্র উপচে পড়ছে। এখন রক্ত-চন্দনের কাঠ শিলায় ঘষা হচ্ছে। সেবিকার মন পড়ে আছে তার নিজের মেয়ের কাছে। মেয়ে হাটবসন্তপুরে শ্বশুরবাড়ীতে আছে। স্বামী আবার কুলীন, আজ এখানে কাল সেখানে খেয়ে-ঘুমিয়ে দিন গুজরান করে। মেয়েটাকে নাকি পেটে খেতে দেয় না, রাতে ঘুমোতে দেয় না, অন্ধকার

ঘরের ভেতর দিবারাত্রি রেখে দেয়। সেবিকার কাছে চিঠি আসে কালে-ভদ্রে। মেয়ে তার কোন লুকানো মানুষকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে মা'র নামে পাঠায়। চিঠির এক ছত্র হয়তো, "ইহা অপেক্ষা তোমরা যদি আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতে তাহা হয়তো সহ্য করিতে পারিতাম। আমি যে কি কষ্টে দিন কাটাইতেছি এই পত্রে তাহা জানাইতে পারিব না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী দেখিতে পাইলে আমাকে পোড়া কাঠ দিয়া পুড়াইয়া মারিবে। ভবিষ্যতে যদি কোন দিন পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তখনই জানাইব।"

সেবিকা চিঠি পড়তে পারেন না। অক্ষর চিনেন না। কৃষ্ণকিশোরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় চিঠি। সেবিকার চোখে এখন হাটবসন্তপুর, মনে মেয়ের মুখ। কিরণশশীর।

থরে থরে ফুল। রাতের আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মত; ভোরের শিশির-বিন্দুর মত; সূর্য্যের প্রথম চুমায় যারা পল্লবিত হয় সকল চোখের অলক্ষ্যে—সেই ফুলের স্তবক একেক স্তরে। জবা আর কামিনী; চাঁপা আর মালতী; গন্ধরাজ আর অপরাজিতা; জুঁই, বেল, টগর, মাধবী, অশোক, কল্কে আর গোলাপ। বিল্বপত্র। এক দিকে তুলসী। নৈবেদ্যর ঘরে সৌরভের ছড়াছড়ি। চাঁপা আর গন্ধরাজের উগ্র গন্ধ। জুঁই আর বেলের সুমিষ্ট আমেজ। গোলাপের মধুগন্ধ।

ফুলের সঙ্গে ফল। নৈবেদ্যর ঘরে সর্ব্বক্ষণ ফুল আর ফলের গন্ধ। আম কাঁটাল কলা, আরও কত কি। শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। কুমুদিনী ফুল বাছতে শুরু করেন।

ফুলের গাছ অনেক দিনের। এ-বাড়ীর লাগাও ঐ বাগান যত দিন হয়েছে তত দিনের। কৃষ্ণচরণের ফুল-বাগানের সখ নয়, নেশা ছিল।

কলকাতার মত বুনো শহরে সেকালে গোলাপ বাগান ক'রেছিলেন এখানে। লাল ভেলভেটের গাল্‌চে পেতে দিত কে যেন। কত রাজা-রাজড়া সাহেব-সুবো দেখতে আসতো। দেখে তাঁদের চক্ষু সার্থক হয়ে যেতো। এখন যে চাঁপা আর গন্ধরাজ সাজি ভ'রে দিয়ে গেল মালিনী, সে-সব ফুলের গাছ রোপণ করেন কৃষ্ণচরণ।

বাগানের পাঁচিল-ঘেরা, নারকেল গাছের সারি। ফলদাতা ব্রাহ্মণ একেকটি। বৃক্ষ-নারায়ণ। মাহেশের মেলা থেকে কৃষ্ণচরণ আনিয়েছিলেন। আজ সেই গাছের পঙ্‌ক্তি আকাশে মাথা তুলেছে। আজ সেই গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যায় চাঁদের ঝিলিমিলি। তাদের কাণ্ডে গণনা করা যায় বাৎসরিক চিহ্ন। বয়স হ'ল প্রচুর, প্রায় পঞ্চাশোর্দ্ধে!

ফুলের চাষ করতেন কৃষ্ণচরণ। যে সময়ের যা। গ্রীষ্মে জুঁই, বেল, মালতী, আর শীতে মৌসুমী। লণ্ডনের কোন্ বীজ-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মৌসুমীর বীজ আনাতেন। বর্ষায় রজনীগন্ধা আর শীতে বাগানের এক পাশে গাঁদার বন তৈরী করতেন। হলুদ রঙের মেলা বসতো যেন!

কৃষ্ণচরণ এত ওয়াকিবহাল থাকতেন যে, কোন গাছের একটি ফুল কেউ আহরণ করলে দোষীকে চ্যুতবৃন্তের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে বলতেন, —"এখন এই রক্তপাত বন্ধ কর।"

দোষী হতেন হয়তো কনিষ্ঠ সহোদর। সক্ষোভে বলতেন কৃষ্ণকান্ত,— অপরাধ মার্জ্জনা হোক। লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না যে!

সত্যিই গাছের একটি ছিন্ন শাখা থেকে জলীয় পদার্থ নির্গত হ'তে থাকতো। কৃষ্ণকান্ত হয়তো কোন পুষ্পকে বৃন্তচ্ছেদ করতেন।

পড়াশুনা, আর লেখাপড়া!

কান যেন ঝালাপালা হয়ে গেল এই একটা কথা শুনে শুনে। পৃথিবীতে কি ঐ একটি বিষয় ব্যতীত আর কোন-কিছুর কোন মূল্য নেই? পঠন-পাঠন ছাড়া নেই অন্য কোন প্রসঙ্গ? কমলার মতই ঠিক বাগ্‌দেবীর চাঞ্চল্য। ক্ষণেকের অবহেলায় রুষ্টা সরস্বতী চঞ্চলা হয়ে ওঠেন। তাঁকে ত্যাগ ক'রে অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হ'লে মাৎসর্য্যের আতিশয্যে তিনি তখন তুষ্টা সরস্বতীর রূপ ধারণ করেন। শত চেষ্টাতেও আর তাঁকে ফেরানো যায় না। চোরা যেমন ধর্ম্মের কাহিনী শোনে না, তেমনি ঠিক অমনোযোগী ছাত্রের কানেও বাণী-বন্দনার মন্ত্র শুনিয়ে কি ফল!

কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছিল, মা যদি জানতেন আজকের দুর্ঘটনা—শুনতেন লিলিয়ানের মৃত্যু-সংবাদ! হঠাৎ ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় ঘা পড়তেই তাড়াতাড়ি সে পোযাক বদলাতে লেগে যায়। সময় নষ্ট না ক'রে এখনই যেতে হবে পড়ার ঘরে। বসতে হবে পড়তে। আজ পড়বে ততক্ষণ যতক্ষণ মা অন্দর থেকে খেতে না ডাকেন। কুমুদিনী, কুমু, বৌমা, মা ঠাকরুণ, কৃষ্ণকিশোরের মা—তিনি হয়তো অনেক, অনেক ভাল—তাঁর হয়তো দোষ নেই কিছু। কিন্তু মা'র যদি বিবেচনা থাকতো খানিক,—আর কোন অভিযোগ থাকতো না কৃষ্ণকিশোরের। কুমুদিনীর সব আছে, নেই যেন শুধু ঐ একটি সদ্‌গুণ—যার নাম বিচার-বিবেচনা। মা যদি জানতেন যে আজ কি দেখলে সে চোখের সামনে, দেখলে কার শব শোভাযাত্রা—তা হ'লে হয়তো অন্য দিনের মত না-পড়ার জন্য অভিযোগ করতেন না।

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় বাজলো যে অনেক। আটটা। পড়ার ঘরে বই খুলে পড়ে ছেলে।

অন্য দিন এ সময়ে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে শয্যায় এতক্ষণ। অনন্তরাম এসে বললে,—মা ব'লে পাঠিয়েছেন খেতে যেতে।

কথাটা শুনেই বিরক্ত। বলে,—মা একসঙ্গে কত কথা বলেন? বললেন তো পড়তে যেতে।

অনন্তরাম ঘরের ইদিক-সিদিক তাকাতে তাকাতে বললে,—আহা, রাগ কচ্ছিস কেনে! মা কি জানেন যে, পাখী উড়ে গেছে আজ!

ঠিক কথা বলে অনন্তরাম। সেও এই কথাই ভাবছে, মা কি কিছু জানেন? জানলে কি আর রক্ষা থাকবে, তাই তো তাঁকে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি কৃষ্ণকিশোর। অরুণের সম্পর্কটা পুরাপুরি লুকিয়ে আছে বাড়ীর সকলের চোখে।

তারা বিধর্মী। ম্লেচ্ছ। লিলিয়ানরা খ্রীষ্টান। বিজাতীয় ঐ অরুণেন্দ্র। অথচ তারা যে সাহেব তাও নয়। ইঙ্গ-ভারতীয়। দো-আঁশলা?

—বইখানা কি বই রে? সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে অনন্তরাম।

—কোন্ বইখানা? কৃষ্ণকিশোর কথা বলে একটা বইয়ে চোখ রেখে।

—ঐ যে ইংরেজী কেতাবখানা। বিছানায় সেদিন—

—ফার্ষ্ট বুক। অনেক্ষণ বাদে উত্তর পাওয়া যায়।—ইংরিজী প্রথম ভাগ।

অনন্তরাম নাক সিঁটকে বললে,—অ। ম্লেচ্ছ ভাষা?

অনন্তরাম জানে না তাই। ইংরেজ জাতটার প্রতি মন থেকে তার যেমন দুরপনেয় ঘৃণা, ইংরেজী ভাষাটার প্রতিও সে সেই ঘৃণা পোষণ করে। যশোরে থাকা-কালীন খাস-ইংরেজ সাহেব সে দেখেছে। বোধ হয় সংখ্যাতীত। সেই তখনই ইংরেজ দেখবার সাধ জন্মের মত মিটে গেছে অনন্তরামের। অস্ত্রহীন অসহায় মানুষগুলোর পিঠে চাবুক আর বুটের সদম্ভ চালনা দেখতে দেখতে শরীর তার কতবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আতঙ্কে শিউরে উঠেছে বুকের ভেতরটা। আঘাতের জ্বালায় ছটফট করেছে

মাটিতে লুটিয়ে। ইংরেজ সাহেব আর ফিরে তাকায়নি। মদের বোতল খুলতে খুলতে তাচ্ছিল্যে অট্টহাসি হেসেছে। আর বস্তা-ভর্ত্তি টাকার থলি পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়। সেখান থেকে চালান হয়ে গেছে জাহাজে। জাহাজ গিয়ে ভিড়েছে শেষে ইংলণ্ডের পোর্টে। কাঁচা রূপোর চিকিমিকিতে আবার সেখানে এক পালা হাসির তুফান বয়েছে। মদের রঙীন বুদ্‌বুদ্‌ উঠেছে তুষার-বরণ আকাশে।

অনন্তরাম জানে না, ইংরেজী ভাষাটার ঠিক কোন দোষ নেই। প্রতি যুগে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে সে শুধরোচ্ছে মহাত্মাদের স্বকীয় শোধন-প্রক্রিয়ায়। মসিজীবীদের দেওয়া ইংরেজীর মনোরম কলেবর যে প্রায়-অজ্ঞ অনন্তরামের চোখে ধরা পড়বার নয়। কেঁদে-ককিয়ে না হয় বাঙলা দু'চার ছত্র অনন্তরাম পড়তে পারে। ইংরেজীর সে কি জানবে! সে কি জানে ইংরেজী ভাষা কাদের সেবায় ধন্য!

হঠাৎ যেন চোখ পড়েছে অনন্তরামের।

ঘরের আলো জ্বালতে দেখতে পেয়েছে অনন্তরাম। ঘরের আসবাব-পত্রে ধুলো জমেছে। দেখতে পেয়েই, সেই ধুলা পরিষ্কারের কাজে লেগে গেছে। টেবিল সাফ হতেই নজরে পড়ে বুক-কেস্‌। কত কালের ময়লা সেখানে। খানসামাদের বাপান্ত করে অনন্তরাম। মনে মনে। মা পড়ার ঘরে যে আসে না, তাই আর খানসামাদের হুঁশ নেই যে, মাঝে মাঝে ঝাড়া-পোঁছা করে। কাজটা অনন্তরামের নয়। তবুও দেখে যেন আর স্থির থাকতে পারে না সে। অপরিচ্ছন্ন ঘর দেখে সে ভাবে যে, আজ হাত দিলে চট ক'রে আর শেষ হবে না। মনে মনে খান-সামাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে করতে হঠাৎ আবার বললে অনন্তরাম, —তা তোর এমন ম্লেচ্ছ ভাষার দিকে ঝোঁক হ'ল কেন? শিখবি নাকি?

উত্তরদাতা অনেক্ষণ পড়ার ঘর ত্যাগ ক'রেছে।

অনন্তরামের কথাগুলি অরণ্যে রোদনের মত শোনায়। কেউ শোনে না, সে শুধু ব'লে যায়। কথার শেষে উত্তরের প্রতীক্ষা করে। কারও কোন রকম টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত না শুনতে পেয়ে ফিরে তাকায় পেছন পানে। দেখে কেউ সেখানে নেই।

অনন্তরামের কথায় বিরক্ত হ'য়ে কৃষ্ণকিশোর তখন পাশের ঘরে চলে গেছে। ব'সেছে কালি-কলম আর বইপত্র খুলে।

সদরের লোকেরা দেখে একটু বিস্মিত হ'য়েছে। এমন অসময়ে এ আবার কি খেয়াল হ'ল হুজুরের। বিছানায় না গিয়ে পড়ার টেবিলে! অবাধ আরাম ছেড়ে লেখাপড়ার কষ্ট-স্বীকার! একটি একটি বই খোলে আর বেখে দেয়। মন বসে না যেন কোন একটায়। পড়ার কথা কত সময়ে তার মনকে তোলপাড় ক'রেছে। কিছু না-জানা আর কিছু না-শেখার লজ্জাও সে মন থেকে অনুভব ক'রেছে। কিন্তু বই খুলে কি পড়বে যেন আর খুঁজে পায় না। জ্ঞানসঞ্চয়ের ইচ্ছা যদিও উগ্র। কিন্তু জানবে কেমনে? কে দেবে জানিয়ে? শেখাবে কে?

মনোযোগী ছাত্রের মতই পড়তে পারে, পারে না শুধু পাঠশালার শিক্ষা-ধারায় নিজেকে মানিয়ে নিতে। শিরোমণি পণ্ডিতের হিংসা-লোলুপ দৃষ্টি দেখেছে সে বহু দিন। লক্ষ্য ক'রেছে আন্তরিকতার একান্ত অভাব যেন তাঁর শিক্ষা-প্রণালীতে। কাঞ্চন বিনিময়ের সম্পর্কে সব কিছুর মূল্য যাচাই করেন। ঔদার্য্যের ধার ধারেন না কোন দিন।

বিনোদা এসে ডাক দেয়। বলে,—মা যে খাবার নিয়ে ব'সে আছেন। খানিক থামে বিনোদা। কথা বলে চিবিয়ে-চিবিয়ে,—মা বলছিলেন, লেখা-পড়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে ম্যানেজারবাবুর কাছে জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখাশুনা ক'রলেও কত কাজ হয়! একেবারে আকাট মুখ্যু হয়ে থাকলে—

ঠিক তীরের মত গায়ে যেন বেঁধে। বিনোদা তো কথা বলে না, বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে।

কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছিল কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল এখন।

কালো পোষাকের লোকজনেরা কোথায় চললো লিলিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে! কোন্ সমাধি-ক্ষেত্রে পোঁতা হবে লিলিয়ানের দেহ! কেন, পার্ক ষ্ট্রীটের ওল্ড বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে। এখন রাত্রি? তাতে কি, পৃথিবীর কণা মাত্র ভূমিতে আলো দেখানোর মত আলোর অভাব হবে কলকাতার মত শহরে! সমাধি-ক্ষেত্রের সারি সারি কবরের মাঝে দু'টি জায়গা তখন জোরালো লণ্ঠনের আলোয় ঝল্‌সে উঠেছে। লিলিয়ান আর তার একজন সহযাত্রিণীর শবাধার খুঁড়তে শুরু ক'রেছে ডোমেরা। লিলিয়ান আর অন্য কে একজন অশীতিপর বৃদ্ধা।

পুরোহিত মন্ত্র পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। আর অরুণেন্দ্র তখন লণ্ঠনের দীপ্তিতে যতগুলি কবর দেখা যায় তাদের বুকের আক্ষরিক পরিচয় প'ড়ে যাচ্ছে। কত হরেক রকমের কবর, শ্বেত-শুভ্র পাষাণের শিল্পিত বেদী। কত মর্ম্মাহত মানুষের শেষ আকুতি। সেই সঙ্গে সাল আর তারিখ। নাম আর ধাম।

অনেক্ষণ বাদে খেয়াল হয়, বিনোদার কথার সুরে কেমন যেন অসহ্য বিদ্রূপ, বিনোদার কথাগুলো যেন অতি বেশী কঠোর। নেহাৎ জন্ম থেকে দেখছে তাই, বৌঠানের বাপের বাড়ীর দেশের লোক, কুমুদিনীর সঙ্গে এসেছে—কৃষ্ণকিশোর তাই খুব বেশী কিছু আর মনে করে না। বিনোদার কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়। খেয়াল হ'তেই বললে,—আচ্ছা, তাই হবে। ম্যানেজারবাবুর কাছে জমিদারীর কাজ দেখবো, মাকে তুমি বল' গে যাও।

তার কথায় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য। কথা শুনে বিনোদাও একটু যেন

অবাক হয়। কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন লক্ষ্য করে, তার কথায় কাতর ছেলেটির মুখে। চ'লে যায় অন্দরে। যায় বলতে বলতে,—কি হ'ল আবার ছেলের! গোঁসা হয়েছে বুঝি?

কৃষ্ণকিশোর তখন সত্যিই বই খুলে পড়তে চেষ্টা করে। পড়তে পারে না। বিনা ব্যাকরণে ভাষা-শিক্ষা হয় কখনও? যার অক্ষর-পরিচয় নেই, সে কখনও পড়তে পারে একটানা গদ্য? শেষের দিকের পাতা থেকে প্রথম দিকের প্রথম পাতা ওলটায়, অক্ষর চিনতে চেষ্টা করে। A, B, C—

আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে কখন সেই বইখানাই খুলেছে। ফার্ষ্ট বুক। ছবি দেখে প'ড়তে ইচ্ছা হয়েছে, পড়তে পারেনি। তখন মনে পড়েছে, পড়তে হলে প্রথমে অক্ষর চিনতে হয়। তখন সেই পাতায় মন উড়ে গেছে। চেনাশুনার পর পড়াশুনা। পরিচয়ের পরেই পাঠ।

তাও বুঝি আর ভাল লাগলো না বেশীক্ষণ। ম্যানেজারবাবুর খোঁজ প'ড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। তলব কর' ম্যানেজারবাবুকে। 'ওরে কে আছিস' ব'লতেই একজন খানসামা এসে হাজির হয়। বাইরের দালানের এক পাশে ব'সে নাটমন্দিরের ধুচুনী লণ্ঠনের কাচ পরিষ্কার করছিল। রামনামের আসরে জ্বলেছে, কলঙ্ক পড়েছে।

—ম্যানেজারবাবুকে ডাকো। কৃষ্ণকিশোর বলে বিনম্র কণ্ঠে। হঠাৎ কি মনে হয়, উঠে পড়ে কেদারা থেকে। নিজেই যায় ম্যানেজারবাবুর কাছে।

কাছারীতে পৃথক একখানি ঘর আছে ম্যানেজারবাবুর। সেখানেই তিনি থাকেন। কাজের সময় কাছারীতে। ছুটি পেলে চলে যান দেশে। ম্যানেজারবাবুর নিবাস মেদিনীপুরে। কাঁথির কাছাকাছি।

—আমাকে জমিদারীর কাজ শিখিয়ে দিন। তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর।

ম্যানেজারবাবু তখন উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর সবেমাত্র একখানি পকেট-সাইজ গীতা খুলে এক-আধটা শব্দ পড়েছেন কি পড়েননি। হুজুরকে একেবারে তাঁর ঘরের সমুখে দেখতে পেয়ে প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁর চোখ কখনও ভুল দেখতে পারে না এই প্রগাঢ় বিশ্বাসে তিনি ব'লেই ফেলেন—কে, হুজুর অনুমান করি? আপনি এমন অসময়ে কেন? কি বললেন ঠিক ঠাওরাতে পারলাম না। আর একবার বলুন হুজুর!

—মা বলেছেন আমাকে জমিদারীর কাজ শিখিয়ে দিতে। কৃষ্ণকিশোর যেন মুখস্থ ব'লে যায়।

—সে কি হুজুর! সে কি আপনার এক কথায় শেখবার? অনেক জটিল। অনেক ঝামেলা, অনেক হেফাজৎ, অনেক গোলমেলে ব্যাপার যে হুজুর! যখন তিনি স্বয়ং হুকুম করেছেন তখন নিশ্চয়ই সে কথা পালন করবো। ম্যানেজারবাবু কথা বলতে বলতে ভেবে কুল-কিনারা খুঁজে পান না যেন। এমন অসময়ে কেন যে এই হুকুম হ'ল তাই ভাবতে থাকেন। বলেন,—শেখানো কি আর যায় হুজুর, শিখে নিতে হয়। কাজ দেখতে-দেখতেই শিখবেন। বেশ। খুব ভাল কথা। আমি যদ্দুর পারি চেষ্টা করবো।

—আজ, এখন থেকে শিখবো আমি। আপনি কাছারীতে আসুন। কৃষ্ণকিশোরের কথায় মিনতি। কাতর প্রার্থনার মত শোনায় যেন তার কথা।

ম্যানেজারবাবু আর কিছু বলতে পারেন না। বলেন,—বেশ কথা হুজুর। চলুন।

আমলা-তন্ত্র তখন ঘুমের ঘোরে ঢুলতে শুরু করেছিল। খাতাপত্র

তুলে ফেলতে উদ্যোগী হচ্ছিল। তা আর হ'ল না। হুজুর বিনা শব্দে বেটাইমে কাছারী পরিদর্শনে এসেছেন। আমলা-তন্ত্র নানা রকম কল্পনা করতে থাকে। কেউ বলে, কোন মৌজার নায়েব নাকি তছরুপের দায়ে ধরা পড়েছে। সদর থেকে জরুরী চিঠি এসেছে। হুজুরের কানে পৌছতেই তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। নানা জনে নানা কথা কইছে।

কাছারী-ঘরে ঢুকতেই একটা বেতের কেদারা নিয়ে আসে একজন পাইক। কৃষ্ণকিশোর বসে না কেদারায়। আমলাদের তক্তাপোষের একপাশে বসে। ম্যানেজারবাবুও এসে বসেন। অন্যান্য আমলারা বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে যে-যার জায়গা থেকে।

কয়েক মুহূর্ত্ত মুদিত চক্ষে কি যেন চিন্তা করেন ম্যানেজারবাবু। তার পর বলেন,—হুজুর, জমিদার দুই প্রকারের। যথা, বাদশাহী আর নন্-বাদশাহী। এই দু' জমিদারের কথা বলতে বলতেই তো হুজুর আজকের রাতটা কেটে যাবে। কা'কে বাদশাহী জমিদারী বলে, আর কা'কে নন্-বাদশাহী বলে শুধু তাই আজকে জেনে রাখুন, হুজুর। তার পর ধীরে-সুস্থে হবে'খন। আজ যে রাত হয়েছে অনেক।

—তা হোক। বলুন আপনি। অটল, জেদীর মতই বলে কৃষ্ণকিশোর।

ম্যানেজারবাবু বলেন,—হ্যাঁ, আমি তো বলতে শুরু করেছি। কিন্তু আপনার কষ্ট হবে না এমন বেটাইমে! ব'সে ব'সে মশার কামড় খাবেন?

মশা! চম্‌কে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর। কোথায় মশা। যে মশা লিলিয়ানের শরীরে ব্যাধির বিষ ঢেলেছে, কোথায় সেই মশা! সে বললে,—আচ্ছা আপনি বলুন।

ম্যানেজারবাবু বোঝেন যে, বালকের খেয়াল হয়েছে যখন—তখন কিছুটা অন্ততঃ বলতেই হবে। বলেন,—এটা হুজুর এখন ব্রিটিশ-আমল তা

অনুমান করি নিশ্চয়ই জানেন? আগে ছিল নবাবী আমল। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হারিয়ে আপনার হুজুর লর্ড ক্লাইভ আর ওয়াট্‌সন বাঙলার হর্ত্তা-কর্ত্তা হয়ে উঠলো। জাফর আলিকে নামে মাত্র মসনদে বসালেও ইংরেজরাই হুজুর আসলে কলকাঠি নাড়তে লাগলো। সেই নবাবের আমল থেকে যে যে জমি নিষ্কর দেওয়া হয়, ঐ সমস্ত জমিকে বাদশাহী লাখেরাজ ব'লতো।

জমিদার দুই প্রকার বলতেই নিজেদের বিষয়ে উগ্র কৌতূহল জাগে কৃষ্ণকিশোরের। তারা নিজেরা কোন্ দলে পড়বে, তাই জানতে চায়। বলে,—আমরা কি, ম্যানেজারবাবু? নন্-বাদশাহী?

অনুশোচনার সুরে বললেন ম্যানেজারবাবু,—সে কি কথা বলছেন হুজুর! আপনারা যে বাদশাহী, হুজুর! নবাব সিরাজদ্দৌলারও আগে থেকে আপনাদের এই জমিদারী। আপনার পিতা, তস্য তস্য পিতা সর্ব্ব-প্রথম এই জমিদারী হাতে নেন। তখন কেবল হুগলীর থানিকটে ছিল এই জমিদারীর সীমানা। অতঃপর আপনার পিতা বিহারের তালুক নিলামে কিনে ফেললেন।

অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে খুঁজে পেয়েছে অনন্তরাম। প্রথমে পড়ার টেবিলে খুঁজেছে। দেখতে না পেয়ে খানসামাদের জিজ্ঞেস করতেই খোঁজ পেয়েছে কাছারীতে। সেখানে তাকে দেখতে পেয়ে গভীর বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে যেন। চোখে চোখ পড়তেই বলেছে অনন্তরাম,—মা আর কত রাত পর্য্যন্ত ব'সে থাকবেন জিজ্ঞেস করলেন?

বিশ্রী লাগে অনন্তরামের কথা। নিজেকে মনে হয় অপরাধী কুমুদিনীর কাছে। অকারণে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—মাকে বল' আর ব'সে থাকতে হবে না। মা ব'লে পাঠিয়েছেন ম্যানেজারবাবুর কাছে জমিদারীর কাজ শিখতে। তাই শিখছি এখন।

—দিনমানে বুঝি শেখা যায় না ? এই অসময়ে ? অনন্তরাম শুধোয়।—মা ব'লেছেন এই রাত-দুপুরে জমিদারীর কাজ দেখতে ?

বেশী কথা বলতে যেন ইচ্ছা হয় না আর।

রিপন ষ্ট্রীট থেকে ফিরে চেয়েছিল নির্জ্জনতা, তার পরিবর্ত্তে অভিযোগ, বিদ্রূপ, গঞ্জনা আর জন-সমাগম। মন থেকে ধিক্কার আসে যেন জঘন্য এই পরিস্থিতির প্রতি। ম্যানেজারবাবু আবার বলতে শুরু করেন,—আগের দিনে হুজুর জমিদারীর জন্যে সরকারকে কেবলমাত্র রেভিনিউ দিতে হ'ত। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যখন চলাচলের সুখ-সুবিধার দরুন রাস্তা প্রস্তুত করতে লাগলেন, আদালত অফিস আর সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্যে বাড়ী তৈরী করতে লাগলেন—সেই সময় থেকে রেভিনিউয়ের ওপর পথকর, যাকে বলে আপনার হুজুর রোড-সেস্, আর পূর্ত্তকর বা পাবলিক ওয়ার্কস্-সেস্ ধার্য্য করলেন।

শুধু কৃষ্ণকিশোর নয়, আমলাদেরও কেউ কেউ এসে তখন দাঁড়িয়েছে সেখানে। ম্যানেজারবাবু যেন ছোট-খাটো সভায় বক্তৃতা করছেন, আর সকলে মনোযোগ সহকারে শুনছে তাঁর বক্তব্য।

কাছারীর দেওয়ালে জগদ্ধাত্রী, দশভুজা, শ্মশান-কালী, আর গন্ধেশ্বরীর রঙীন ছবি। পদ্মাসনা কমলা আর সুদর্শন-চক্রধারীর ছবি। আর একটা দরজার মাথায় ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্টের পাশাপাশি রঙীন ছাপা ছবি। দেব-দেবতার সমপর্য্যায়ে স্থান পেয়েছেন সসম্মানে। কাছারী-ঘরের তক্তাপোষের দু'পাশে কানা-তোলা দু'খানা পেতলের থালায় দু'টি দুর্গা-প্রদীপ জ্বলছে।

অন্দরে কুমুদিনীর কাছে সমাচার পৌঁছেছে।

তিনিও শুনেছেন কাছারীতে ছেলে শিক্ষানবিসী করতে ব'সেছে এখন।

ম্যানেজারবাবু নাকি বলছেন, আর ছেলে শিখছে। শুনেই তিনি ডাকালেন বিনোদাকে। সে তখন সবেমাত্র গালে গোটা-দুই পান পুরে পায়ে আলতা পরতে বসেছিল। ডাক শুনেই এসেছে প্রায় ছুটতে-ছুটতে। আসতেই ব'লেছেন কুমুদিনী,—তুই বুঝি আর থাকতে পারলি না, ছেলেটার কানে তুলে দিয়ে এলি কথাটা!

হাতে-হাতে ধরা পড়েছে বিনোদা। মুখে আর রা কাড়ে না। তাকিয়ে থাকে হতভম্ব হয়ে। কুমুদিনীর চোখে পড়ে বিনোদার পায়ে তাজা আলতা। বলেন,—ঘাটের দিকে পা, এখনও আলতা পরবার সাধও হয়! তুমি বিদেয় হও আমার বাড়ী থেকে। রাত কাটলেই যাবে, সকালে যেন আর দেখতে না পাই।

বিনোদা নাকে কেঁদে ফেলে যেন। বলে,—রাত নেই, দিন নেই, এঁটোর কাঁড়ি মাজতে মাজতে পা দু'খানা আছে নাকি! হাজা হয়েছে পায়ে, আলতা পরব' না?

কোন অজুহাত শুনতে চান না কুমুদিনী।

কারণ, ঐ বিনোদাকে নাকি তিনি হাড়ে-হাড়ে চেনেন। জানেন বিনোদার প্রকৃতি। নেহাৎ সহায়-সম্বলহীন, দুঃখী-তাপী, তাই আর দূর করতে পারেননি। কুমুদিনী ব'লেছেন,—তুমি আমার নজর-ছাড়া হও। এখান থেকে বিদেয় হও!

কথায় ধমকের রেশ পেয়ে বিনোদা আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে থাকেনি। চ'লে এসেছে নাকে কাঁদতে কাঁদতে।

ঘড়ি-ঘরের চোখ এড়িয়ে সময় পালাতে পারে না। প্রতি এক ঘণ্টার ব্যবধানে ঢং ঢং ধ্বনি আবার বাজতে শুরু হয়েছে এইমাত্র। বাজবে কতবার? কাছারীর নিয়ম, ঠিক এই মুহূর্ত্তে, ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। কাছারীর দরজা বন্ধ হয়ে

যায় রাত্রে এই নির্দ্ধারিত বিশেষ ক্ষণে।

এই দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার নিয়ত কর্ম্মসূচী পালিত হয় প্রতিদিন। প্রভাতে উন্মুক্ত হয়, আর রুদ্ধ হয় ঠিক এই মুহূর্ত্তে—ফাঁকি-মারা গোমস্তার দল যে মধু-মুহূর্ত্তটির জন্য সাগ্রহে চেয়ে থাকে কাছারী-ঘরের দেওয়ালের ঘড়িতে।

নিজেকে যেন লজ্জিত মনে হয় কুমুদিনীর।

এই রাতে ছেলে কাছারীতে গেছে শুনে মর্ম্মাহত হন যেন। অভি-সম্পাত করেন বিনোদাকে। নিরুপায় হয়ে ছেলের খাবারের সামনে ব'সে হাতপাখা চালনা করেন একা-একা।

ব্রাহ্মণী তখন রশুইশালার উনুনের ধারে ব'সে ব'সে গেরস্থের মোটা রুটি তৈরী করতে থাকে।

সদরের কাছারীর দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার নিয়ত কর্ম্মসূচীর ব্যতিক্রম হয় আজ। দরজা ক'টা খোলা থাকে। দীপ নেবানো হয় না। এই বংশের উত্তরাধিকারী বিষয়ের প্রতি এই প্রথম দৃষ্টিপাত করতে চেয়েছে। দিনের আলোয় চাইলে আর কোন বাধা ছিল না; চেয়েছে রাতের আলোয়, যখন চতুর্দ্দিক ঘন তমসাবৃত।

কিছুই নয়। শোক আর অভিমান।

লিলিয়ানের চলে-যাওয়া আর কুমুদিনীর কথায় মন যেন ভারাক্রান্ত। ম্যানেজারবাবু আবার কথা বলতে শুরু করেন। বলেন,—নবাব মীরজাফর হুজুর একটা পরোয়ানা জারী করেন এই বাঙলা দেশে। সেই পরোয়ানায় তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দেন কোম্পানীর হাতে বাঙলাকে তুলে দেওয়া হ'ল। পরোয়ানাটি হচ্ছে :

The purwana of the Nabob to the officials and

land-holders or the granted lands ends with these quaint words—"Know then ye Zaminders, Chaudharis, Talookdars, Mutsuddis, and Recayas of the chakla of Hooghly and others situated in Bengal the Celestial Paradise you are dependants of the Company and you must submit to such treatment as they give you, whether good or bad and this is my express injunction."

সেকালের হয়তো কোন পাদরীর তর্জ্জমা। যদিও নবাব জাফর আলি খাঁ খাস-উর্দ্দুতেই জারী ক'রেছিলেন ঐ পরোয়ানা। ম্যানেজারবাবুর যেন জমিদারীর বিষয় নখ-দর্পণে। জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তিনি জানেন। লেখাপড়াতেও নাকি তিনি দু'টো ডিগ্রী অর্জ্জন ক'রেছেন। আর, তা না হ'লে ইংরেজ সরকার তাঁর মত প্রার্থীকে নিযুক্ত করেন এই বকলমের এষ্টেট তদারক করতে? গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে?

ম্যানেজারবাবুর কথা যারা শুনছে তারা ইংরেজীতে খৈ ফুটছে দেখে কেউ-কেউ সেই ফাঁকে কেটে পড়লো। ম্যানেজারবাবু বললেন,—হুজুর, পরোয়ানাটি বিলি হয়েছিল সকল দেশের সরকারী অফিসে আর যাঁদের প্রতি এই হুকুম তাঁদের সদর কার্য্যালয়ে। তার পর হুজুর, অর্থাৎ আপনার গিয়ে লর্ড ক্লাইভ আর ওয়াট্‌সন যখন শেষ বারের মত বিজয়ী হ'ল তখন পুনরায় জমি বিতরণ করলে। সিরাজের কলকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মীরজাফর যে টাকা দিয়েছিলেন বাঙালীদের দাবীতে, সেই টাকা পেয়ে এবং আপনার গিয়ে কোম্পানীকে বাঙলা দখলের জন্যে যে যে বাঙালী সাহায্য করলে তাদের অনেকে রাতারাতি হুজুর দেওয়ান, জমিদার, মুন্সী, তালুকদার হ'য়ে গেল। তারাই হুজুর নন্‌-বাদশাহী। হাল আমলের।

ম্যানেজারবাবু কথার মাঝেই থেমে যান। তাঁর ওষ্ঠে যেন সামান্য হাসির উদ্রেক হ'তে দেখা যায়। তিনি আরও বলেন,—মীরজাফরের প্রদত্ত টাকা যাতে ঠিক ঠিক লোককে বিতরিত হয় সেজন্যে হুজুর ইংরেজরা একটা কমিশন তৈরী করেছিল বাঙালীদের নিয়ে। তাতে হুজুর আপনার গিয়ে নবাবের কলকাতা লুণ্ঠনের সময় যেসকল বাঙালী কলকাতা ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যাননি, ছিলেন, এই কলকাতাতেই ছিলেন, থেকে ইংরেজকে সহায়তা ক'রেছিলেন তাঁরাই হুজুর দাবী করলে প্রচুর টাকা! হুজুর কোমরটুলীর গোবিন্দরাম মিত্তির আর কলুটোলার শোভারাম বসাক, এঁরা দুজনেই একেক জন প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা নিয়ে নিলেন। আর হুজুর নিলেন গিয়ে রতন সরকার, শুকদেব মল্লিক, নীলমণি মিত্তির, নয়নচাঁদ মল্লিক, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি আরও কয়েকজন কলকাতার বিশিষ্ট বাঙালী।

ম্যানেজারবাবু খানিক থেমে আবার যেন হাসলেন। সে-হাসি উপভোগ করছেন তিনি নিজে। বললেন আবার,—তেনারা ছাড়া হুজুর, আর যারা-যারা পেলে, তারা ঐ গোবিন্দরাম আর শোভারামের আশ্রিত ও অনুগৃহীত লোকজনেরা। আর পেলে হুজুর, আপনার গিয়ে গোবিন্দ-রাম আর শোভারামের আশ্রিতা গণিকাগণ। যথা—রতন, ললিতা ও মতি বেওয়া। একেক জন পেলে হুজুর প্রায় সাড়ে চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা!

প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করলেই পারতেন ম্যানেজারবাবু। ইতিহাস বলতে গিয়ে বাঙলার কলঙ্কের ধ্বজাধারীদের লাম্পট্যের কথাটা না বললেও চলতো।

কুমুদিনী হাতপাখা দোলাতে দোলাতে ভাবছিলেন, কাছারীর আমলারা কি ভাবলো তাদের এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচীর ব্যতিক্রমের মূল কারণ

জেনে। কি অনুমান করলো তারা। ম্যানেজারবাবু এতক্ষণ ধ'রে কি এত মাথা-মুণ্ড শেখাচ্ছেন জমিদারীর কাজকর্ম। কি মন্ত্র আওড়াচ্ছেন!

ম্যানেজারবাবু বললেন,—এই পর্য্যন্ত থাক্ হুজুর আজ। আবার কাল দিনমানে আপনার গিয়ে জমিদারীর অনেক জটিল বিষয় আলোচনা হবে।

অনন্তরাম ইতিমধ্যে তিন বার ডাকতে গিয়ে থেমে গেছে। অনন্তরাম জানে আজ যেন বেঠিক হয়ে গেছে ছেলেটার মতি-গতি। কথায় যেন নেই সেই খুশীভরা চাঞ্চল্য। ম্যানেজারবাবুর কথা শেষ হ'তেই অনন্তরাম বললে,—মা ডাকছেন। বলছেন যে, রাত কত হ'ল সেদিকে খেয়াল আছে?

দুর্গা-প্রদীপের লেলিহান শিখা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ম্যানেজারবাবুর একটানা কথা শেষ হ'তেই নিস্তব্ধ হয়ে যায় কাছারী-ঘর। দেওয়াল-ঘড়ির অবিরাম টকাটক শব্দ ব্যতীত কিছুই শোনা যায় না। ঝাঁক ঝাঁক মশা উড়তে থাকে।

অনন্তরাম রিপন ষ্ট্রীটের ঘটনাটা দেখেছে নিজের চোখে। অথচ বোঝেনি কিছুই। অনুমান করেছে কিছু-কিছু। দেখে-শুনে যতটা বুঝেছে, তাতে আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস হয় না অনন্তরামের। কৃষ্ণকিশোর তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে পড়ে অনেক জ্ঞান অর্জ্জনের শেষে। তবুও কৈ মুখে তো খুশীর হাসি ফুটে উঠলো না! কেন, তা শুধু ঐ অনন্তরামই জানে।

বিশ্বাসঘাতক নবাব মীরজাফরের পরোয়ানা শোনালেন ম্যানেজার-বাবু। শোনালেন বাদশাহী আর নন্-বাদশাহীর পার্থক্য। শোনালেন আরও কত কি—রতন, ললিতা ও মতি বেওয়ার নাম।

অন্দরের মুখেই দেখা হ'ল মা'র সঙ্গে।

তিনি আর থাকতে না পেরে সদরের কাছ বরাবর চলে এসেছেন। তাঁর মুখখানা যেন সঙ্কোচে শুষ্ক হয়ে আছে। মাকে দেখে কোন কথা বলে না ছেলে। নত মাথায় চ'লে যায় অন্দরে। রসুইশালায় গিয়ে বসে থালার সামনে। খায় কি না-খায়, জলের পাত্র মুখে তুলে উঠে পড়ে খানিক বাদেই।

কুমুদিনী এক পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। অপলক দেখেন। মাতা এবং পুত্রের মধ্যে একটিও বাক্য-বিনিময় হয় না। মা ব্যথা পান মনে-মনে, ছেলে গাম্ভীর্য্য পালন করে।

কুমুদিনীও খান কি না-খান। যে-যার ঘরে চ'লে যায়। রাত ওদিকে ঘন হয় ক্রমে ক্রমে। ভোঁ-ভোঁ শব্দে মশার দাপাদাপি শুরু হয়। ধীর, মন্থর পদে রাত্রি এগিয়ে চ'লেছে। রাত্রি গেলে আসবে দিন। রাত্রির পরেই দিন। হাসি আর কান্না, সুখ আর দুঃখের মতই রাতের শেষে দিনের আবির্ভাব!

থেকে থেকে আকাশে কালপেঁচা আর শহরের আনাচে-কানাচে শিবাকুলের ঐকতান হচ্ছে। কয়েকটা বিশেষ অঞ্চলকে জাগিয়ে রেখে শহর কলকাতা যেন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে। দিকে দিকে অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে।

চৈত্র কি শেষ হ'ল?

দিগ্‌ভ্রান্ত বাতাস। শীর্ণ পাতার মর্ম্মরধ্বনি। নাম-না-জানা পাখীর কূজন। গাছের শাখায় শাখায় কচি কিশলয়। এই নূতনের খেলার মাঝে পুরাতনের রহি-রহি দীর্ঘশ্বাস। বিলাপ-উচ্ছ্বাস! পুরাতন চ'লে গেল অনন্তের আহ্বানে। সময়, কারও ছলনায় সে ভোলে না। স্বর্গ আমন্ত্রণ জানায়, মৃত্যু ধাবিত করে, নরক ভয় দেখায়,—সময় কিছু করে না,

শুধু সে পালায়। সম্মুখে ধায়, পিছনে না তাকায়। গোলাপী কপোল, রক্তরাঙা ওষ্ঠাধর, তারার মত জ্বলন্ত চোখ—সময়ের করাল গ্রাসে বিনষ্ট হয়ে যায়—আর সেই বেগবান জোয়ারের উত্থান-পতনে কেউ ভেসে যায়, আবার কোথাও বা জাগে অজানা চর। কারও কপালে সময়ের শব্দহীন পদক্ষেপের চিহ্ন—বলিরেখা দেখা দেয়; কারও বা যৌবন ফুটে উঠলো! ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহের মত সময়ের চাকাও ঘুরছে!

পক্ষকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। চৈত্রের শেষে এসেছে বৈশাখ।

মধ্যাহ্ন-আকাশে সেই বৈশাখের দীপ্তচক্ষু। দিগ্বিদিক্ ধূলায় ধূসর। শহর কলকাতা যেন বিরাট এক চিতার মত জ্বলছে! বাতাসে লেলিহান অগ্নিশিখা। বাগানের কোন্ গাছে কখন থেকে ডাকছে এক নাম-না-জানা পাখী। দরজার খসখস কতবার জলসিক্ত ক'রে দিয়ে গেছে তাঁবেদার। তবুও ক্ষণে ক্ষণে শুকিয়ে যায় খসখস। কাছারীতে শুধু কাজ চলছে নীরবে। সারি-সারি চিলের পালকের কলম, আমলাদের হাতে। আঁচড় তুলছে কাগজের বুকে। কাছারী-ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা শুধু টকাটক শব্দে বেজে চলেছে অবিরাম।

ঘেরাটোপে-ঢাকা একটা পাল্কী হন-হন করতে করতে ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা অন্দরে চলে গেল। চার-দু'গুণে আট পাল্কীদারের ঘর্মাক্ত কলেবর। যন্ত্রের মত চলে পেশীগুলো নাচিয়ে।

আজ একাদশী।

কুমুদিনী গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। একাদশীর উপবাস ভঙ্গের আগে আবার যাবেন আগামী প্রত্যূষে। এখন পাল্কী থেকে নেমে খাস-মহলে চ'লে যাবেন। রাত্রি শেষ না হ'লে ত্যাগ করবেন না ঘর। একাদশীতে রসুইশালাতে আর যান না। ঘ্রাণের দ্বারা অর্দ্ধভোজন হয়ে যাবে যে!

মায়ের পাল্কী আসতে দেখেছিল কৃষ্ণকিশোর। পাল্কী অন্দরে চলে যাওয়ার পর বৈঠকখানায় ঢুকলো। কুমুদিনী গঙ্গাস্নানে গেলে মন যেন আর ঠিক থাকে না। মা যদি ভেসে যায় গঙ্গার জলে, বেয়ারাদের হাত ফস্‌কে! কুমুদিনী ভেতরে থাকেন আর ঐ বেয়ারাগুলো পাল্কী চুবিয়ে নেয় গঙ্গায়। তাও একবার নয়, অনেক বার। আর তাতেই যত আশঙ্কা। মা-হারানোর ভয়।

অনেক দিন ঐ আলোর ঝাড়ের দোল দেখা হয়নি।

দেখা যায়নি রঙের বাহার, শোনা যায়নি টুং-ঠাং ঐ কাচকাটির। আলো দুলিয়ে দেয়। ঝনন্-ঝনন্ শব্দ হয়। খসখস-ভেদী অল্প আলোয় হরেক রঙের আভা দেখা যায়। পলে-পলে রঙ বদল হচ্ছে কাটা-কাচের। ফরাসে আর এলিয়ে পড়ে না অন্য দিনের মত, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ঐ আলোর দিকে।

আহারাদি ক'রে গালে পানের গুলি পুরে অনন্তরাম হাজির হয় খসখস সরিয়ে। টানা-পাখার আওতায় এসে বলে,—ইস্, গরমটা কি দেখেছিস! গা যেন জ্বলছে! তবুও এ ঘরখানা সে-তুলনায় ঢের শীতল। বাইরে বসে কার বাপের সাধ্যি! লু দিচ্ছে যেন।

সত্যিই শোঁ-শোঁ শব্দ আসছে বাইরে থেকে। শন-শন হাওয়া বইছে এলোমেলো। ধূলো উড়ছে শুকনো পাতাকে আগিয়ে নিয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—অনন্তদা, বাইরে এখন ভীষণ গরম, নয়?

এ-গালের পান ও-গালে নিয়ে যায় অনন্তরাম। বলে,—ইস্, সে আর বলতে! গা যেন চড়-চড় করছে। মাটি ফেটে চৌচির! এক ফোঁটা বিষ্টির নাম-গন্ধ নাই? কথা বলতে বলতে দোক্তার পিক্ গিলে ফেলে। বলে,—কেনে, এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে কি বাইরে যাওয়া হবে?

আরেক বার প্রায়-থেমে-যাওয়া আলোর ঝাড় দুলিয়ে দেয় সে।

ফরাসে ব'সে পড়ে একটা তাকিয়া টেনে। বলে,—না, হ্যাঁ, ভাবছিলাম অরুণদের বাড়ীতে একবার যাবো, অনেক দিন অরু' আসেনি। কি ব্যাপার কে জানে!

চোখে যেন অন্ধকার দেখে অনন্তরাম। ঘরের বাইরের চড়া রৌদ্রের কড়া তেজ যেন সে অনুভব করে সর্ব্বাঙ্গে। আর একটা ঢোঁক গিলে নেয়। বলে,—অরুণের বাড়ীতে আবার কেনে? যার জন্যে যাওয়া সে তো চলে গেছে! আমি কি আর বুঝিনা কিছু? কথা বলতে বলতে ক্ষীণহাসি হাসে অনন্তরাম।

সোজাসুজি কথা বলে অনন্তরাম। একেবারে যেন মনের কথাটি সে ব'লে দেয়। মিথ্যা কথা বলে না অনন্তরাম। যে ছিল সে তো চলেই গেছে, তবে আর কেন যাওয়া? শূন্য মন্দিরে গিয়ে কি হবে? সে-কথার উত্তরে কিছু আর বলে না কৃষ্ণকিশোর। ব'সে থাকে কড়িকাঠে চোখ তুলে। হরেক রঙের চিকন দেখে প্রতি মুহূর্ত্তে। দেখা দেয় আর বিলীন হয়ে যায় রঙের খেলা।

কি কথা মনে পড়ে কে জানে, অনন্তরাম হঠাৎ হাসতে শুরু করে। অর্থপূর্ণ শব্দহীন হাসি। পান-রাঙা দাঁত দেখিয়ে হাসতে হাসতেই বলে,—সকাল থেকে আজ এমন সানাই বাজে কেনে বল্ তো?

—সানাই! সানাই আবার কোথায় বাজলো?

কৃষ্ণকিশোরের কথায় কৌতূহল। খানিক বা বিস্ময়। সানাই বেজেছে, কৈ তার কানে পৌঁছয়নি। কাদের বাড়ীতে সানাই বাজলো। কোন্ উৎসবে?

অনন্তরাম জোর ক'রে হাসি চেপে বললে,—সে কি, সানাই তো তোমার সেই ভোর থেকেই বাজতে শুরু ক'রেছে! শোন' নাই? উদিগে কান নাই তো শুনবে কোত্থেকে!

সানাই বেজেছে, তাতে কি যায়-আসে। নাই বা শুনলো। কিন্তু তবুও অনন্তরামের কথায় যেন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত। বললে,—বিশ্বাস না হয়তো ঘরের বাইরে যেয়ে শুন্ গে না।

পাড়া-প্রতিবেশী কার বাড়ী থেকে সত্যিই তখন সানাইয়ের করুণ রাগিণী ভেসে আসছে। প্রখর সূর্য্য মধ্যাহ্ন-আকাশে। উষ্ণ বাতাস। শুষ্ক এই আবহাওয়ায় সুরের লহরী! এই কাঠ-ফাটা রৌদ্রে?

আর সানাই যদি বাজে তাতে তার কি? তবুও অনন্তরাম ঐ শব্দ-রাগের কি যেন একটা গোপন অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রেছে—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৃষ্ণকিশোরের জানা না-জানার প্রয়োজন। লিলিয়ানের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় যেন তার চোখের দৃষ্টি আর কানের সজাগতা লোপ পেয়ে গেছে। মনের সঙ্গোপনে কোথায় যেন ছিঁড়ে গেছে এক সূক্ষ্ম তার। নিদারুণ এই শোকের উচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে অন্তরের অনুভূতি। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে যেমন ছত্রভঙ্গ হয় পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ, দুর্য্যোগের ঝঞ্ঝায় বিচ্ছিন্ন হয় বৃক্ষশাখা,—আকাশের তারা থাকে স্থির আর অচঞ্চল—লিলিয়ানের মুখটা যেন তেমনি জেগে আছে তার মনে। লিলিয়ানই শুধু মনোরাজ্য অধিকার ক'রে ব'সে আছে।

সানাইয়ের রাগ কানের ভিতর দিয়া পৌঁছয়নি মরমে। অনন্তরাম উবু হয়ে ব'সে পড়ে তক্তাপোষের কাছাকাছি, ঘরের মেঝেয়। বলে,—কাদের বাড়ীতে বে-থা হচ্ছে হয়তো! এই বোশেখে লগ্ন আছে যে গোটা-তিনেক।

বে, বিয়ে, বিবাহ। অনন্তরামের কথা তার কানে যায় না। কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছে অরুণেন্দ্রকে। তার বিসদৃশ চাল-চলন, হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তা। অদ্ভুত ফিরিঙ্গী আদব-কায়দা। অসামঞ্জস্য লক্ষ্য ক'রেছে সেই প্রথম আলাপের মধু-মুহূর্ত্ত থেকে। পাঠশালার আলাপী

ছেলেদের মধ্যে একজনকেও দেখেনি এমনটি। ইংরেজীর নাম শুনলে ঘৃণায় জিব কেটেছে তারা। উপহাস ক'রেছে কৃষ্ণকিশোরের এ্যালবার্ট ফ্যাশনের চুল দেখে। মাথার শিখা দেখিয়ে বলেছে,—আছে তোমার ?

—চৈতন্য, শিখা, টিকি ? বলতে বলতে ছেলের দল গড়িয়ে প'ড়েছে হাসতে হাসতে।

অনন্তরাম কি বলতে চায়। কেন এমন হাসে, অর্থপূর্ণ হাসি !

সানাই, বিয়ে, বিয়ের লগ্ন। অনন্তরাম আবার বললে,—আশেপাশে কাছাকাছি কার বে হচ্ছে। ছেলের না মেয়ের, কে জানে !

কথার শেষে আবার একটু হাসলো অনন্তরাম। কি যেন বলতে চাইলো, বোঝা গেল না। বৈঠকখানার দেওয়ালে ছিল একটা বাঙলা দেওয়াল-পঞ্জিকা। চিৎপুরের কোন মসলা-ব্যবসায়ীর বিজ্ঞপ্তি। নাম-ঠিকানা আর নিজেদের মাল-মসলার উৎকৃষ্টতার লাখ কথা।

ঐ দেওয়াল-পঞ্জিকার তারিখ দেখেই হয়তো স্মরণে আসে।

ম্যানেজারবাবু আজ দিন বারো-তেরো এখানে আর নেই। কার্য্য-ব্যপদেশে বিহারে যেতে হয়েছে তাঁকে। চণ্ডীমহল মৌজার তহশীল থেকে পত্র পেয়েই তিনি চলে গেছেন। খাজনা ও সেস্ দেওয়ার দিন এসে গেছে। সামনেই কিস্তি দেওয়ার দিন। সূর্য্যাস্ত-কাল পর্য্যন্ত দাখিল করা যায়। অতঃপর আর যায় না।

প্রজা-উপেক্ষিত সেই সুবিখ্যাত সূর্য্যাস্ত আইন, টিপু সুলতান-বিদ্বেষী সেই চার্লস ফার্ষ্ট মারকুই লর্ড কর্ণওয়ালিশের দান।

তৌজির খাজনা ফেল হ'লে আর রক্ষা নেই। মহানুভব সরকার তখন আর ক্ষমা করবেন না। গেজেটে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্দ্দিষ্ট

দিন ধার্য্য ক'রে নীলাম ডাকবেন। তালুক-কে-তালুক বিকিয়ে যাবে। বেহাত হয়ে যাবে।

তবে, এই বকলমের এষ্টেট তদারক করেন স্বয়ং সরকার। যন্ত্রের মত কাজ হয়ে যায় প্রতি তহশীলে।

জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিখতে বলেছিলেন কুমুদিনী। বিহার যাত্রার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত পাখী-পড়া ক'রে শিখিয়েছেন ম্যানেজারবাবু বাদশাহী আর নন্‌-বাদশাহীর তফাৎ শুধু নয়, আরও অনেক কিছু। এক দিনে অধিক বললে পাছে ভ্রম হয় সেজন্য একেক দিনে একেক বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক'রেছেন। দশশালা বন্দোবস্তের পরে চাকরান জমি কি ভাবে মালগুজারি জমিতে পরিণত হ'ল বলতে গিয়ে, জমিদারীর প্রকৃত মালিকের ক্ষমতার সীমানা কতটা তাও শিখিয়েছেন। কৃষ্ণকিশোর নিবিষ্টচিত্তে শুনেছে আর ম্যানেজারবাবু একে একে ব'লে গেছেন—

প্রথমতঃ, নির্দ্দিষ্ট খাজনা অবধারিত কিস্তি মোতাবেক কালেক্টরিতে দাখিল করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারেশানক্রমে জমিদারী উপভোগ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, মালিক ইচ্ছানুসারে জমি দান, বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ, মালিক ইচ্ছানুসারে পত্তনি, মৌরশী, মকররি প্রভৃতি অধীন স্বত্বের সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

চতুর্থতঃ, সনন্দ দ্বারা নিষ্কর, চাকরান প্রভৃতির সৃজন করিতে পারিবেন।

পঞ্চমতঃ, প্রজাবর্গের নিকট হইতে আপোষে বা আইনের সাহায্যে কর আদায় করিতে পারিবেন।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছে কৃষ্ণকিশোর। ম্যানেজারবাবুর জ্ঞানের পরিধি দেখে শ্রদ্ধায় মন তার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাঁর প্রতি।

তা ছাড়া মনে যে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তাও সে স্বেচ্ছায় জিজ্ঞেস ক'রেছে। কাছারীতে এই যে এত লোক, এত বিভাগে কলম পিষছে দিবারাত্র—তারা কে, কেন রয়েছে জানতে চেয়েছে সে। ব'লেছে,—আমিন, জমানবিশ, খাতাঞ্জী, মোক্তার, মহাফেজ, মুন্সী প্রভৃতিদের পরিচয় কি ?

শুনে মৃদু হেসেছিলেন ম্যানেজারবাবু। বলেছিলেন,—শুনে অতি খুশী হলাম হুজুর। একে একে শুনুন তা হ'লে বলি। সমস্ত আদায় ওয়াশীলের কাগজ পরীক্ষার জন্য আমিন সেরেস্তার প্রয়োজন হুজুর। জমা বিষয়ক সমুদয় রেজেষ্ট্রী রাখা এবং মফঃস্বলের আদায় ওয়াশীলের ওপর control রাখার জন্য জমা সেরেস্তা। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য হুজুর আপনার গিয়ে খাতাঞ্জী সেরেস্তা। তার পর হুজুর, আপনার গিয়ে মকদ্দমা-সংক্রান্ত রেজেষ্ট্রী রাখা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করার জন্য মকদ্দমা সেরেস্তার আবশ্যক। জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজাত ও দলিলাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হুজুর আপনার গিয়ে মহাফেজ সেরেস্তা। সদর এবং মফঃস্বলের মধ্যে পত্র ব্যবহারের জন্য, অর্থাৎ আপনার গিয়ে correspondenceএর নিমিত্ত মুন্সী সেরেস্তার একান্ত প্রয়োজন হুজুর।

বুঝতে সকল কিছু না পারলেও মন দিয়ে শুনেছে সে। ম্যানেজারবাবু বলেছেন অত্যন্ত সহজ ভাষায়। হেমনলিনী আগে আগে যেমন ছড়া কেটে-কেটে শোনাতেন, প্রায় সেই রকম গল্পের ছলে ব'লে গেছেন ম্যানেজারবাবু। চণ্ডীমহলে পুণ্যাহের দিন প'ড়েছে। মা গঙ্গা এবার নাকি মুখ তুলে চেয়েছেন। অসংখ্য চর মাথা তুলেছে চণ্ডীমহল তহশীলের সীমানায়। চতুর্গুণ নিরিখে বিলি হয়েছে সেইসব জমি। পুণ্যাহ তাই পৌষ-লক্ষ্মীতে না হয়ে বৈশাখেই অনুষ্ঠিত হবে। ম্যানেজার-বাবুর সেই আদেশ-পত্র সই হ'তে পাঠিয়েছেন কলকাতার সদরে।

আদেশ-পত্রটির লেফাফায় লেখা আছে, বহুল সম্মানপুরঃসর মমানুগ্রাহক মদেকান্তসদয় প্রবল প্রতাপেষু, ইত্যাদি। আদেশ-পত্রটি এইরূপ :

শ্রীহরি শরণং চণ্ডীমহল কাছারী

১২৮৫ সালের ১১ই বৈশাখ

পত্র নং ৬

বিহার প্রদেশে মদীয় জমিদারী ৫৮৭ নং তৌজির মহাল লাট রঘুনাথপুর খোরারী ওরফে রঘুনাথপুর বরারী ও ৫৯০ নং তৌজির মহাল মৌজে চণ্ডীমহল বরারী কলম আওয়েল ও ৩৩৪৬ নং তৌজির মহাল মৌজে চণ্ডীমহল বরারী কলম দুয়ের দিগরের বকলম এষ্টেটের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার শ্রীগুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখনং আগে উক্ত মহলের ফসলী সাল ১২৮৪ সালের কর গ্রহণের শুভ পুণ্যাহের দিন আগামী ২৩শে বৈশাখ রবিবার বেলা ৭।৩০ মিনিট হইতে ৯।৩০ মধ্যে দিন ও সময় নির্ণয় করিয়া লেখা যায় আপনি নিয়মানুসারে সাধারণ প্রজাবর্গকে নিমন্ত্রণ করতঃ উক্ত শুভ দিনে শুভ নিয়মানুসারে পুণ্যাহ পূজাদি সমাপনান্তে শুভক্ষণে শুভ পুণ্যাহ করা হইলে এবং পুণ্যাহের আদায়ী বকেয়া শোধ ও হাল সালের টাকা কলিকাতা সদর অফিসে যাহাতে সদস্তকরণ হুজুর বসেন এবং লাগোয়া বাড়ীতে বসবাস করেন, সেইখানে চালান দিবেন। কামনা দধি-মৎস্য সহ পাঠাইবেন।

চিঠিতে যে সব কথা জানিয়েছেন তা প্রতিপালিত করবেন কলকাতার সদর কার্য্যালয়ের নিযুক্ত নায়েব মশাই। কৃষ্ণকিশোর শুধু একটা সই করবে আমন্ত্রণ-পত্রে। তাতেই প্রথম বারে কত আনন্দের অশ্রু পড়েছিল কুমুদিনীর চোখ থেকে। ছেলে তো নামটাও সই করতে শিখেছে!

অনন্তরাম টানা-পাখার আওতায় একটু বা ঢ'লে পড়ে তন্দ্রায়। দেওয়াল ঘেঁষে বসে। কি মনে হয়, কৃষ্ণকিশোর ঘরের বাইরে যেতে চায়। খসখসী-টাট্টির অন্ধকার থেকে আগুনের হলকায়। বাইরে সোঁ-সোঁ শব্দ; বৈশাখী হাওয়ায় হাসছে যেন কাঠ-ফাটা রোদ্দুর। পুড়ে যাচ্ছে যেন গাছপালা, পথঘাট, ঘরবাড়ী।

গ্রীষ্মকালে কুমুদিনী জলসত্রের ব্যবস্থা করেন।

ফটকের একপাশে হোগলার একটা ছাউনী পড়ে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা তৃষা নিবারণের আস্তানা পায়। ছোলা, গুড় আর শীতল বারি বিতরিত হয়। যে আসে সেই পায়।

বৈঠকখানার সামনে প্রশস্ত দালান। সামনে সোজা ফটক।

ঘর থেকে বেরিয়ে সেই দালান থেকে ফটক শুধু নয়, সম্মুখের অপর দিগন্ত চোখে পড়ে। গাছের সারি আর ইটের তৈরী বাড়ী। মধ্যাদিনের সূর্য্যতেজে ঝলসে যাচ্ছে যেন। কৃষ্ণকিশোর আকাশে চোখ মেলে। শুভ্র অনন্ত আকাশ। কয়েকটা চিল শুধু স্থির ডানা ছড়িয়ে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে উড়ে নয়, যেন চ'রে বেড়াচ্ছে অতি ধীর-গতিতে। গোমস্তাদের একজন প্রায় ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ এসে উপস্থিত। কাছাকাছি এসে বললে, —হুজুর, থাকবেন না এখানে। চলে যান শীঘ্রি! একেবারে অন্দরে চলে যান।

বিস্ময় নয়, অত্যন্ত ভীতু মনে হয় লোকটিকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কেন বলুন তো? কি হয়েছে কি?

কানের কলমটা খ'সে পড়ে যায় লোকটির তাড়াহুড়ায়। কলম তুলে পুনরায় বলে,—হুজুর, পূর্ণবাবু আসছেন হুজুর। আপনি চলে যান এখান থেকে। শীঘ্রি যান হুজুর, দেরী করবেন না। শেষটায় কি একটা—

এতক্ষণে ব্যাপারটা ঠাওরাতে পারে। কৃষ্ণকিশোর বলে,—আচ্ছা,

আমি যাচ্ছি। দেখবেন, একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবেন না যেন! তিনি কি মদ্যপান ক'রেছেন?

—হুজুর, সে আর শুনে কাজ নেই। একেবারে চুর যাকে বলে। আপনি অবিলম্বে অন্দরে চ'লে যান। লোকটি যেন সত্যিই ভয় পেয়েছে। দেখছে ইদিক-সিদিক। দেখছে মালিককে দেখতে পেলেন কিনা পূর্ণবাবু।

বড়বাড়ীর বড়বাবু। সকলের যিনি অগ্রজ। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। শহর কলকাতার নামজাদাদের একজন চাঁই বললেও হয়তো ঠিক বলা হবে না। সকাল থেকে জল পান করেন না পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। যা পান করেন তার নামের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। দেশী-বিলিতী যখন যা পান।

কেন কি কারণে বেলা বারোটা থেকে একেবারে বেঠিক হয়ে গেছেন। দাঁড়াতে পারছেন না, প'ড়ে যাচ্ছেন টলতে-টলতে। তিনি জ্যেষ্ঠ, তাই তাঁর দাবী অগ্রগণ্য। এই তাঁর বক্তব্য যে তিনি যা করবেন তাই হবে। যা বলবেন, তাই।

কাছারীতে ঢুকে তচনচ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ! গোমস্তারা হেই-হেই ক'রে ছুটে এসেছে। সামলেছে পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণকে। আর তিনি একেবারে গলা ছেড়ে কাঁচা খিস্তি করতে শুরু ক'রে দিয়েছেন বেমালুম।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণর আকৃতি অদ্ভুত। দৈর্ঘ্যে অত্যন্ত খর্ব্ব হ'লেও প্রস্থে কত তা কেউ মেপে দেখতে সাহসী হয়নি এখনও পর্য্যন্ত। অবশ্য খেয়াল হলে তিনি নাকি স্বীকার করেন কখনও সখনও যে, তিনি ঠিক যেন ঐ মদের পিপের মত। যার মনে যা ধরে; তিনি মদের পক্ষপাতী অর্থাৎ তাই পিপের কথাই মনে হয়েছে তাঁর।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ এক নারীর প্রতি গভীর আকর্ষণে আকৃষ্ট। শহরের বাবু-মহলে অনেকেই জানেন, কোন এক নারীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে নাকি আবদ্ধ। এক কড়া-ক্রান্তিও খরচের নাকি নামগন্ধ নেই, সেই নারীই ভুলিয়ে রেখেছে। পূর্ণেন্দ্র কেবলমাত্র জড়োয়া গয়না দেখিয়ে মনোহরণ ক'রেছেন সে-নারীর। সেই নারীর নাম নাকি পূর্ণেন্দ্রর ডান হাতে উল্কীর নক্সার ভেতরে লেখা আছে। ফুল্লরা, না ঐ ধরণের কি একটা নাম।

ফুল্লরাকে পূর্ণেন্দ্র নীলকান্ত মণির আঙটি উপহার দিয়েছেন। ছাঁকা পান্নার বালা। মুক্তার শেলী। হীরে-পান্নার সেফ্‌টি-পিন্। চুণীর কণ্ঠী। হীরের ঝাপ্‌টা।

তিনি জ্যেষ্ঠ সেই অজুহাতে স্বর্গতা পিতামহী, প্রপিতামহীর অঙ্গের গয়না নাকি যাকে-তাকে বিলিয়ে দেওয়ার অধিকারও তাঁর আছে।

সেই গয়না পরিয়ে ফুল্লরাকে সঙ্গে নিয়ে একেক রাতে হয়তো বা নিজেদের বাড়ীতেই হাজির হয়েছেন পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। গৃহে পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণের পরমাসুন্দরী স্ত্রী। তিনি মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়ে গেছেন ফুল্লরাকে চোখের সামনে দেখে।

কৃষ্ণকিশোরের প্রতি তাঁর আক্রোশের কারণ—এই বালকের যদি কোন প্রকারে মৃত্যু ঘটে, তাতে নাকি পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণের প্রচুর লাভ। সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারেন তিনি—এই তাঁর ধারণা।

মদের নেশায় কি করেন, কি বলেন, সেই ভেবে অন্দরে চলে যায় কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম তখনও ভোঁস-ভোঁস ক'রে নাক ডাকায়। ঘুমোয় অঘোরে। কিছুই জানতে পারে না। আর উজবুকটা তখনও হুজুর ঘরে আছেন

অনুমানে টানাপাখার দড়ি টেনে যায় অবিরাম। প্রায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে। আর কঁ্যাচ-কঁ্যাচ শব্দ হয় বৈঠকখানায়।

অন্দর থেকে সদরের বাক্যালাপ কেন, চেঁচামেচিও শোনা যায় না।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে যান ফটকের বাইরে। দুজন পাইক তাঁকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যায়। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ গেলেন বলতে বলতে,—দেখে নেবো না উল্লুকের বাচ্ছাকে! শালা আমাদের জমিদার হয়েছে, কিশোর শালা কিনা জমিদারীর মালিক? ফুঃ—

বলতে বলতে হঠাৎ পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ হো-হো শব্দে অট্টহাসি শুরু করলেন। যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে পড়লেন ফটকের কাছ বরাবর। খাতাঞ্চীদের একজন তামাসা দেখছিল সহাস্যে। নাম তার ফটিকচাঁদ দাস। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ তার দুই গাল দু' আঙুলে ধ'রে বললেন,—কি হে দোস্ত! হুজুর কোথা?

ফটিকচাঁদ চার হাত পিছিয়ে গিয়ে বলে,—কি জানি, হুজুর হয়তো অন্দরে আছেন।

শুনে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। চলে যেতে-যেতে বললেন, —হুজুরকে জানিয়ে দিও, ভবিষ্যতে আর মুখ দেখাতে হচ্ছে না সমাজে। হ্যাঁ হ্যাঁ! এমন ব্যবস্থা করেছি, শালাকে আর শ্বশুর-ঘর করতে হচ্ছে না আর! 'কাতুকুতু' কাগজে কেচ্ছা ছাপিয়ে দেবো তোমার হুজুরের নামে, দেখবে, বে হবে না। শালা কিনা জমিদার হয়েছে!

কথার শেষে আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে থাকলেন না পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। টলটলায়মান অবস্থায় ফটকের বাইরে চলে গেলেন। ফটিকচাঁদ মন্তব্য শুনে শুধু বললে,—যে আজ্ঞে। হুজুরকে জানিয়ে দেবো।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণের বিদায় গ্রহণে কাছারীর মানুষ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় ঢং-ঢং শব্দে চারটে বাজলো।

ঘরে ব'সে থাকতে মন চায় না। দিকে-দিকে যেন বহ্নি বহে।

কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। টম্ ঘরের এক কোণে একটা কেদারার তলায় চুপটি ক'রে ব'সে থাকে। লালাসিক্ত জিহ্বা তার বেরিয়ে প'ড়েছে। ঘন-ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে টম্। উত্তাপের বিভীষিকা আর দাবানলের প্রবাহে কাতর হয়ে প'ড়েছে।

যখন তখন বড় বেশী মনে পড়ছে অরুণেন্দ্রকে আজ।

কেমন আছে, কি করছে এখন কে জানে! হিন্দু-কলেজে পড়ছে কি? না উড়ো-খৈ বাউণ্ডুলের মত সময় নেই অসময় নেই, যখন-তখন ঘুরছে পথে-পথে। একমাত্র যে সঙ্গী ছিল তার, সেই লিলিয়ান তো চলে গেছে স্বর্গে। আর কে আছে। নর্ম্মান বিনয়েন্দ্র, অরুণের পিতা?

ফার্ষ্ট বুক প'ড়ে থাকে বিছানায়। পাতা-খোলা অবস্থায়। কৃষ্ণকিশোর চটি জুতোর শব্দ না ক'রে সন্তর্পণে সদরে চলে যায়। তার ঘরের খানকয়েক ঘরের পরেই কুমুদিনীর ঘর। তিনি একাদশীর উপবাস ক'রে হয়তো এখন নিদ্রা যাচ্ছেন।

না, কুমুদিনী এখন একখণ্ড হালের 'বঙ্গদর্শন' পড়ছেন। কি এক ধারাবাহিক উপন্যাস চ'লেছে। পড়ছেন সাগ্রহে।

সদরে যেতেই দেখতে পায়, অনন্তরাম হাই তুলতে তুলতে বৈঠকখানা থেকে বেরোচ্ছে। রৌদ্রের প্রখরতায় ঘুমভাঙ্গা চোখ দু'টো বন্ধ ক'রে ফেলে। কৃষ্ণকিশোর তাকে দেখেই বললে,—অনন্তদা, কি ব্যাপার হয়ে গেল দেখলে না? প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোলে!

চোখ খুলে বলে অনন্তরাম,—কি হ'ল আবার?

কৃষ্ণকিশোর হাসতে হাসতে বললে,—পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ এসেছিলেন। আমি তো ভেতরে চলে গেলাম। কখন্ গেছেন কি জানি!

টুস্‌কি দিতে-দিতে আর একটা হাই তুলে জিজ্ঞেস করলে অনন্তরাম,—মত্ত অবস্থায় ছিলেন তো?

—তাই তো শুনলাম। কৃষ্ণকিশোর বলে,—আমার নাকি খোঁজ ক'রেছিলেন খাতাঞ্জী বললেন।

—আস্ত খেয়ে ফেলে নাই তো? কথার শেষে চলতে শুরু করে অনন্তরাম। মুখে-চোখে জল দিতে যায়।

কথা শুনে হেসে ফেললো সে। অনন্তরাম অদৃশ্য হ'তে সম্মুখের আকাশের দিকে চোখ তুললো।

হের প্রিয়ে গ্রীষ্ম ভয়ঙ্কর!

হুত হুতাশন। তীক্ষ্ণকর দিনমণি। প্রচণ্ড বাতাসে ধূলি উত্তলিছে গগনে। বাতাসে অনল; শুষ্কপত্র ঝরে। শুষ্কপর্ণ শাখা, দগ্ধ-তৃণাঙ্কুর আর কচি কিশলয়। শন্‌-শন্‌ শব্দ। পিপাসায় পথিকের শুষ্ক কণ্ঠ। মদন মাদন এই ঋতুর বিভব, শুধু যামিনীতে কামিজন করে অনুভব।

এক বিন্দু জল। দাও এক কণা ছায়া। জলসত্রে আর্ত্ত মানুষের আগমন।

খানিক বাদে অনন্তরাম কখন্‌ এসে পেছন থেকে বলে,—সানাই শুনছিস্‌?

এতক্ষণে যেন কানে পৌছয় শব্দ।

সত্যিই সানাই বাজে কোথায় এই অগ্নিময় বিভীষিকায়। রাগ-রাগিণীর খেলা চলে বাঁশীতে। বেলা-শেষে পূরবীর সুর ধরে সানাইওলা। স্তব্ধ হয়ে শোনে যেন এ অঞ্চল। কার বাড়ীতে উৎসব কে জানে!

অনন্তরাম বললে,—মা'র সঙ্গে কথা বলেছিস্‌ আজ?

হেসে ফেললো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—না, তিনিও কথা বলেননি। পায়চারি করতে শুরু করে সে, সদরের দালানে। এদিক থেকে ওদিকে

যায়, আবার ওদিক থেকে ইদিকে আসে। টম্ ছুটতে ছুটতে আসে ভেতর থেকে। দাঁড়ায় না, ফটকের দিকে ছোটে। এক বিন্দু জল যদি পাওয়া যায় ঐ জলসত্রের ধারে-কাছে কোথাও! লোম নাচিয়ে ছোটে টম্।

অনন্তরাম ভেতরে চলে গেছ্‌লো। কোথা থেকে এসে কানে-কানে বললে,—তোর পড়ার ঘরে কে এসেছেন দেখেছিস্?

—কে বল' তো? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

—বিশ্বাস না হয় দেখবি আয়।

অনন্তরামের পিছু-পিছু গিয়ে পড়ার ঘরে কাকেও দেখতে না পেয়ে সে বললে,—কে আবার এলো?

—এলো নয়, গেলো। প্রতিমা দেখবি? বললে অনন্তরাম।— জানালার বাইরে ছাখ্ আকাশে প্রতিমা।

আইভিলতা? ঐ তো বাতায়ন-পথে।

রাঙ্গা চেলী কেন? অঙ্গে ফুলের গয়না? মুকুট কেন মাথায়? গোলাপ-কুঁড়ির। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণকিশোর।

হঠাৎ মুখ খিঁচিয়ে অনন্তরাম বললে,—নমস্কার জানাও না মুখ্যু! দেখছিস্ না, হাত তুলে তোকে নমস্কার করছে!

আইভিলতা করজোড় কপালে স্পর্শ করে।

মুহূর্ত্তমধ্যে চ'লে যায় বাতায়ন থেকে। বোধ হয় কনের পিঁড়েয় বসতে যায়। এবার বুঝতে পারে কেন এমন অসময়ে বাজে সানাই। অবাক-বিস্ময়ে কৃষ্ণকিশোর চেয়ে থাকে ঐ শূন্য বাতায়নে।

রাত্রি নাগাদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে ভাঙা-মনে। জুড়ী ঢিমে-তালে চলে। দিন-শেষের পথ লোকে লোকারণ্য। জুড়ীর গতি কোন্ দিকে যাবে শেষ পর্য্যন্ত কে জানে!

তার কানে তখনও সানাইয়ের রেশ। চোখে আইভিলতার রাঙ্গা চেলী। আর ফুলের গয়না।

পণ্ডিত মশাইকে স্মরণ করেছিলেন কুমুদিনী।

লোক মারফৎ ডেকেছিলেন, রাত্রে একবার যেন পায়ের ধূলো দেন শত কাজ সত্বেও। শিরোমণি তাই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হয়েছেন। অন্দরে সংবাদ গেছে। কুমুদিনী একাদশীর উপবাস ক'রেছেন। নেহাৎ শিরোমণি এসেছেন তাই, নয় তো এ দিনে কারও সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করেন না। প্রায় মৌন অবলম্বন করেন। শিরোমণি এসেছেন শুনে দ্রুত শয্যা ত্যাগ ক'রে একখানা গরদের চাদর জড়িয়ে বৈঠকখানার দরজার কাছে এলেন। শিরোমণি বললেন,—কি সমাচার?

সদরে তখন জানাজানি হয়ে গেছে, মা এসেছেন। পাইক আর প্রহরীর দল বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে-যার পথ আগলে যে-যার জায়গায় স্থির-পুত্তলিকার মত। মশালচিরা শুধু ঘোরা-ফেরা করছে ঘরে ঘরে। এক দালান থেকে আরেক দালানে। একেক মুহূর্ত্তে আলোকিত হয়ে উঠছে একেক দিক—একেক ঝলক আলোয়। নাটমন্দিরের পুরোহিতের সাঙ্গোপাঙ্গরা ধূম্রমান ধুনচি হাতে ঘরে ঘরে ধুনো দিচ্ছে।

পবিত্র সুগন্ধে বাতাস হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। খানিক পরেই নাটমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শুরু হবে। আরতির সঙ্গে সঙ্গে।

জাফরির আড়াল থেকে শিরোমণির সামনেই বেরোলেন কুমুদিনী। উপবাস-ক্লিষ্ট শরীর তাঁর, কথার সুরে যেন ক্লান্তির ধীরতা। বললেন,—আমাকে উদ্ধার করুন আপনি। সে এখন বাড়ীতে নেই। আপনাকে আসতে অনুরোধ ক'রেছি। আমি কি করতে পারি? কোন দিকে দৃক্‌পাত নেই!

কথা শুনে কোন উত্তর দিলেন না শিরোমণি।

স্তিমিত নেত্রে ব'সে থাকলেন। কুমুদিনীর প্রশ্নের উত্তর যে কি, তাই যেন চিন্তা করতে থাকলেন। অনেক্ষণ পরে বললেন,—গুণধরের প্রসঙ্গ বলছো তো?

কুমুদিনী বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার আর কে আছে?

শিরোমণি কি অর্থে মৃদু হাসলেন আপন-মনে! বললেন,—তোমার চিন্তার কি কারণ?

কুমুদিনী বললেন,—তবে কি বলেন ব'য়ে যাবে? আপনি থাকতে?

এ কথাতেও হাসলেন শিরোমণি। এবারে মৃদু নয়, শব্দময় হাসি। সহসা হাসি থামিয়ে বললেন,—কাকে যেন আসতে দেখি এদিকে?

কুমুদিনী জাফরির আড়ালে চ'লে গেলেন। যিনি আসছেন তাঁর পথ রোধ করতে পারে এমন কেউ নেই এ বাড়ীতে। পাইক-প্রহরীর দল পুতুলের মতই দাঁড়িয়ে থাকে। যিনি আসছেন তিনি তাদের উপেক্ষা ক'রেই আসছেন। যেন দেখতে পাচ্ছেন না মানুষ আছে অতগুলো। তিনি এসে এই বৈঠকখানাতেই ব'সবেন। কথা বলবেন ঐ কুমুদিনীর সঙ্গে।

একেবারে কাছাকাছি আসতেই পরস্পরকে চিনতে পারেন। শিরোমণিই বললেন,—কে, লালমোহন না?

—তাই তো মনে হয়। বর্ত্তমানে কি ক'রছো? পণ্ডিতি, না অন্য কিছু?

শিরোমণি বললেন,—হ্যাঁ ভাই। তুমি?

শিরোমণি পণ্ডিত একটা কাঠের জল-চৌকিতে ব'সেছিলেন। তিনি আসতেই এনে পেতে দেওয়া হয়েছে। তক্তাপোষের ফরাসে ব'সেছেন লালমোহন। সেই সন্ন্যাসী-লালু। এতদিন পরে আবার এসেছেন তিনি। জাফরির আড়াল থেকে ভাবছিলেন কুমুদিনী, কি অভিযোগ

আছে তাঁর কে জানে! কি আবার শোনাতে এসেছেন হয়তো ঐ গুণধরের নামে।

লালমোহন বললেন,—আমি? তোমাদের আশীর্ব্বাদে ভাই সেই শ্মশান-বাস। এখনও চালিয়েছি তান্ত্রিকতা।

দুজনে প্রায় বন্ধু বললেই হয়। কৃষ্ণচরণের সংস্পর্শে পরিচয় হয়। আর ঐ লালমোহন তো কৃষ্ণকান্তর সহপাঠী। সতীর্থ।

শিরোমণি গায়ত্রী নাম জপছেন নিজের করে। কথার সময় কথা বলছেন। বললেন,—এই কলকাতাতেই আছো তা হলে?

—ছিলাম না। এসেছি সম্প্রতি। যশোরে গেছলাম। মা যশোরেশ্বরীর মন্দিরে থাকতে হয়েছিল এক পক্ষ।

নাম শুনেই কপালে করস্পর্শ করলেন শিরোমণি। লালমোহন বললেন, —আমার এক শিষ্যর অনুরোধে যেতে হয়েছিল। যশোরে তার বাড়ী।

—তা মন্দিরে থাকলে কেন? শিরোমণির কণ্ঠে কৌতূহল।

লালমোহন বলেন,—শিষ্যটি জাতে অত্যন্ত নীচ। শিষ্যত্বের আদপেই যোগ্য নয়। জাতে নীচ, মনের দিক দিয়েও নীচ। লালমোহন স্বর নত করেন। বলেন,—সেখানে এক কৈবর্ত্তের গৃহে একটি বিধবা কন্যা আছে। শিষ্যটি সেই কৈবর্ত্তকে উচাটনে জব্দ করতে চায়। তাই আমাকে যেতে হয়েছিল।

শিরোমণি যেন শিউরে উঠলেন কথাগুলি শুনে। মনে মনে গায়ত্রী মন্ত্র জপলেন। পরনের নামাবলী খুলে গিয়েছিল, জড়িয়ে নিলেন উর্দ্ধাঙ্গে। বললেন,—কি প্রকরণ তার?

লালমোহন বললেন,—জাত-ব্যবসা যে পণ্ডিত! প্রকরণ কি কাকেও বলে? তবে, তোমাকে বলতে বাধা কি? তুমি তো শাস্ত্রেই দেখতে পাবে।

শিরোমণি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। বললেন,—শুনতে কি আপত্তি! কামরত্নেই পাওয়া যাবে হে উচাটনের সর্ব্ববিধ প্রকরণ।

লালমোহন দেখলেন পণ্ডিত ভুল বলেনি। পণ্ডিত কি শ্রীনাগভট্টের কামরত্ন তন্ত্রেরও পাঠ রাখে? অনন্যোপায় হয়ে লালমোহন চুপি-চুপি বললেন,—মঙ্গলবার নিশিতে, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা শ্মশানাঙ্গার, রক্তবর্ণের সূত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ যার গৃহে নিক্ষেপ করা যাবে, এক সপ্তাহ মধ্যে তার উচ্চাটন হবে।

উচ্চাটন। উচাটন।

লালমোহন মন্ত্রটি আর চুপিসাড়ে বললেন না। শ্রীনাগভট্টের মূল মন্ত্র বলেন,—মঙ্গলবারে নিশীতে শ্মশানাঙ্গারং কৃষ্ণবস্ত্রেণ কৃত্বা রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য যস্য গৃহে পরিক্ষিপেৎ সপ্তাহাভ্যন্তরে তস্যোচ্চাটনং ভবতি।

আবার একবার শিউরে উঠলেন শিরোমণি। দুই কানে আঙুল দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, লালমোহন যে তন্ত্রমতে সিদ্ধাই! লালমোহন অচিরাৎ পরিত্যাজ্য। শিরোমণি জল-চৌকি থেকে উঠে পড়লেন। বললেন, —তুমি তা হ'লে ব'স লালু। আমি ভাই, যাই। চরণের স্ত্রী আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল তার ছেলের জন্যে। আজ আর কোন কথা হবে না।

চরণ। কৃষ্ণচরণ। এ-বাড়ীর নামের আদ্যে কৃষ্ণ। আর বড়বাড়ীর অন্তে। বিনম্রতায় আপ্লুত মানুষটি বলতেন,—আমি মাথায় চড়তে চাই না, আমি ঐ চরণই থাকি। চরণেই আমার শরণ।

জাফরির আড়াল থেকে পরস্পরের কথা শুনছিলেন কুমুদিনী। পণ্ডিত মশাইয়ের শেষ কথাটি শুনে বুঝলেন তিনি গমনোদ্যত। কুমুদিনী শুনতে পেলেন খড়মের শব্দ। বুঝলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শিরোমণি। ধীর-পদক্ষেপে অন্দরে চলে গেলেন কুমুদিনী। দাসীকে বললেন,—সন্ন্যাসী

কি বলতে চায় শুনে আয়। বলবি, একাদশী, তাঁর সঙ্গে কথা হবে না।

শিরোমণির বিদায়-গ্রহণে লালমোহন যেন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। ব'সে থাকলেন তবুও। বহু দূর থেকে তিনি আসছেন। সেই বুড়ীগঙ্গার তীর থেকে। সকালে এক ব্রাহ্মণপুত্রের উপবীত ধারণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রেছেন বুড়ীগঙ্গার তীরে। বৈশাখের উত্তপ্ত রৌদ্রে যেন এখনও দগ্ধ হয়ে আছেন! উত্তরীয়ের অঞ্চল দুলিয়ে বাতাস বওয়াচ্ছেন। ঘরের লণ্ঠনের আলোয় দেখা যায় মুখখানা যেন ঘর্ম্মাক্ত লালমোহনের। পথশ্রান্ত তিনি।

জুড়ী তখন গড়ের মাঠে চক্কর দিয়ে সবে চৌরঙ্গীর কাছ বরাবর এসেছে। জুড়ী ঘুরছে সেই তখন থেকে কলকাতার পথে পথে। যখন থেকে সেই সূর্য্য অস্ত গেছে। টাট্টু দু'টোর নাক-মুখ থেকে ফেনা ঝরছে গাড়ী টেনে-টেনে। তবুও কোথাও থামতে বলছে না গাড়ীর ভেতরের মালিক। জুড়ী ছুটছে তো ছুটছেই।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। নিশুতি অন্ধকার। নেহাৎ রাস্তার দু'পাশে টিম-টিমে আলো জ্বলছে এক-আধটা। আর কয়েকটা দোকানে জ্বলছে দু'-একটা লণ্ঠন। যেখানে আলো সেখানটুকু শুধু চোখে পড়ে। দূরের আর কিছুই দেখা যায় না। জুড়ী ঘুরেছে একটু পথ নয়। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ভবানীপুর, সেখান থেকে ক্যামাক্ ষ্ট্রীট, উড্ ষ্ট্রীট। তারপর ইলিয়ট্ রোড ধ'রে চৌরঙ্গী। জুড়ী চলেছে তো চলেছেই।

এক সুনিবিড় শূন্যতায় ছেলে যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। নিরাশার দরিয়ায় জমেছে তার পাড়ি। দেখা-পাওয়ার নেশা টুটে গেছে একেক ধাক্কায়। ফিরিঙ্গী পরী উড়ে পালাতে না-পালাতে প্রতিবেশী বাঙলার

মেয়েটিও অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সমুখ থেকে। চলে গেল অন্যের ঘরে। আইভিলতা চললো তার শ্বশুর-ঘরে—ঘর করতে।

চৌরঙ্গীর চৌমাথায় পুলিশের হাত দেখে গাড়ী থামতেই কোচবক্স থেকে অনন্তরাম এক লাফে নেমে পড়লো। বললে,—বলিস্ তো, ফেরা যাক্ এখন।

বাড়ী ফিরতে কি মন চাইছে। এমন একটা দিন, যে দিনে অনেক-বারের-দেখা-পাওয়া মেয়েটা চোখের অন্তরালে চলে যাচ্ছে, সেদিনে কি ভাল লাগে বাড়ীর ঐ আবহাওয়া। যেখানে শুধু পড়ার ঘর, কাছারী আর অন্দর-মহল? কৃষ্ণকিশোর এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল নাকি! তন্দ্রার ঘোরে যেন বললে,—না, এখন ফিরব না। আরও বেড়াবো আমি।

অনন্তরাম কোচবক্সে উঠে মনে মনে হাসলো একবার। ছেলেটার মনের অবস্থা যে কি, তা সে অনুমানেই বুঝেছিল। ছেলেটা দাগা পেয়েছে মনে। মেয়েটার হয়তো যে বিয়ে হচ্ছে এতক্ষণ!

সত্যিই তখন আইভিলতা ছাঁদনাতলায়। শুভদৃষ্টির বিনিময় হচ্ছে। সানাই বেজে চলেছে চড়া সুরে। চোখ থেকে পান সরিয়ে নিয়েছে আইভিলতা। নাপিত ছড়া কাটছে বর আর কন্যা-পক্ষের কুটুম-সাক্ষেতদের উদ্দেশ্য করে। শাঁখ আর হুলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে বিয়েবাড়ী!

অনন্তরাম কোচম্যানকে বললে,—আবদুল, চল্ রিপন ষ্ট্রীটে সেই ফিরিঙ্গীটার বাড়ী। মালিক নামলে ঘোড়া দু'টোকে একেক বাল্তি জল খাইয়ে নিস্ সেই ফাঁকে। আহা, ব্যাচারীদের জান বেরিয়ে যাওয়ার দাখিল হয়েছে!

অনন্তরাম জানে সেই অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলেটাকে এখন কাছে পেলে কিছুটা হয়তো ঘোর কাটবে এই জাগ্রত তন্দ্রাচ্ছন্নতার। অনন্তরাম মনে মনে একটু যেন খুশীই হয়। ছেলেটা তবুও যা হোক কোন বারাঙ্গনার

দুয়োরে না গিয়ে পড়শীর মেয়ের রূপ দেখেই মজে গেছে। অবশ্য রাত পোয়ালেই এই দেখাদেখির পালা চুকে যাচ্ছে। মেয়েটার বে হয়ে যাচ্ছে। অনন্তরাম একটা তৃপ্তির শ্বাস ফেললো।

ক্লান্ত জুড়ী চললো রিপন ষ্ট্রীটের দিকে।

বাঙলার সূর্য্য তখন মধ্য-গগনে!

বাঙলায় বঙ্গদর্শনের যুগ। সমগ্র ভারতের মুখপাত্রী বাঙলা। বাঙালীর বন্দেমাতরম্ ভারতের একমাত্র শ্লোগান। নর্ম্মান বিনয়েন্দ্র ক'দিন বাড়ীতে আসেননি। কোথায় আছেন কে জানে। রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া যায় লণ্ঠনের আলোয়, ঘরের সোফায় কারা যেন ব'সে আছে। উত্তেজিত স্বরে কে যেন কি বলছে। কার বিরুদ্ধে যেন কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। হাসি আর টুকরো কথার শব্দ ভেসে আসছে রাস্তায় পর্য্যন্ত। রাত্রির গভীর আঁধারে লুপ্ত চতুর্দ্দিক—শুধু ঐ ঘরে জ্বলছে ক্ষীণপ্রভ আলো। সোফা ছেড়ে কেউ বা উঠে পায়চারী করছে ঘরের ভেতর।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র একটা সোফায় ব'সে ছিল।

তাকে ঘিরে ব'সে আছে কারা ওরা? একজন নয়, একাধিক মানুষ দেখা যায় যেন। কেউ গম্ভীর, কারও মুখে হাসি, কেউ বা কথা বলছে। অরুণেন্দ্র শুধু ব'সে আছে চুপচাপ। শুনছে পরস্পরের কথা। বার্ডসাই খাচ্ছে থেকে থেকে।

গাড়ী থেকে নেমে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত এগিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কৃষ্ণকিশোর। দেখে চিনতে চেষ্টা করছিল অরুণেন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য যারা ঘরে আছে তাদের। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে হঠাৎ শুনতে পায় ঘরের ভেতরে কে যেন গান ধরলো বাউল সুরে। গানের কথাগুলি অস্পষ্ট। সুর শুধু পরিচিত। বাঙলার খাঁটি বাউলের সুর—একটিমাত্র তারে যে-সুরের

ব্যঞ্জনা। কান পেতে শুনতে সচেষ্ট হয় কৃষ্ণকিশোর গানের কথা। সঠিক যেন শোনা যায় না। ঘরে কে একজন গান ধরেছে। গাইছে :

"(ভাই সব) দেখ চেয়ে, বাজার ছেয়ে আসতেছে নীল বিদেশ হ'তে।
আমাদের বেচা-কেনা, পাওনা-দেনা, অভাব-মোচন পরের হাতে ॥
আমাদের পিতল-কাঁসা ছিল খাসা, কাজ চালাতেম কলার পাতে—
এখন এনামেলে মাথা খেলে কলাই করার ব্যবসাতে।
এখানে পরশ-পাথর পায় না আদর, চটা উঠছে পেয়ালাতে ॥ * * *"

ফিরিঙ্গী-বাড়ীতে বাউলের গান! কেমন যেন বিস্ময়ের ঘোর নামে কৃষ্ণকিশোরের চোখে আর কানে। এই গানের উৎসবে তো আহূত হয়নি, সে অনাহূত। ভাবছিল, ঘরের ভেতরে যাবে কি যাবে না। কিন্তু বাইরে কী ভীষণ অন্ধকার। এখানে-সেখানে শুধু ঝাঁক-ঝাঁক জোনাকি জ্বলছে। মনে পড়ছে লিলিয়ানের সেই ফুল আর মালা, অপেল পাথরের!

গান শেষ হ'তে না হ'তেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কে যেন কথা বলতে শুরু করলো। কে কার বিরুদ্ধে ঘরের ভেতরে ব'সে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে আবার! বলছে,—সাহজাহান, সম্রাট সাহজাহানের soul কখনও শান্তি পাবে না! কাশেম খাঁ! কাশেম খাঁকে পাঠিয়ে সম্রাট আমাডের পুড়িয়ে মেরেছে! I want to die in the lap of death, whenever I think over it. জব চার্নকেরই জিৎ হলো! ডি. মিগনেল, ডি. নোরোনহা, সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালিস, ফ্রান্সিস কার্ভালো কিছু ক'রটে পারলে না! হায়, আমাডের 'পোর্টগ্রাণ্ডী' বেহাত হয়ে গেল! Oh God, we are undone!

বক্তব্য শুনে অরুণেন্দ্র বললে,—Eugene, can't thou forgive and forget?

ওয়াল্টার ইউজিন্ ডি সুজা। কলকাতার এক মিশনারী কলেজের ছাত্র। অরুণেন্দ্রর পর্টুগীজ বন্ধু। গোয়ায় নাকি তার পূর্ব্বপুরুষের বসবাস ছিল। এখন শহর কলকাতার বাসিন্দা। ঘোর জাতীয়তাবাদী। স্বজাতির অপমান ক্ষণেকের জন্যেও যেন ভোলে না! ভাস্কো-ডি-গামার আবিষ্কৃত ভারতভূমির অধিকার ছাড়তে সে চায় না।

ভেতরে-ভেতরে একবার গর্জ্জে উঠলো ইউজিন। কাশেম খাঁ, তাঁর দুই পুত্র এনায়েৎউল্লা আর আল্লাইয়ার খাঁ বাঙলা থেকে পর্টুগীজদের বিতাড়িত ক'রেছে। সাহায্য ক'রেছে ইশা খাঁর বংশধর মাসুম খাঁ। ইউজিন এই লোকগুলোকে পেলে যেন কামড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়। মনে-মনে নামগুলি জপ করে যেন আক্রোশের আতিশয্যে।

দোষ এদের কারও নয়। সম্রাট সাহজাহান স্বয়ং আদেশ পাঠিয়েছেন পর্টুগীজদের বেয়াদপির কথা শুনে। তাদের অত্যাচারে নাকি বাঙ্গালী প্রজারা অতিষ্ঠ। সাহজাহানের আদেশ হ'ল কাশেম খাঁর প্রতি :

> "আমি তোমায় বঙ্গদেশস্থ সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ও শাসনভার দিয়া পাঠাইতেছি। তুমি আমার অনুগৃহীত ও মনোনীত ব্যক্তি। তুমি সাবধানে পর্টুগীজদিগের কার্য্য-প্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তাহারা কোথায় কি করিতেছে, তৎপ্রতি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। আমি আমার বঙ্গীয় প্রজাগণকে পর্টুগীজদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে চাহি। যখন দেখিবে, তাহারা কোনরূপ বিধি-বিগর্হিত অন্যায় কার্য্য করিতেছে —তখনই সরকারে এত্তেলা করিবে। এত্তেলা পাইলে যেরূপ হুকুম দেওয়া প্রয়োজন, আমি তখনই তাহা দিব।"

কাশেম খাঁ বাঙলায় পৌছেই ক্রুদ্ধ শনির ন্যায় পর্টুগীজদের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। ইউজিন যেন চোখের সামনে ছায়াচিত্রের মত দেখতে পায় কাশেম-কাহিনী। আর মনে মনে গজরায়।

এখানেও কি উৎসব নাকি ?

কেন এই জন-সমাবেশ! কেন এই গান আর এত কথা? এই সদ্য শোকসন্তপ্ত পরিবারে হঠাৎ এত হাসি? স্তব্ধ-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণকিশোর। স্তব্ধ অন্ধকারে। সঙ্কোচ হয়, নয় তো সোজা ঐ ঘরে গিয়েই হাজির হ'ত। আমন্ত্রণ না পেয়ে কেউ কি উৎসবে যোগ দিতে পারে! ডাক না শুনে কেউ কখনও সাড়া দেয়! অন্ধকারে ঝিঁঝির কীর্ত্তন শোনে সে। ইউজিন গজরায় আবার,—পর্টুগীজদের ভয়ে জাহাঙ্গীর সাহ বাঙলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় নিয়ে গেল! জাহাঙ্গীর সাহ ভীতু! বেগম নূরজাহানের henpecked husband জাহাঙ্গীর!

সাহজাহান কিংবা জাহাঙ্গীর—দুজনেই নির্দ্দোষী। কাশেম খাঁই যত নষ্টের গোড়া। বাঙলায় পৌছেই ক্রুদ্ধ শনির ন্যায় পর্টুগীজদের দোষ অনুসন্ধানে লিপ্ত হলেন। দেখতে দেখতে দু'বছর অতীত হয়ে গেল। পরিশেষে কাশেমের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হ'ল। সম্রাট-সরকারে কাশেম যে এত্তেলা পাঠালেন তার মর্ম্ম হ'ল :

১। পর্টুগীজেরা বলপূর্ব্বক ও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সম্রাটের প্রজাগণকে খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে।

২। সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত, দুই-এক স্থলে দুর্গনির্ম্মাণও করিয়াছে।

৩। তাহাদের বাণিজ্যালয়ের বা ফ্যাক্টরীর নিকট দিয়া, যে সমস্ত বাণিজ্য-নৌকা গতায়াত করে, তাহাদের নিকট হইতে বলপ্রয়োগে শুল্ক আদায় করিতেছে।

৪। বাদশাহের শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্য-কেন্দ্র সপ্তগ্রামের সম্পূর্ণ অনিষ্টসাধন করিতেছে।

সম্রাট-সকাশে এই এত্তেলা পৌঁছিবা মাত্রই, ঘৃতসিক্ত বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ হ'লে যে ব্যাপার ঘটে, তাই হ'ল। তৎক্ষণাৎ সম্রাট আদেশ দিলেন,

"পর্টুগীজদিগকে বাঙলা হইতে একেবারে বিতাড়িত করিয়া দাও। তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ কর'।"

ইউজিন মনে মনে ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওলটায়। বলে,—That bloody কাশেম খাঁ!

কথাটির প্রতিধ্বনি বাতাসে ভেসে আসে। নীরব, নিস্তব্ধ রিপন স্ট্রীটের একাংশ গম-গম ক'রে ওঠে যেন। কৃষ্ণকিশোরের মনে হয়, হয়তো কোন-এক নাটকের বুঝি বা মহলা চলেছে এখানে। অভিনেতাদের প্রস্তুতি? আবার গানের দু'-চার সুরেল পঙ্ক্তি শোনা যায়। খাম্বাজ-কাওয়ালী সুর গায়কের কণ্ঠে—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?......"

কেন এই উৎসব? পূর্ব্বেই বলেছি, বাঙলার সূর্য্য তখন মধ্য-গগনে।

বাঙলায় তখন বঙ্গদর্শনের যুগ। ইং ১৮৭০—১৮৮০, এই ক'বছরে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে এক ভীষণ কর্ম্ম চাঞ্চল্য। এক দিকে চৈত্র বা হিন্দুমেলার আহ্বান; ইউরোপে বিভিন্ন জাতির একরাষ্ট্রভুক্তি; আমেরিকায় নিগ্রো দাসদের স্বাধীনতা অর্জ্জন—বাঙালীর মনে সেই প্রতিক্রিয়ায় শুধু স্বাধীন-বাঙলা নয়, অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।

শেষ পর্য্যন্ত আর বাইরে থাকতে পারে না অরুণেন্দ্রর আরেক বন্ধু। হাসি, কথা আর গানের ঝঙ্কার শুনে এগোয় ঐ ঘরের দিকে। রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার জানান দেয় শৃগালের পাল। সহসা ডাকতে

শুরু করে। চম্‌কে ওঠে যেন হঠাৎ ডাক শুনে। মনে প'ড়ে যায় মা'র কথা। মনে পড়ে রাত্রি অনেক হয়েছে। বাড়ীতে এমন একজন আছেন, ফিরতে একটু দেরী হলে তিনি আর স্থির থাকতে পারবেন না। মাকে মনে প'ড়ে যায়। কুমুদিনীকে।

কুমুদিনী তখন খাস-মহলে।

একটা মাদুরে ব'সে শ্রীরাধিকায়াঃ সহস্রনামস্তোত্রম্ পড়ছেন। রাধার হাজার নাম। স্তোত্র থেকে মন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাঁর। ছেলের জন্য গর্ভধারিণীর ব্যাকুলতা। একেক বার কান পেতে শুনছেন, ফটকের ভেতর কি কোন গাড়ী ঢুকলো? কুমুদিনী যেন আর পারেন না ছেলেকে নিয়ে। একগুঁয়ে, অবাধ্য ছেলে!

দাসী শুধু একবার কানে শুনিয়ে দিয়ে গেছে লালমোহন কি বলতে এসেছিলেন। বিদায়ের সময় লালমোহন ব'লে গেছেন,—ছেলেটি কি শেষ পর্য্যন্ত খ্রীশ্চান হয়ে যাবে? যার-তার বাড়ী যাওয়া-আসা করছে! হয়তো বা অখাদ্য-কুখাদ্য খাচ্ছে।

কুমুদিনীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে যেন দাসীর মুখ থেকে কথাগুলি শুনে। নীরবে শোনেন শুধু। মুখে আর রা কাড়েন না। আবার স্তোত্র পড়তে শুরু করেন।

দরজায় তাকে দেখতে পেয়েই সোফা ছেড়ে উঠে পড়লো নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। আর আর যারা ছিল তারা অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো। ইউজিন ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলো। অরুণেন্দ্র তাকে প্রায় জড়িয়ে ধ'রে বসালো একটা শূন্য সোফায়। বললে,—

ভেবেছিলাম, when Lilian is dead তুমি আর আসবে না।

কৃষ্ণকিশোর অনুমানে বুঝতে পারে বন্ধুর বক্তব্য। লজ্জিত হয় যেন। বলে,—তুমিও কি একদিনও এসেছিলে আমাদের ওখানে? তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। আর তুমি? তুমি কোথায় থাকো, কি কর' তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

অভিযোগের সুরে প্রতিবাদ করলে অরুণেন্দ্র। ভ্রূ কুঁচকে বললে,—দেখো, don't speak in this way! আমি এমন কোন দোষের কাজ করি না। There is no one in this vicinity of earth who can blame me—পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে।

ঘরের মধ্যেকার টেবিলে ছিল উচ্ছিষ্ট রেকাবী, গেলাস আর চায়ের পেয়ালা। একটা জলের গেলাস মুখে তুলে খানিকটা জল খেয়ে নেয় অরুণেন্দ্র। তার পর আবার বলে,—

There is no terror, Cassius, in your threats;
For I am arm'd so strong in honesty,
That they pass by me as the idle wind,
Which I respect not.

ইউজিনও সোফা থেকে উঠে পড়ে। অরুণেন্দ্রর কানে-কানে চুপি-চুপি বলে,—কে আছে এই ছেলেটি? Who is that?

অরুণেন্দ্র বললে চুপি-চুপি নয়। গলা ছেড়ে। বললে,—Right you are. Let me acquaint him with you all. আমার একজন বাঙালী বন্ধু। কি নাম তোমার শুনিয়ে দাও।

কৃষ্ণকিশোর নাম আর উপাধি বললে। অরুণেন্দ্র বললে,—আর এরা সকলে? All my friends. এ হচ্ছে ওয়াল্টার ইউজিন ডি

সুন্দ্রা, Portugese by caste. ওর নাম জন শ্যামুয়েল। লিলিয়ানের friend ইসাবেলা শ্যামুয়েলের own brother. আর ও হ'ল দেবব্রত বোনার্জ্জী। A native Christian. ওর পাশে যে রয়েছে ও হ'ল one of my relatives, নর্ম্মান অজয়েন্দ্র by name.

অন্য এক পৃথিবীর ইতিহাস শুনছে যেন সে !

নাম আর নামের অধিকারীদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কখনও দেখেনি যেন। কস্মিন্ কালেও নয়। নর্ম্মান অরুণেন্দ্রর জগতে যে এখনও আরও কত কি দেখতে পাওয়া যাবে, ভাবছে শুধু তাই। কৃষ্ণকিশোর বললে,—আমি তোমাদের উৎসব পণ্ড করলাম না তো ? আমি চলে যাবো এখুনি। রাত অনেক হ'ল। খোঁজ নিতে এসেছিলাম তোমার।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র পায়চারী করছিল ঘরের ভেতর। ঘরের এক দেওয়ালে ছিল একটা শূন্য ফায়ার-প্লেস। গ্রানাইট পাথরের। শিরোদেশে ছিল কয়েকটি পোরসিলেনের পুতুল। আর মধ্যিখানে একটা কার যেন ছবি। রঙীন আলোকচিত্র। রূপালী ফ্রেমে বন্দী। পায়চারী করতে করতে অরুণেন্দ্র সেই ছবির কাছে চলে যায়। ছবির চতুষ্পার্শে ছড়িয়ে ছিল টাটকা জুঁইয়ের ছিন্ন পাপড়ি। কয়েকটা তুলে নেয় অরুণেন্দ্র। মুঠোর মধ্যে নিয়ে নেয়। কৃষ্ণকিশোরের কথাগুলো শুনে একটু হেসে বললে,—না, ঠিক তাই নয়। We are very glad to meet you. কিন্তু এমন সময়ে এসে পড়লে যখন I can't offer you anything. দেখো না টেবিলে সব empty vessels. বাড়ী চ'লে যাও। তোমার মা, your mother is anxious there, I know perfectly.

কার ছবি ওখানে ? লিলিয়ান না ! হ্যাঁ, তাই তো। সেই মুখখানাই তো। সোফা থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর।

অরুণেন্দ্র আবার বললে,—আমি, আমিই যাবো তোমার বাড়ী।

I will meet you very soon. আরও দরকার তোমাকে, যে জন্য আমরা এখানে এখন সমবেত হয়েছি। জানবে বন্ধু, you will come to know everything. আমি বলব। তোমাকেও দরকার হবে। যাও, এখন বাড়ী চলে যাও। তোমার মা—

মা!

বাইরে রাতের আকাশ। স্তব্ধ, গম্ভীর। সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার। কোথায় আকাশ, কোথায় কি, কোন কিছুই চক্ষুগোচর হয় না। রাস্তায় শুধু জুড়ীর দু'পাশের পেতলের আলো। দু'টো অগ্নিময় চোখের মত চেয়ে আছে যেন অন্ধকারের দিকে। ভ্রূভঙ্গী করছে।

খট্ খট্ খট্। ভারী বুট জুতোর শব্দ আসছে যেন কোন্ দিক থেকে। মিলিটারী কায়দার পদক্ষেপের মত। এক জোড়া রাতের চৌকিদার। পাহারা দিতে বেরিয়েছে সঙ্গীন হাতে। মানুষকে সজাগ রাখতে বেরিয়েছে। চোর-ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করতে। রাত আরও বেশী হ'লে গলা ছাড়বে সশব্দে। পাড়া সচকিত ক'রে তুলবে। অন্ধকার কাঁপিয়ে চিৎকার ক'রে ডাকবে,—জাগো—ও—ও—ও!

রাতের আকাশে প্রতিধ্বনি ভাসবে। গগনবিদারক ধ্বনি।

রাত তবে কত? অনেক। দ্বিতীয় প্রহর।

গাড়ীতে উঠতেই কোচম্যান রাশ আলগা ক'রে দেয় জুড়ীর। গাড়ী চলতে শুরু করে। চৌকিদারেরা সন্দিগ্ধ চোখে একবার লক্ষ্য করে গাড়ীটা।

ফাঁকা রাস্তা। কেউ কোথাও নেই। রাস্তায় শুধু টিমটিমে গ্যাস জ্বলছে দূরে-দূরে। ছাড়াছাড়ি, এখানে-সেখানে। ম্লান আলো, তেজ নেই যেন। অনন্তরাম গম্ভীর হয়ে ব'সে থাকে কোচবক্সে। কথাটি

বলে না। আর কোচম্যান আবদুল ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রাগের বশেই হয়তো জুড়ীর কানের কাছে ঘন-ঘন চাবুকের পাক খাওয়ায়। ফাঁকা রাস্তা, তবে আর আস্তে যাওয়ায় কি লাভ! আর, রাত যখন এত।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্রর পৃথিবীর খানিক পরিচয় পেয়ে বিলকুল ভুলে গিয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। জুড়ী ফটকের ভেতর যেতে না যেতেই কানে ভেসে এলো দরবারী কানাড়ার সুর। সানাইওয়ালা এখন এ রাতের মত শেষ রাগিণী ধরেছে। রাত্রির নীরবতায় মনে হচ্ছে যেন, কত কাছাকাছি এই বাজনার খেলা হচ্ছে।

সানাই শুনেই মনে পড়লো। বিয়ে হয়ে গেল হয়তো আইভিলতার। হয়তো কেন, সত্যিই তো বাসরে গিয়ে ব'সেছে এখন বর আর কনে। চুকে গেছে বিয়ের প্রাথমিক পালা এই রাতের মত। এখন থেকে শুধু খোসগল্প, গান আর ঠাট্টা-তামাসায় রাত্রিব্যাপী বেলেল্লাপনা।

অন্দরের সেই ওপরতলার জানলার খড়খড়ি তুলে দেখছিলেন কুমুদিনী। ফটকে গাড়ী ঢুকতেই তৎক্ষণাৎ নিজের শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। মনে হ'ল যেন, প্রতীক্ষায় কাতর কুমুদিনী কিঞ্চিৎ রাগত হয়েছেন। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। চোখে যেন ক্রোধের ছায়া।

ঘড়ি-ঘরে শব্দ-তরঙ্গ শুরু হ'ল। সকল শব্দকে ম্লান ক'রে দিয়ে বাজতে শুরু করলো একে একে। দশটা বাজলো।

খানিক্ষণের জন্য সানাই চাপা পড়ে গিয়েছিল। আবার শুনতে পাওয়া গেল দরবারী কানাড়া।

কৃষ্ণকিশোর চললো ঘরের দিকে। অন্দরে চললো।

আর আইভিলতা চললো তার শ্বশুর-বাড়ী। চলতে চলতে সে শুধু এই কথাটাই ভাবছিল। আইভিলতা।

রাত্রি গেল কোথা দিয়ে।

কেউ জানে না। মা-ও নয়, ছেলেও নয়। কুমুদিনী নির্জ্জলা উপবাস-ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর সংসার আর ছেলের বিষয়ে ক'বার দেখেছেন কয়েকটা ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন। শুধু ঐ ছেলের জন্যে হতাশা, লজ্জা আর অপমানের অসংলগ্ন কাহিনী। এই বংশের মর্য্যাদা-হানির। মাঝে-মাঝে ভেঙ্গে গেছে ঘুম, ঘুম-চোখে দেখেছেন জানলার বাইরের আকাশ। অসীম অন্ধকার। দেখে আবার মুদিত করেছেন চোখ। আর ছেলে কখন্ ঘুমিয়েছে, জাগেনি একবারও। অকাতরে ঘুমোচ্ছে এখনও।

আকাশে শুকতারা জ্বলছে দপ্‌দপিয়ে।

একেশ্বরের দম্ভ যেন তার দ্যুতিতে। সমগ্র আকাশে এখন আর কোন তারা নেই, শুধু ঐ শুকতারা জ্বলছে দপ-দপ। শয্যা থেকে উঠে ঘরের এক কোণে তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপটা নিবিয়ে দেন ফুঁ দিয়ে। তার পর দরজার অর্গল খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন। সামনের দালানে একজন দাসী ঠিক যেন মড়ার মত পড়েছিল। নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কুমুদিনী ডাকলেন,—দাসী, ও দাসী!

ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো দাসী। কুমুদিনী বললেন,—কোচ-ম্যানকে বল, গাড়ী চাই এখ্খুনি। আমি নিজে যাবো। আর বিনো'কে গামছা-কাপড় সঙ্গে নিতে বল। নৈবিদ্যির ঘরের চাবি খুলতে বল বামুনদি'কে।

সূর্য্যোদয়ের আগেই গিয়ে পৌঁছতে হবে।

বৈশাখের বেলা, কড়া রৌদ্রের তেজ। ফিরতি পথে ঐ ঘোড়া দু'টো

কত কষ্ট পাবে। তাও পথ যদি সামান্য হ'ত। কতটা যেতে হবে। সে কি এখানে? কলকাতা শহর ছাড়িয়ে আরও কতটা। গেলে কি খালি-হাতে যাওয়া যায়। শূন্য হাতে? উপচার চাই। চাই ফল, ফুল আর রূপোর টাকা। লালপাড়ের বস্ত্র চাই। দেশী চিনির মিষ্টান্ন। গঙ্গাজল। রাত থাকতে উঠে তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কুমুদিনী। এ-বাড়ীর ঘর-দোর তাঁর চেনা, নয় তো এই অন্ধকার দুর্গ-পুরীতে কেউ পারে চলতে-ফিরতে! কুমুদিনী জানেন এ বাড়ীর কোন্‌খানে সাবধানে না চললে হোঁচট খেতে হয়। কোন্ দরজায় মাথা নীচু না করলে কপাল ঠুকতে হয়। পরিচয়? সেই কৈশোরে যে শুভদিনে এক থেকে দু'য়ে মিলিত হয়েছেন, সে দিন থেকে জানাশুনা হয়েছে এই গৃহের সঙ্গে। তাঁরা দু'টিতে যেদিন একসঙ্গে এসেছেন—সেই প্রথম পদার্পণ থেকেই দেখছেন। তার পর যেদিন দুই থেকে এক হলেন, সেদিন থেকেও তাঁকে দেখতে হচ্ছে। কি করবেন না-দেখে। উপায় কি? তাই চোখ বন্ধ ক'রেও হয়তো চলা-ফেরা করতে পারেন এই গৃহের সর্ব্বত্র।

কোথাকার কোন্ খিলানে কবুতরের ডাক শুরু হয়েছে। বক্-বকম করতে শুরু ক'রে দিয়েছে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে।

রাস্তা থেকে শব্দ আসছে ছুটন্ত গাড়ীর। ডাষ্টবিনের যত ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলো বেরিয়ে পড়েছে। চাকার উৎকট শব্দ শুনে হয়তো জেগে উঠছে শহরবাসী। আকাশের পূব কোণে সামান্য গোলাপী রেখা ফুটে উঠলো এতক্ষণে। ভোরের আলোর বিকাশ হচ্ছে।

দাসী-মহলে সাড়া প'ড়ে যায়। যে যার উঠে পড়ে। একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করবেন গৃহকর্ত্রী। দাসীরা জানে এই দিনটির বিশেষ মূল্য। পুরানো আমলের যারা, তারা মুখে গুলপোড়া দিয়ে এখনও ব'সে থাকে কেউ-কেউ। ঘুমে ঢুলতে থাকে।

উপচার জোগাড় করতে যতক্ষণ সময় নেয়। বিনোদাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুদিনী গাড়ীতে ওঠেন। গাড়ীর খড়খড়ি বন্ধ হয়ে যায়। দরজাও। কোচম্যানের পাশে উঠে বসে একজন পাইক। তক্‌মা-আঁটা পোযাক তার। আকাশ শুভ্র হওয়ার আগেই যাত্রা হয়। ঢং-ঢং শব্দ করতে-করতে উৰ্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছোটায় আবদুল। ভোরের ফাঁকা রাস্তা কাঁপতে থাকে যেন ঘোড়া দু'টোর তীব্র পদক্ষেপে। পথের দু'-পাশের টিমটিমে আলোগুলো জ্বলছে তখনও মুমূর্ষুর হৃৎপিণ্ডের মত।

সবাই ঘুমোয়।

শুধু ঘুম আসেনা কি ঐ ঘড়ি-ঘরের চোখে! রাত ফুরিয়ে যাওয়ার নিশানা শোনায় ঘড়ি-ঘর। ভোরের আলো-আঁধারি আবহাওয়াকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে ঘড়ি-ঘর বাজতে থাকে কতক্ষণ ধ'রে? তল্লাটের সকলে জানতে পারে ক'টা বাজলো।

কোথায় কাকও যেন ডাকলো, না? বাগানের কোন গাছে হয়তো। ফুরফুরে হিমেল বাতাস। যেন ভাসিয়ে নিয়ে এলো কাকের ডাক। গাছের কচি-কচি পাতা আর মাটিতে দূৰ্ব্বা। কাঁপছে সেই হাওয়ায়।

কাছারীর গোমস্তাদের কে একজন হাঁফানিতে ভুগছে! এ্যাজ্‌মা হয়েছে তার। বৃদ্ধ গোমস্তা, কাশছে বুকে হাত দিয়ে। বিরামবিহীন কাশির বেগ। আর আর গোমস্তা তাদের ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে বিরক্ত হয়ে উঠছে। কেউ বা পাশ ফিরে আবার এক ঘুম দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

কাক ডাকলো আবার। কেঁপে উঠলো হাওয়া। কাছাকাছি ডাকছে বাগানে, দূরেও ডাকছে। যেন এক পূজার মন্ত্র পড়তে শুরু করেছে। ডাকছে হয়তো ঐ ঈশ্বরকেই, যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান।

আকাশের একটা দিকে হঠাৎ কাঁচা রূপো ছড়াতে শুরু করলো কে? একজন আসছেন, তাঁর আবির্ভাব ঘোষণা করলো যেন লোহিত রেখায়।

সপ্ত অশ্ব আসছে। তমসাকে বিদীর্ণ ক'রে তারা বহন ক'রে আনছে সহস্রচক্ষু সবিতা দেবতাকে। শহর কলকাতা যেন হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে ঐ দিকে।

এমন সময় সানাইয়ের বাঁশীটা শুধু একবার বেজে উঠলো। শুধু বাঁশীটা। সানাইওলা সুর পরীক্ষা করছে। প্রতিবেশীর একটি মেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে তার পতির ঘরে যাত্রা করবে। তারই জন্যে এই বাজনার কান্না শুরু হবে। বিয়ে-বাড়ীর ক্লান্ত মানুষদের ঘুম ভাঙবে ঐ সানাইয়ের সুরে। খানিক্ষণের মধ্যেই সানাই বাজতে থাকে মিষ্টি-করুণ সুরে।

ছেলের ফিরতে দেরী দেখে শয়ন-ঘরেই রাত্রির আহার্য্য ঢেকে রাখতে বলেছিলেন কুমুদিনী ব্রাহ্মণীকে। ছেলে তার কিছু-কিছু খেয়েছে। যেন ঠুকরেছে। রাতের এঁটো থালা-বাটি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। রাত বেশী হওয়ার দরুন দাসীরা আর কেউ পেড়ে নিয়ে যায়নি।

ঘরের ভেতর সূর্য্যালোক পড়েছে পূবের জানলা দিয়ে। ঘুম থেকে জাগতেই শরীরে যেন জ্বরের জ্বালা অনুভব করলে কৃষ্ণকিশোর। কেমন যেন জড়তায় ক্লান্ত সর্ব্বাঙ্গ। অন্য দিনের মত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে না। শুয়ে থাকে পূবের জানলায় চোখ চেয়ে। গত রাত্রির কিছু-কিছু ঘটনা মনে পড়ে। মনে পড়ে সানাইয়ের সুর আর আইভিলতার বিয়ে-হয়ে-যাওয়া। মনের সঙ্গোপনে কোথায় যেন চাপা অভিমানের তোলপাড় শুরু হয়। আর দেখতে পাবে না তাকে, যাকে রোজ দেখতে পাওয়া যেতো? আর দেখা দেবে না রোজ, দেখা দিতো যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে? আইভিলতার

একেক বেশ ভেসে ওঠে যেন চোখের সামনে। একেক দিনের গম্ভীর, আর একেক দিনের হাসি-খুশী মুখ।

প্রেম নয়, স্নেহ। মায়া নয়, মমতা। কত দিন থেকে দেখছে ঐ আইভিলতাকে। মনের সঙ্গোপনে কোথায় যেন তাই ব্যাকুল আলোড়ন। না পাওয়ার বিরহ? না, দেখতে না পাওয়ার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা!

দরজা খুলে ভেতরে আসে অনন্তরাম। বলে,—ইদিকে যে সাতটা-আটটা বাজলো। ঘুম কি আর ভাঙবে না নাকি!

দরজা খোলা পেয়ে টম্‌ও ঢুকলো। ঘরের ভেতর বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে ব'সলো এক পাশে। চার পা ছড়িয়ে আলস্য ভাঙলো দেহের। চোখ দু'টো পিট-পিট করলো।

অনন্তরাম বললে,—উদিকে মা আবার গেলেন যেন কম্‌নে!

মা! কুমুদিনী। কুমু। কোথায় আবার গেল এমন অসময়ে! বলা নেই, কওয়া নেই, চলে গেল!

—গঙ্গাস্নানে গেলেন? কৃষ্ণকিশোর প্রশ্ন করে।

অনন্তরাম বলে,—কে জানে কোথায় গেলেন। পাল্কীতে নয়, তোমাদের পক্ষিরাজে গেলেন।

একেক সময়ে কি মনে হয়, যে যা নয় তাকে তাই বলে অনন্তরাম। সামান্যকে অসামান্য রূপে বর্ণনা করে। জুড়ীকে তাই বলে পক্ষিরাজ।

—পিসীমার কাছে গেলেন? ছেলে শুধোয়। বলে,—হ্যাঁ, তাই গেছেন। কোথায় আবার যাবেন?

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ, তা যেতে পারেন। ঠিক ব'লেছিস্ তুই।

গাড়ী তখন প্রায় সিঁথির কাছাকাছি।

বরানগরের পথ ধ'রে সোজা ছুটে চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। আর বেশী

দূরে নয়। যাত্রার সময় শুধু পাড়ার কাছাকাছি একজনদের বাড়ী থেকে তুলে নিয়েছেন একজনকে। একটি বৌকে, যে কখনও সখনও শাস্ত্র প'ড়ে শুনিয়ে পুণ্য অর্জ্জন করিয়েছে কুমুদিনীকে, অপূর্ব্ব রূপবতী সেই পাঠরতা বধূটিকে। বধূটি জাতে ব্রাহ্মণ। রূপে ও রুচিতে, শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য তল্লাটের মেয়ে-মহলে পরিচিত। পরম ভাগ্যবতী। কুমুদিনী তাকে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন যেন। বিদায় গ্রহণ করতে চাইলেই বলেন, —আবার যেন আসো।

এখন নাম ধ'রে ডাকেন কুমুদিনী। বধূটির নাম পূর্ণশশী। শশী নামেই তাকে ডাকা হয়। ভাগ্যবতী এই জন্য যে, স্বামী তার জহুরী মহলের এক জন। অবশ্যই জহুরী মানে জহরৎ নিয়ে ঠিক কারবার নয়, প্রত্নতত্ত্বই হ'ল তাঁর গবেষণার একমাত্র বিষয়। কি ঠিক, কি ঠিক নয়; কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা ভুল নয়—শুধু এই বিচারেই তিনি দিবানিশি মগ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আর রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে ঘন-ঘন যাওয়া-আসা করেন।

বিলেতী পত্রিকায় স্রেফ্‌ বিতর্কমূলক রচনা পাঠিয়েই শশীর স্বামীর উপার্জ্জন। প্রচুর অর্থ নাকি তিনি উপার্জ্জন করেন। শশীর গায়ে তাই এত গয়না। 'লণ্ডন নিউজ' পত্রিকায় শশীর স্বামীর ছবি বেরোয়। শশীর এক পুত্র, এক কন্যা। শশী তাদের এখন নীতি-পাঠ পড়াচ্ছে।

গাড়ীর ভেতর তিন জন। কুমুদিনী, ঐ শশী আর বিনোদা। কথা হচ্ছে, ছেলে গত রাত্রে ফিরলো কখন্‌ তাই নিয়ে। লাখো কথা বলছেন কুমুদিনী ছেলের মতি-গতি সম্বন্ধে। শশী হাসতে-হাসতে শুনছেন। আর মাঝে-মাঝে ফোড়ন্‌ কাটছে বিনোদা।

বাঙলা দেশের ঘরে-ঘরে বিদ্যাসাগরের জননীর মত নারী অসংখ্য আছেন। তাঁদের ছেলেরা হয়তো সবাই এমন কিছু বিদ্যাসাগরের মত হয় না। এই কুমুদিনী, ঐ শশীর মত নারীও হয়তো আছেন। কিন্তু

ঐ ঘর-জ্বালানো বিনোদার মত চরিত্রের যদি কেউ থাকে, যে-কোন গৃহস্থের সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। ঐ বিনোদার মত অজ্ঞ, নিরক্ষর, হীনমনা অশিক্ষিতারা অশান্তির ছায়া ঘনিয়ে তোলে কত ঘরে। রাতকে দিন করে আর দিনকে রাত।

বিনোদা বলছিল,—তা, তা তুমি যতই বল', তুমি কি মনে করেছো তোমার ছেলে এখনও ঠিক আছে? বিগড়ে গেছে, নয়তো সূয্যি ওঠা মিথ্যে! দেখে নিও।

কুমুদিনী চোখ দু'টোকে শুধু একবার পাকালেন। বললেন না আর কিছু।

বিনোদা থামলো না। বললে,—কোথায় গিয়ে কুচ্ছিৎ অসুখ-ফসুখ হবে! তার চেয়ে একটা মেয়ে দেখে এইবেলা বিয়ে দিয়ে দাও।

শশী যেন লজ্জানুভব করলেন কথাগুলি শুনে। তাঁর মুখ থেকে হাসি অপসৃত হল। বললেন,—ছিঃ, কি যেন বল' ঝি। দুধের ছেলে বৈ তো নয়?

মেয়ে দেখা। একটা মেয়ে। শুধু যেন দেখবার অপেক্ষায়। শুধু মুখের কথায়!

কাছারীর দিকে এগোচ্ছিল তখন কৃষ্ণকিশোর।

মা পিসীমার ওখানে গেছেন মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে কাছারীতে চ'লেছিল। কাজ দেখতে কিংবা বুঝতে নয়, কাছারীতে গিয়ে শুধু ব'সতে। কড়িকাঠের চালিতে স্তূপাকার খাতাপত্র। খেরোর কাপড়ের রাশি রাশি চৌকো পুঁটলি। হস্তাক্ষরে লেখা আছে কোন্ সালের কোন্ নম্বর। পুরানো দলিল-পত্র। একটা অদ্ভুত বিচিত্র গন্ধ আছে যেন এই কাছারীতে। পুরানো কাগজপত্র আর তামাকের গন্ধ। বয়স্ক আমলারা কেউ-কেউ তামাক খান চোখে চশমা এঁটে। অতিথি-অভ্যাগতদের জন্যে রূপোয়-বাঁধানো থেলো হুঁকো আছে। একেক জন আমলা কাজ করছে এক

খাতা নিয়ে নয়—সামনে খোলা রয়েছে আরও অনেক খাতা। একটু বেলা হতেই যে যার কাজে ব'সে গেছে। আবার কেউ-কেউ আপন অভ্যাসবশতঃ ছোলা আর আদা চিবোচ্ছে এখনও।

আর, কড়িকাঠের চালিতে স্তূপাকার খাতাপত্র। পুরানো আমলের জমাবন্দি, কড়চা, সেহা, রোকড়। খাস-খরিদা আর বন্দোবস্তের রেজিষ্ট্রী, নামপত্তন আর খারিজের রেজিষ্ট্রী, বাকি জায়। বয়নামা আর দাদনের রেজিষ্ট্রী। আমানত আর জামিনের মকদ্দমার, ভাউচার আর অ্যাড্ভাইস ফরম। জমা-ওয়াশীল-বাকি। একসঙ্গে একত্র স্তূপীকৃত অবস্থায় রয়েছে। আর আছে একটা বোলতার বাসা। কোথায় এক পাশে, ঐ চালিতে। একটা বোলতার নয়। একটা বাসা। অনেক বোলতা আছে সেখানে।

হুজুর ব'সে আছেন কাছারীর ফরাসে। এক সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন। গোমস্তাদের কে একজন আবার থিওজফি সোসাইটির মেম্বর। তিনিই নিয়ম মত তত্ত্ববোধিনী সংগ্রহ করেন। হালের সংখ্যা একখানা ফরাসে প'ড়ে ছিল।

একজন পাইক দরজার বাইরে থেকে বলে,—হুজুর, মেসোমশাই আসছেন।

সমস্ত কাছারী যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। মেসোমশাই আসছেন, কৃষ্ণকিশোর পায়ে জুতো গলিয়ে চললো সেদিকে। অভ্যর্থনা জানাতে গেল। একেই মা আবার নেই।

মেসোমশাই। ঠিক হুলো-বেড়ালের মত চেহারা। পাকা চুল, পাকা ভ্রূ, পাকা গোঁফ ভুঁড়ো-শিয়ালের মত। চশমার কাচ দুটো ভীষণ রকমের পাওয়ারফুল। ঠিক কোন্ দিকে তাকিয়ে থাকে ধরা যায় না।

কৃষ্ণকিশোর জানে, কুমুদিনীই এই মানুষটিকে এড়িয়ে থাকতে চান! তাঁর বাপের বাড়ীর মানুষ হলে কি হবে।

মেসোমশাই মধ্যে মধ্যে আসে। আর দেখতে চায় নাকি কুমুদিনীর বৈষয়িক দলিল-পত্র। কুমুদিনী কখনও দেখান না। বলেন,—'সে-সব কোথায় কি অবস্থায় আছে তার ঠিক নেই।' প্রথমটায় নাছোড়বান্দা হয় মেসোমশাই। শেষে অনেক পীড়াপীড়িতেও যখন হয় না তখন ব্যথাহত মুখে গোটা কয়েক মিষ্টি খেয়ে বিদায় নেয়। মেসোমশাই আসে কেমন যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, দেখলেই তা বোঝা যায়। শুধু ঐ দলিল-পত্র দেখবার উদ্দেশ্য। এষ্টেট সরকার দেখাশুনা করছেন, সেদিকে আর চোখ দেয়নি। কুমুদিনীর হাতে নগদে আর কাগজপত্রে কত কি আছে তারই খোঁজ করে।

মেসোমশাই যখন এসেছে তখন তাকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে হয়। সাত-সকালে এসে প'ড়েছে। কুমুদিনী নেই জানতে পেরে আর বসলে না। বললে,—মা এলে বলবে যে নিবারণ এসেছিল। একটু বিশেষ দরকার ছিল। বলবে, আবার একদিন আসবো। তা, তোমার কি করা হচ্ছে এখন?

কৃষ্ণকিশোর বললে আমতা-আমতা কথা,—পড়ছি আর কাজ শিখছি কাছারীতে।

—তা বেশ বেশ। হ্যাঁ, দু'টোই তো আবার দরকার। পড়াও যেমন দরকার, তেমনি ঠিক কাছারীতে দরকার। মেসোমশাই কথা বলতে-বলতে এগোয় ফটকের দিকে। গোঁফের একটা দিক পাকাতে-পাকাতে।

ফটকের কাছে আসতেই দেখা যায় ওদিকের পথে জনারণ্য। আট ঘোড়ার গাড়ী। কাগজের ফুলের অশ্বরথ। ব্যাণ্ড পার্টি। ব্যাগ-পাইপ আর রসুন-চৌকিওলাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে কত লোক। প্রতিবেশীর একটি মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাবে, তারই জন্যে এই আনন্দ-বাদ্যোৎসব।

তবুও কোথায় যেন দুঃখের রেশ দেখা দেয় কারও কারও মনে। মেসো-মশাইকে রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে কৃষ্ণকিশোর ফিরে আসে তখুনি। দেখে-শুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়। আর যায় গম্ভীর হয়ে।

কাছারীতে ফিরে আবার সেই তত্ত্ববোধিনীর পাতা ওল্টায় অদ্বিতীয়মের কি এক ব্যাখ্যা পড়তে থাকে। পড়তে থাকে না আরও কিছু। মুখে কিছু বলতে পারছে না। অর্থাৎ মুখ দিয়ে কথা আর বেরোচ্ছে না ছেলের। তাকিয়ে আছে শুধু বইয়ে। ভাবছে আইভিলতাকে।

—খাতা-পত্র কি কিছু দেখা হবে হুজুরের ?

হেড-নায়েব বিনয় সহকারে নিবেদন করে। মুখে হাসি ফুটিয়ে। চোখে কুটিলতা। আইভিলতাই তখন অধিকার ক'রেছিল মনটা। কৃষ্ণকিশোর কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মুখ ফুটে কিছু বলা যায় না। দগ্ধ হয়ে যায় যেন মনটা বিরহের ব্যথায়। আজ থেকে তবে কি আর দেখতে পাওয়া যাবে না ঐ হাস্যময়ী মেয়েটাকে! আইভিলতাকে। হঠাৎ কথা শুনে চমকে ওঠে বুঝি হুজুর। বলে,—না, থাক্। অন্য সময়ে দেখবো।

হেড-নায়েব যেন কিঞ্চিৎ খুশী হয়, দেখবে না শুনে। কেন না, দেখতে চাইলেই বিপদ। দেখতে চাইলে যদি কিছু ভুল-চুক দেখে ফেলে! হেড-নায়েব মুখে আরও হাসি ফুটিয়ে বলে,—হুজুরের কাছারীতে যে ধারায় কাজ চলে তেমনটি অন্য কোথাও চলে কিনা আমারতো অন্তত জানা নেই। ঠিক যেন মেশিন হুজুর, ঠিক মেশিনের মত কাজ এগিয়ে চলেছে।

কৃষ্ণকিশোর কোন কথার জবাব দেয় না। শুধু তাকিয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। হেড-নায়েব যদি ঘুণাক্ষরেও জানতো হুজুরের মুখ কেন

এখন মূক। হুজুরের বুকের মাঝে জ'মে আছে কত ব্যথাভরা অভিমান। সত্যিই থেকে থেকে বুকের অন্তস্থলটা হু হু ক'রে ওঠে। আজ থেকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না আইভিলতাকে। ঐ কুচবরণ কন্যাকে, যার মেঘবরণ চুল?

ফটকের বাইরে থেকে কাছারী ঘরে শোনা যাচ্ছে ব্যাণ্ড্ আর ব্যাগ-পাইপের উল্লাসধ্বনি। ড্রাম আর ফ্লুটের মিষ্টি আওয়াজ। করুণ রাগিণী বাজিয়ে চ'লেছে বাদ্যকরের দল। বৈশাখী উতল-হাওয়ায় সেই রাগের খেলা ভে'সে চ'লেছে কত দূর। এই সঙ্গে সানাইয়ের করুণ বিলাপ।

হেড-নায়েব আবার কথা বলে হঠাৎ। বলে,—হুজুর, একটা অনুরোধ ক'রবো আপনাকে। অনুমতি দেন তো বলি।

তত্ত্ববোধিনী থেকে মুখ তুললো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—নিশ্চয়ই বলবেন।

কথা বলতে যেন দোনামোনা করেন হেড-নায়েব। বলতে গিয়েও থেমে যান। কণ্ঠে যেন কথা রোধ হয়ে যায়। অনেক কষ্টে বললেন,—কথাগুলো হুজুর হয়তো উপদেশ ব'লেই মনে হবে! কিন্তু হুজুর, না ব'লেও থাকতে পাচ্ছিনে যেন।

মৃদু হাসি হাসলো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—কোন দ্বিধাবোধ না ক'রে বলুন।

আবার নকল হেসে ফেললেন হেড-নায়েব। হাসতে হাসতেই বললেন,—বেশীর ভাগ জমিদারগণকে জমিদারীতেই বাস করতে দেখি। তাতে সুবিধা এই যে, ঐ সকল জমিদারকে সমাজপতি ক'রে রাখে প্রজাদের দল। আরও সুবিধা এই যে, জমিদারগণ যখন-তখন জমিদারী পরিদর্শন করতে যেতেও পান। হুজুরকেও অনুরোধ করি, মাঝে-মিশেলে জমিদারীতে

যেয়ে দিনকতক থেকে, দেখে-শুনে, প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে আসুন। তাতে জমিদার ও প্রজায় একটা সম্পর্ক গঠিত হয়।

—ঠিক কথা বলছেন। বললে কৃষ্ণকিশোর। —এখন থেকে দেখবো যাতে মাঝে মাঝে যাওয়া ক'রে উঠতে পারি।

হেড-নায়েব বললে,—শুনে খুশী হ'লাম হুজুর। রাজায় প্রজায় পিতা ও পুত্র ভাব। তা না হ'লে হুজুর, কবি কালিদাস পর্য্যন্ত লিখে যান কখনও? রঘুবংশে বলছেন কালিদাস—

প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষাণাস্তরণাদপি।
সপিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥

শ্লোকটা আউড়েই তিনি কৃত্রিম হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন কাছারী থেকে।

কারা যেন থেকে থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করছে, এই কাছাকাছি কোথায়।

রণ-দামামার মত একসঙ্গে বাজলো ব্যাণ্ড, ব্যাগ-পাইপ আর সানাই। শুধু কাছারী-ঘরে কৃষ্ণকিশোরের বক্ষমধ্যে চ'ললো অস্ফুট গুমরানি। তত্ত্ববোধিনীর পাতা ওল্টাতে শুরু করলো ঘন-ঘন। গোমস্তাদের কেউ কেউ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে বাদ্যধ্বনি শুনে। শুধু হুজুর মুখ তুললে না খোলা বইয়ের পাতা থেকে। তত্ত্ববোধিনীর সব চেয়ে উৎসাহী পাঠকের মত মনোনিবেশ করলে পড়তে। কিন্তু একটা শব্দও কি পড়ছে?

হঠাৎ উতল হাওয়া বইতে লাগলো। বোশেখী দিনের ঈষৎ তপ্ত, উষ্ণ হাওয়া।

কলকাতার গঙ্গায় তখন জোয়ার চ'লেছে। করালমূর্ত্তি গঙ্গার। কোথা থেকে ঝাঁক-ঝাঁক কচুরীপানা ভেসে আসছে। ছাড়া-ছাড়া এখানে-সেখানে নানা রকমের নৌকার হাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জোয়ারের মন্থর বেগে ভাসমান। খান কয়েক জাহাজ পরস্পর রেষারেষি করতে করতে আসছে ঐ হুগলীর দিক থেকে কলকাতার দিকে। জাহাজ-গুলোতে লাল রঙের মানুষ। খাস-সাহেব। জাহাজের দোতলার ডেকে বেতের চেয়ারে ব'সে আছে। কালা আদমীর মধ্যে আছে কেবল বাবুর্চির দল। বোতল আর গেলাস সাহেবদের হাতে দিচ্ছে আর নিচ্ছে। জনা কয়েক শ্বেতাঙ্গী মেমও রয়েছেন।

রাণী রাসমণির ঘাট। মন্দিরের চত্বরে লাগোয়া। রাসমণি ঘাট ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। তীর্থযাত্রী স্নানার্থী স্নান করে। মায়ের রাঙা চরণ দেখতে আসে, এসে দু'টো ডুব দিয়ে যায় এই সমুখের গঙ্গায়। কত সাধু-সন্ন্যাসী আসে। কত ফকির আসে। আবার তেমনি কোটিপতিও কত আসে। আসে মায়ের কাছে, মায়ের টানে আসে। আবার যে স্নান করে না, সে ঐ পৈঠে থেকে জলস্পর্শ করে মাথায়।

মায়ের চরণোদক খেয়ে চলে যায়। পায়ের রাঙাজবা নিয়ে যায়।

জলে নেমেছিলেন কুমুদিনী। শশীও নেমেছেন। এনাদের স্নান হলে বিনোদাও জলে নামবে। ডুব দেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে কথা বলছিলেন কুমুদিনী। শশীও বলছিলেন। পূর্ব্বে কবে তাঁরা এখানে এসেছিলেন সেই কথা হচ্ছিল। মন্দিরে ভিড় হবে ব'লে তাঁরা স্নান করছেন খুব দ্রুত। ভিড় হলে আর দেখা যাবে না মাকে। মায়ের চরণকে। তাই ঘাটে এসেই কুমুদিনী বলেছেন,—বৌ, মন্দিরে ভিড়। বেলা হলে আর দেখতে পাবে না, এত ভিড় হবে!

ঘাটের নাটমন্দিরে কীর্ত্তনীয়ারা মায়ের নাম গাইছে। খোল-করতাল বাজিয়ে বাজিয়ে। পরম ভক্তিভরে। কয়েক জন ভিক্ষাজীবী ব'সে আছে এখানে-সেখানে। চাল আর পাই-পয়সা পাওয়ার আশায়। যাদের দয়া হচ্ছে তারা দিচ্ছে, যারা নির্দ্দয় তারা পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

আর গৈরিক-বসনা গঙ্গা কুলুকুলু ভেসে চলেছে। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ফেরী নৌকায় এপারের যাত্রী ওপারে যাচ্ছে। ওপারের যারা তারা আসছে এপারে। রাসমণির দ্বাদশ শিবমন্দির গঙ্গা থেকে দেখা যায়। ফেরীর যাত্রীরা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে।

মাতা আছেন। আর পিতা আছেন।

প্রকৃতি আছেন আর আছেন পুরুষ! পিতৃবক্ষে করালবদনা মহামায়া স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। শঙ্কর আর শঙ্করী। জগৎপিতা আর জগদম্বা। দিগম্বর আর দিগম্বরী।

এই মন্দিরের আশে-পাশে আরও একজন কে নাকি আছেন। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, আত্মভোলা। মাথা খুঁড়ছেন মাটিতে কে একজন। মায়ের ছেলে! রাত নেই দিন নেই, ডাকছেন মাকে।

উপচার পুরোহিতের হাতে দিয়ে স্বীয় নামে সঙ্কল্প করালেন কুমুদিনী। গৃহস্থের মঙ্গলের জন্যে। সংসার আর ছেলের হিতের জন্যে। প্রণাম করলেন কতক্ষণ! শেষে মা'র চরণামৃত মুখে দিয়ে মন্দির থেকে বেরোতে যাবেন এমন সময় কা'কে দেখলেন কুমুদিনী। দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শশীও দেখলেন। দেখে যেন বিস্মিত হয়েছেন।

একটি কুমারী। মা নয় তো? মা শঙ্করী?

লাল চেলী পরিহিতা। সদ্যঃস্নাতা। সিক্ত কেশ ঝুলছে পৃষ্ঠদেশে।

চন্দনের একটা ফোঁটা কেটেছে কপালে। চন্দনের মত গায়ের রঙ, বৈশাখী রৌদ্রে ফুটে বেরোচ্ছে যেন। চোখে আবার কাজল। কাদের বাড়ীর মেয়ে! কুমুদিনী সেখানে আর না দাঁড়িয়ে নেমে এলেন মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে। কুমারীটির সঙ্গে একজন বৃদ্ধা। লক্ষ্য করলেন তাঁকে। শশীকে বললেন,—শশী, মেয়েটার রূপ দেখলে? আহা, যেন প্রতিমা!

শশী বললেন,—দেখলাম তো। বলুন তো খোঁজ করি আপনার ছেলের জন্যে। শশীর কথায় যেন খুশীর আবেশ। মুখে হাসি। রৌদ্রালোকে শশীর গায়ের গয়না যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। আর সিঁথির সিঁদুর!

আর ছেলে তখন তত্ত্ববোধিনী রেখে একটা খাতা টেনে নিয়েছে। একজন নায়েবের খাতার স্তূপ থেকে। মফঃস্বল থেকে আগত নিকাশি কাগজ পরীক্ষা ক'রে যে খাতায় তার ফল লিখে ম্যানেজারবাবুর নিকট উপস্থিত করতে হয়, সেই খাতা। এই সালের।

তা-ও বেশীক্ষণ ভাল লাগলো না।

এক-এক জনের নিকাশ। চেকমুড়ীর সঙ্গে সেহার মিল আছে, না নেই। প্রত্যেক আইটেমে মিল আছে কি না। সেহার ঠিকগুলি যথার্থ কি না। সেহার দৈনিক টোটাল রীতিমত রেকর্ড বইয়ে উঠানো হয়েছে? সেহার আদায় কড়চায় ওয়াশীল দেওয়া হয়েছে? রিপোর্ট আছে খাতায়। খাতা রেখে দিয়ে তক্তাপোষ থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। নেহাৎ ঐ ব্যাণ্ড্ আর ব্যাগ-পাইপ থেমে গেছে তাই। নয় তো এতক্ষণ যেন হতভম্বের মত বসেছিল। আস্তে আস্তে উঠে চ'ললো বাগানের দিকে। মালীরা আছে, মালীদের সঙ্গে খানিক গল্প করবে। আলাপ করবে।

ওদিকে ছেলেকে গাঁতবার ব্যবস্থা করছেন মা। মায়ের মন্দিরের চত্বরে।

কুমারীর সঙ্গে যে বৃদ্ধাটি ছিলেন, তিনি একেবারে কাছাকাছি আসতেই পূর্ণশশী তাঁর সামনে গেলেন। বললেন,—এই মেয়েটি আপনার কে?

বৃদ্ধার হাতে ছিল মায়ের পাদপদ্মের নির্ম্মাল্য। আর একটি হাত ঐ কুমারীটি ধ'রেছিল। বৃদ্ধা বললেন,—আমার ছেলের মেয়ে, মা! কে বল' তো তুমি? ও আমার নাতনী।

পূর্ণশশী মৃদু হেসে বললেন,—ঐ উনি বলছিলেন খোঁজ করতে। আমাকে শুধোতে বললেন।

কুমুদিনী এগিয়ে এলেন। কুমারীটি অবাক-চোখে তাকিয়ে থাকে। কুমুদিনী বললেন,—জাতে কি মা, ব্রাহ্মণ?

বৃদ্ধা বললেন,—হ্যাঁ মা। তা নয় তো কি? তা তোমাদের তো চিনতে পারছি না?

পূর্ণশশী বললেন,—কোথা থেকে চিনবেন? নাতনীটিকে দেখে যেচে কথা বলতে এসেছি। আমাদের একটি পাত্র আছে। দেবেন বিয়ে?

বৃদ্ধাটি হাসলেন কুমারীটির মুখের দিকে চেয়ে।

বললেই তো আর হবে না।

কোষ্ঠী দেখাতে হবে। মিল করাতে হবে। যোটক মিল না হলে কি ক'রে বিয়ে দেবেন? বিয়ে কি শুধু মুখের কথায় হয়? কুমুদিনী আর কথা না বাড়িয়ে বললেন,—আপনার ঠিকানাটা বলুন। আমি কথা কইবার জন্যে লোক পাঠাবো।

বৃদ্ধা বললেন,—কুড়োরাম ভট্টাচায্যির বাড়ী। আমার ছেলের নাম কুড়োরাম। কাশী মিত্তির ঘাট ষ্ট্রীট। কলিকাতা। এই তো আমার ঠিকানা। বললেই চিনতে পারবে।

কুমুদিনী আর শশী বৃদ্ধাকে প্রণাম করলেন। তার পর কুমারীটির চিবুকে হাত স্পর্শ ক'রে ত্বরিত পদে চললেন দ্বাদশ-মন্দিরের পাশের দালানে। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে। মাকে দেখলে, আর মায়ের ছেলেকে দেখবে না?

অজ্ঞ অশিক্ষিত হলে কি হবে, গায়ের রঙ ঠিক দুধে-আলতার মত। পরম কমনীয় কান্তি। রাণী রাসমণির মন্দিরের পুরোহিত। শাস্ত্রের মন্ত্র জানে না, তবুও পুরোহিত। তন্ত্র জানে না, তবুও। কিছু জানে না— তবুও, তবুও!

ঐ পুরোহিতের কৃষ্ণবর্ণ গুম্ফের ফাঁকে দেখা যায় হাসির রেখা। ভুবন-ভোলানো মাকে দেখে ভুলে গেছেন ত্রিভুবন। আবার দেখতে না পেলেই কাঁদছেন। কি বলতে বলছেন কি সব কথা। ইড়া পিঙ্গলা আর সুষুম্নার কথা তাঁর মুখে। বলছেন—'আমার নয়, তাঁর মুখের কথা। তিনিই বলাচ্ছেন। তাই বলছি। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।'

তাঁর ঘরেও দর্শনপ্রার্থীর সমাবেশ। তাঁকে ঘিরে ব'সে আছে। তিনি গান গাইছেন। হাসছেন। কথা বলছেন। আবার কখনও একটাও কথা নেই, একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি!

কুমুদিনী আর শশী ভূমিতে মাথা রেখে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। মানুষের ভিড় সরিয়ে তাঁর কাছে আর যেতে পারলেন না। শুনলে দু'-একটা কথা। পরমহংস কি বলছেন। কথামৃত। ভক্তেরা শুনছে। হাসির রোল উঠছে কখনও কখনও। তিনি কোনো কথার সূত্র ধ'রে হয়তো হাস্যকর উপমা দিচ্ছেন। উচ্চ মার্গের।

বাড়ীর লাগোয়া বাগান।

ঐ বাগানের এক দিকে আছে মালীদের ঘর। ছায়া-ঘেরা দরিদ্রের

সংসার। সপরিবারে থাকে। ভূমিদানের প্রজা, পরিশ্রমের বিনিময়ে থাকে আর খায়। বাগান সাফ রাখে, মাটি কুপোয়, কলম কাটে, গাছ-গাছড়ার তদারক করে। সাজি ভরে পুষ্পাহরণ ক'রে। মালীদের কয়েক জন একটা গাছের ছায়ায় ব'সে গজালী ক'রছিল। তাদের হুজুরকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো যে যার। মালিনীরা লজ্জায় ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো হাসতে হাসতে। তাদের শিশু আর কন্যাগণ এক পাশে খেলছিল কয়েকটা ছাগলের বাচ্চার সঙ্গে। তারা আর খেলা বন্ধ করলে না। শিশু অত-শত বোঝে না। বোঝে না, কে মনিব আর কে প্রভু।

—বাবু মশায়। হেথায় কি মনে ক'রে? মালীদের একজন এগিয়ে আসে আর বলে।—ফুল লিবেন নাকি? বানিয়ে দেবো একটা তোড়া?

—না না, ফুল চাই না। তোমাদের দেখতে এসেছি। ইদিক-সিদিক দেখতে দেখতে বললে কৃষ্ণকিশোর।—তোমরা ভাল আছো?

—আর বাবু মশায়, আপনার কিপায়, যেমন রেখেছেন। আছি, ভালই আছি। মনের সুখেই আছি। মালীদের মধ্যে বয়স্ক একজন বললে কথাগুলি।—তা বাবু মশায়, দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? একখানা কেদারা লিয়ে আসি, ব'সে ব'সে দু'দণ্ড কথা ক'ন আমাগোর সঙ্গে।

—না, কেদারা আর আনতে হবে না। হুজুর কথা বলছে যেন কথায় মন নেই। কেমন যেন অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য চলনে-বলনে। কেমন যেন উড়ু-উড়ু ভাব। মেজাজ নেই যেন কথায়।

বাগানের শেষ প্রান্তে আছে কয়েকটা তালপাতার চালা। দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কোন মানুষের বসতির জন্যে নয়, ঝাঁক-ঝাঁক পোষা হাঁস আছে। পাতি আর রাজহাঁস। তারা থাকে ঐ ঘর ক'খানায় রাত্রি-বেলায়। আর দিনে থাকে স্থলে নয়, জলে। গৃহলগ্ন ঐ পুকুরে।

সাঁৎরে চলে দলে-দলে। গুগ্‌লী আর মাছের খোঁজে জলে চক্কর দিয়ে বেড়ায়।

একজন পাইক ইতিমধ্যে দ্রুতবেগে এসে হাজির হ'লো। বললে,—হুজুর, ওস্তাদজির ছেলে এসেছেন। মাঙ্‌ছেন আপনাকে।

ওস্তাদজি! শুনেও যেন ক্ষণেকের জন্যে মনটা খুশীতে বিভোর হয়ে উঠলো। তবুও একটা কথা বলবার পাত্র পাওয়া গেছে এতক্ষণে। এই বিরহ দিবসে। ওস্তাদজির ছেলে। বাঘের বাচ্ছা বাঘ। যোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র। ওস্তাদজি ছিলেন কৃষ্ণকান্তর শিক্ষাগুরু, সহচর, তারিফদার। গানের সুর আর যন্ত্রের ব্যবহার শিখতেন কৃষ্ণকান্ত তাঁর কাছে। কালোয়াতী গাইতেন ওস্তাদজি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কৃষ্ণকান্ত তানপুরা ধরতেন। শিষ্য গুরুর কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রশংসা করতেন, গুরু শিষ্যের হাতযশ গাইতেন। কত আসরে যেতেন কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে। দেশ-বিদেশের কত গুণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। কত দুর্লভ সুর শিখিয়ে দিতেন। কত দেশী ও বিদেশী যন্ত্রের ব্যবহার। ওস্তাদজি ছিলেন পশ্চিমা মুসলমান, মিঞা নসিরুদ্দিন আলী তাঁর নাম। সেই নসিরুদ্দিনের ছেলে বসিরুদ্দিন।

সেই বসিরুদ্দিন এসেছে। কি মনে ক'রে?

অর্গাণ্ডির বুটিদার পাঞ্জাবীতে সাদা সুতোর কল্‌কা। ময়ূরকণ্ঠী রঙের আলপাকার লুঙী। পায়ে লাল ভেলভেটের শুঁড়তোলা জরিদার নাগরা। মাথায় লাল বনাতের ফেজ। পাঞ্জাবীর বুকে চুণীর বোতাম। হাতে চার রতি পোকরাজের আঙটি। মুখে তবক-দেওয়া পান। পকেট থেকে স্ফূর্তির ডিপে বের ক'রে স্ফূর্তি খেলে বসিরুদ্দিন। কাছারীর সমুখের প্রাঙ্গণে পায়চারী করতে লাগলো। বসিরুদ্দিনের বয়স এখন আর কত? এই সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ।

—মিঞা, তুমি যে আর আসো না? দূর থেকে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর। কাছে গিয়ে বললে,—চলো, বাজনার ঘর খুলতে বলি। অর্গান শুনব। তুমি ব'লে গেছলে, একদিন এসে অর্গান শুনিয়ে যাবে। সেই যে গেলে আর দেখা নেই!

পানের একটা পিক্ গলাধঃকরণ ক'রে বললে মিঞা,—কাশীতে ছিলাম অনেক দিন। সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে কনৌজে চলে গেলাম। ছিলাম না যে এখানে।

—অর্গান না শুনে ছাড়ছি না তোমাকে। চলো, বাজনার ঘরেই বসা যাক। আমি ঘর খুলতে বলছি। তার কথায় যেন অধৈর্য্য। চোখে-মুখে অদম্য ব্যাকুলতা। আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা নয়, মুখ থেকে কথা খসাতে না খসাতেই।

একটু হেসে মিঞা বলে,—আমার সাথে চল' না এখুনি, গান-বাজনা শুনে মেজাজ তর্‌র্ হয়ে যাবে। অর্গান আউর একদিন শোনাবো।

—কোথায় মিঞা? তার প্রশ্নে আকুল আগ্রহ।

বসিরুদ্দিন আবার মৃদু মৃদু হাসে। পান-রাঙা দাঁত দেখিয়ে। বলে, —আরে চলই না। গিয়েই দেখবে। গান শুনে উঠে আসতে চাইবে না।

গানের কিছুই বোঝে না। বোঝে না গৎ, তাল, মাত্রা, লয়ের খেলা। তবুও শুনতে ভালবাসে। গাছের ফুল কি সকলেই দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দেয় মন্ত্র বলতে বলতে? কেউ কি আর গন্ধে মুগ্ধ হয়ে পান করে না তার আঘ্রাণ?

—যাও যাও, দেরী ক'র না। পোষাকটা ভদ্দর ক'রে এসো। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। কথার শেষে বসিরুদ্দিন আবার স্ফূর্ত্তি মুখে দেয়। একটু হাসে যেন, কেমন অর্থপূর্ণ হাসি।

ইতি-উতি ভাবে কৃষ্ণকিশোর। ভাবে, মা বাড়ীতে নেই, কখন্ আসবে কে জানে। আর সে চলে যাবে গান শুনতে! মাকে না জানিয়ে? তবুও বাড়ীতে যেন আর ভাল লাগছে না। যেতে ইচ্ছা হচ্ছে এমন কোথাও, যেখানে গেলে আইভিলতাদের ঐ শূন্য বাতায়ন-পথ নজরে পড়বে না। কৃষ্ণকিশোর বললে,—তুমি অপেক্ষা করবে এখানে? চল' না বৈঠকখানায় ব'সবে। আমি এখুনি তৈরী হয়ে আসবো। তুমি কিছু খাবে?

বসিরুদ্দিন মৃদু মৃদু হাসে। বলে,—তুমি কি আমার সাথে কুটুম্বিতা করছ? বেশ আছি এখানে, যাও চটপট। খাওয়া কি পালাচ্ছে!

কৃষ্ণকিশোর অন্দরের দিকে এগোয় আর মিঞা পায়চারী করতে থাকে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশ ত্যাগ ক'রে এগিয়েছেন আরও একটু। বশাখী রৌদ্রের তেজ কড়া হয়েছে।

মা বাড়ীতে নেই।

কুমুদিনী তখন মন্দিরের বাইরে, দোকানে সওদা করছেন। মন্দিরের বাইরে ফটক পর্য্যন্ত বসেছে যত দোকানপত্র। দর্শনপ্রার্থীরা বিকিকিনি করছে। লোহা আর পেতলের গৃহস্থালী, মাটির খেলনা আর পুতুল, পা-ছবি, আর কাচের জিনিষ-পত্র। কুমুদিনীও কিনছেন গেরস্থালী কিছু কিছু। শশীকে কিছু কিনতে দিচ্ছেন না। যা পছন্দ হচ্ছে তাঁর তাই কিনে দিচ্ছেন। নিজের জন্যে কিনেছেন খানকয়েক ছবি। মাতৃমূর্ত্তির ছবি, পরমহংস আর শ্রীমার ছবি। ছেলের জন্যে কিনেছেন সরস্বতীর রঙীন ছবি। দেখেও যদি একটু মন হয় পড়াশুনায়। সরস্বতী যদি কৃপা করেন। আর শশীর শিশু ছেলেমেয়ের জন্যে কিনে দিয়েছেন কয়েকটা মাটির রঙীন পুতুল। ডানা-ছড়ানো পরী, বাঘ, সিংহ, আরও কত কি!

কুমুদিনী সওদা করতে করতে বললেন,—দেখো বৌ, মেয়েটাকে

হাতছাড়া করা হবে না। মায়ের কাছে এসে পেয়েছি ওকে, পারি তো ওর সঙ্গেই বিয়ে দেবো ছেলের। তুমি কি বল' ?

শশী বললেন,—বেশ তো। আপনার যখন মনে ধরেছে তখন আর কথা কি। আর এমন যখন মেয়ে! কি রূপ! যেন সাক্ষাৎ প্রতিমা।

কুমুদিনী বললেন,—নামটা কি যেন বললে মেয়ের বাপের ? কুড়োরাম ভট্টাচার্য্য, কাশী মিত্তির ঘাটের রাস্তা—তাই বললে না ?

পূর্ণশশী বললেন,—হ্যাঁ। আমার মনে আছে।

সওদা শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু নেওয়া যায় কিনা দেখতে দেখতে কুমুদিনী বললেন,—চল' বৌ, ফেরা যাক।

গাড়ীতে উঠে ব'সলেন তাঁরা। পাইকটা সওদা রাখলে একটা ধামায়, যাতে উপচার এসেছিল পূজার। ধীরে-ধীরে গাড়ী চলতে শুরু করলে। ফটক পেরিয়ে রাস্তায় এসে পৌছলো গাড়ী। দর্শনপ্রার্থীর সমাবেশ, গাড়ীর গতি তাই মন্থর।

মিহি আদ্দির পিরান। চুনোট-কর কাঁচির ধুতি। সাপের চামড়ার সেলিম জুতো। হীরের বোতাম। তিন আঙুলে তিনটে জহরের আঙটি। রেশমের রুমাল পকেটে। মৃগনাভি আতরের গন্ধে চারি দিক আমোদিত ক'রে কৃষ্ণকিশোর হাজির হলো। মাথার চুলে বিলেতী পমেড্, এ্যালবার্ট কায়দায় চুল পেছনে তোলা।

অনন্তরামও কোথা থেকে এসে হাজির হলো। মিঞা নিয়ে যাচ্ছে, চাকর হয়ে সে আর কি বলবে। কথাটি বললে না।

বসিরুদ্দিন বললে,—সঙ্গে যেতে লজ্জা হচ্ছে। আমার তো এই ছিরি! তা চল' এখন যাওয়া যাক। কেউ পুছলে বলবে যে তোমার দেহ-রক্ষী। বডিগার্ড। কি বল' ?

কৃষ্ণকিশোর সলাজ হাসে। বলে,—কি যে বল', মিঞা! তোমাদের গুণেই তোমাদের পরিচয়। আর আমরা!

মিঞা বললে,—একটা কথা বলছিলাম। যাচ্ছো যখন, তখন কিছু টাকা সঙ্গে নিয়েছো তো? একেবারে কিছু না নিয়ে—

কথাগুলো শুনে যেন কিছুটা বিস্মিত হয় সে। ভাবে, টাকা দিয়ে গান শুনতে হবে? তবুও মিঞা যখন বলছে তখন লজ্জার খাতিরেও নিতে হবে টাকা। সে কাছারী থেকে সত্যিই টাকা নেয় একশো। কাগজের নোট। হাত-খরচা বাবদ খরচ লেখেন নায়েব মশাই।

রাস্তায় পৌঁছে জিজ্ঞেস করে বসিরুদ্দিন,—তোমাদের গাড়ী কোথায়? আস্তাবলে দেখলাম না তো?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—মা গাড়ীতে বেরিয়েছেন। পিসীমার ওখানে গেছেন।

একটা ফীটন যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। মিঞা থামালে গাড়ীখানা। বললে, —চল', এই গাড়ীতেই যাওয়া যাক।

গাড়ীতে উঠে ব'সলো দুজনে। ফীটন চললো শ্লথ গতিতে। পকেট থেকে ডিবে বের ক'রে গোটা কয়েক পান আর একটু স্ফূর্ত্তি মুখে দিলে মিঞা। হাসলে একটু, কেমন অর্থপূর্ণ হাসি! গাড়োয়ানকে বললে,—এই, হেঁকে চলো গরানহাটায়।

ঘোড়া দু'টোর পিঠে বার কয়েক সপাং-সপাং চাবুক মারতেই দ্রুত হ'ল যেন গাড়ীর গতি। মিঞা বললে,—একবার গান শুনলে আর উঠে আসতে মন চাইবে না। তার পর, দেখলে তো আর কথাই নেই!

গান শুনতে যাচ্ছে, গান শুনে চ'লে আসবে। দেখাদেখির কি আছে!

কৃষ্ণকিশোর আর কিছু বলে না। শুনে যায় কথা। মিঞা বলে,
—কলকাত্তা শহরে দু'টি আর পাবে না অমনটি! যেমন গলার আওয়াজ তেমনি—। কথা শেষ না ক'রে আবার একটু হাসে বসিরুদ্দিন।

জুড়ী আসছে। ফটকের রক্ষাকারী শুনতে পেয়েছে জুড়ীর রাস্তা-কাঁপানো শব্দ। সে উঠে আগে-ভাগেই ফটক খুলে দিয়েছে। জুড়ী রাস্তা থেকে সোজা ফটকে ঢুকলো। কুমুদিনী আর বিনোদা নামলো গাড়ী থেকে বাড়ীর দরজায়। শশী আগেই তাঁর বাড়ীতে নেমে গেছেন। কুমুদিনী সন্তর্পণে ধ'রে আছেন একটি তামার পাত্র। মায়ের চরণামৃত আছে। ছেলের জন্যে এনেছেন। অনন্তরামের মুখে ছেলে বসিরুদ্দিনের সঙ্গে বেরিয়েছে শুনে হতবাক্ হয়ে গেলেন যেন তিনি। তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল।

আর ছেলে তখন কোথায় কে জানে। ঠাকুরপোর ওস্তাদ নসিরুদ্দিনের ছেলে—বসিরুদ্দিন আলী আবার কোথা থেকে এসে জুটলো! কুমুদিনী জানতেন নসিরুদ্দিনের ছেলে বাপের মত নয়। তার নামে শুনেছেন যেন কি-সকল কথা। অনন্তরামের মুখে কথা ক'টা শুনে কুমুদিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। মায়ের চরণামৃতের পাত্রটা বুঝি বা প'ড়ে যায় হাত থেকে। কুমুদিনী চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে রইলেন অনেক্ষণ। চোখে যেন তিনি অন্ধকার দেখছেন। মুখে কোন কথা ফুটছে না।

আর ছেলে তখন বসিরুদ্দিনের সঙ্গে—

অনেক আশা নিয়ে মন্দির থেকে ফিরেছিলেন কুমুদিনী।

তাঁর মনের মধ্যে তখনও ক্ষণে-ক্ষণে ভেসে ওঠে সেই মুখখানি। সেই

কুমারী, যাকে তিনি ভাবী পুত্রবধূরূপে বরণ করবেন ভেবেছেন। শুধু তাই নয়, আরও অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা করেছেন সামান্য এই সময়ের মধ্যে। একটি মাত্র ছেলে, তার বিয়ে দিয়ে বৌ আনবেন ঘরে। বৌ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে সকলে। তাঁর ঘর আলো করবে ঐ বৌ। বুঝে নেবে সংসারের সব-কিছু। ছেলেকে বশে আনবে। বৌ দেখে চোখ টাটাবে কারও-কারও। কুমুদিনীও নিশ্চিন্ত হয়ে যা হয় একটা স্থির করবেন। বৌয়ের হাতে সব তুলে দিয়ে বাকী দিনগুলি তীর্থদর্শনে অতিবাহিত করবেন। কিংবা কাশীবাসী হবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুই মনে-মনে ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু কি কথা শুনলেন তিনি বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই! ছেলে সাজগোজ ক'রে বেরিয়েছে বসিরুদ্দিনের সঙ্গে! অনন্তরাম পুরানো লোক হয়েও পারলো না তার পথ রোধ করতে। ছেলের সঙ্গে না গিয়ে, একা-একা যেতে দিল তাকে। নিজের কপালের কথা ভাবতে ভাবতে কুমুদিনী হতাশার শ্বাস ফেলেন। অন্দরে গিয়ে রান্নাবাড়ীর দালানে ব'সে পড়েন ভাঙ্গামনে। ভাল-মন্দ কত কি মনে হয় তাঁর।

ব্রাহ্মণী আসে উপবাস ভঙ্গের উপকরণ হাতে।

কষ্টিপাথরের পাত্রে ফল আর মিষ্টান্ন, এক বাটি মিছরির জল। কুমুদিনী তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মিছরির জলটুকু এক নিমেষে শেষ ক'রে বলেন,—থাক্, আর নয়। ও সব রেখে দাও বামুন দিদি।

ব্রাহ্মণী সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী। বলে,—সে কি কথা! তা হবে না, অমঙ্গল হবে ছেলের। নাও, নাও, খেয়ে নাও। দু'টুকরো ফল আর একটা মিষ্টি খাও।

কুমুদিনী যেন তার কথা এড়াতে পারেন না। বলেন,—তবে দাও। কিন্তু ছেলেটা গেল কম্‌নে এই অবেলায়!

কোথায় আবার? গরানহাটায়।

হঠাৎ চলন্ত ফীটন থেকে নেমে পড়ে বসিরুদ্দিন। বলে,—এই গাড়োয়ান, বাঁধো হিঁয়া।

সঙ্গে-সঙ্গে থেমে যায় গাড়ী। একটা আধুলী গাড়োয়ানের হাতে তুলে দিয়ে বলে বসিরুদ্দিন,—এসে গেছে, নামতে হবে যে।

শহরের ইদিকটা দিনের বেলায় যেন ঘুমিয়ে থাকে। রাত্রি না হ'লে তেমন যেন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। তবুও যা দু'-চার জন লোক-জনকে দেখতে পাওয়া যায় তাদের দেখলেই বোঝা যায় যে, রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত। দু'পাশের দোকান-পত্রে খদ্দের নেই এখন। তবে, এখানে-সেখানে ক'টা দোকান লোকে পরিপূর্ণ। মাংস বিক্রী হচ্ছে। ঝুলন্ত পাঁটা সারি-সারি। মুণ্ডুগুলো লটকে প'ড়ে আছে দোকানের চাতালে। ক্রেতারা দাঁড়ি-পাল্লার দিকে চেয়ে আছে। দোকানে যেন রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। আর কয়েকটা কুকুর পাঁটার খুর-শিং পরস্পরে কামড়া-কামড়ি করছে। কোন-কোন খাঁটি হিন্দুর হোটেল থেকে পেঁয়াজ আর রশুনের গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। কারও ঘরের বারান্দায় পোষা-পাখি ডাকছে হয়তো। বিবিদের ময়না আর বুলবুলিরা কপচাচ্ছে একেক সময়ে। একটু কান পেতে শুনলে শোনা যাচ্ছে, হারমোনিয়ম আর তবলার বাদ্যধ্বনি। সেই সঙ্গে কোন নর্ত্তকীর নূপুর-নিক্কণ। কে তালিম নিচ্ছে কে জানে।

বসিরুদ্দিন বললে,—এসো আমার সঙ্গে-সঙ্গে। কে কোথায় দেখবে আবার, চটপট এসো।

খানিকটা পথ যেতে না যেতেই মিঞা ঢুকলো এক বাড়ীর দরজায়। মিঞা যেন কেমন ব্যস্ত হয়ে আছে! কি এক কার্য্য-উদ্ধারের আশায়

চোখ-মুখ তার ব্যগ্র। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চললো। সিঁড়িটা প্রায় অন্ধকার ও নোংরা। কত দিনের সংস্কারের অভাবে মানুষের পদক্ষেপে বাসুকীর ফণার মত যেন দু'লে উঠলো। অতি সন্তর্পণে সে মিঞার পিছু-পিছু উঠতে থাকে। ঠোক্কর খেতে-খেতে বেঁচে যায়। তাদের আসতে দেখে সভয়ে দৌড়ে পালায় কয়েকটা বেড়ালের ছানা।

সিঁড়ি শেষ হ'তেই চোখে পড়ে একটি ঘর। সাজানো-গোছানো। কিছুটা রুচির পরিচয় পাওয়া যায় যেন ঘরের ঘরণীর। দেওয়ালে আয়না। ব্র্যাকেটে বাতিদান। রঙীন ছবিতে নগ্ন নারীর নির্লজ্জ ভাবভঙ্গী। আদম আর ইভের নিষিদ্ধ ফল-ভক্ষণের ছবি। কুঞ্জ-কাননে ফোয়ারার ধারে রূপবতী নারীরা এলিয়ে প'ড়েছে। ঘরের ফরাসে কয়েকটা তাকিয়া। অথচ ঘরে মানুষ আছে কিনা বোঝা যায় না।

বসিরুদ্দিন হাঁক দিলে,—কৈ গো বিবিজান! দেখতে পাচ্ছি না কেন, নেই নাকি?

কৃষ্ণকিশোর এতক্ষণে যেন বুঝতে পারে। গান শোনার আশায় বিভোর হয়ে ছিল। ঘর-দোর দেখেই যেন সাড় ফিরলো। বললে,— কোথায় এসেছি মিঞা?

কেউ কোথাও নেই নাকি! সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কারও। এদিক-সেদিক তাকিয়ে মিঞা বললে,—তুমি ঐ ফরাসে গড়িয়ে পড়'। দেখি আমি কারও হদিস পাই নাকি।

ইতিমধ্যে কে একজন ঘরের এক দরজায় দেখা দেয়। একজন বয়োবৃদ্ধা নারী। বিপুল দেহের ভারে স্থাণুর মত আকৃতি। কাঁচা-পাকা চুলের একটা খোঁপা ঠিক মাথার তালুতে। নাকে একটা ঝুটো মুক্তোর নোলক। পান-খাওয়া পুরু ওষ্ঠাধর যেন মুখ থেকে ঝুলে প'ড়েছে। সাদা রঙের ফেঁসে-যাওয়া একখানা ঢাকাই শাড়ী পরেছে। মুখখানা

অস্বাভাবিক তৈলাক্ত। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে বললে,—বসিরুদ্দিন না?

একটু নকল হেসে মিঞা বলে,—তাই তো মনে হচ্ছে মাসী! কিন্তুক বিবিজানকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তেনাকে ডাকো না একবারটি।

—ইটি আবার কে? শুধোয় মাসী।

মাসীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মিঞা এক চক্ষু মুদিত ক'রে ইশারায় কি একটা ব'ললে। সঙ্গে-সঙ্গে মাসী দরজা থেকে অন্তর্হিত হ'ল। মিঞা ফরাসে ধপাস ক'রে ব'সে পড়লো। কৃষ্ণকিশোরও ব'সলো। বসির ব'সে ব'সে পা নাচাতে শুরু করলে। মুখে তার চাপা-হাসির রেখা।

একধারে ছিল একটা হারমোনিয়ম, ডুগী-তবলা আর এক তাড়া ঘুঙুর। হারমোনিয়মের কড়া ধ'রে ফস ক'রে টেনে নেয় মিঞা। চাবি-গুলো একে-একে খুলে বাঁ হাতে বাজাতে শুরু করলে দু' চোখ বন্ধ ক'রে। ঘরের স্তব্ধ আবহাওয়া ভঙ্গ হ'ল যেন এতক্ষণে। যন্ত্রচালিতের মত মিঞার বাঁ হাত খেলা শুরু করলে দ্রুত লয়ে হারমোনিয়মের বুকে। কি একটা গজল সুর ধরলে। গান গাইলে না, শুধু বাজিয়ে চললো।

কৃষ্ণকিশোর বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলো। ভয় আর উত্তেজনায় বুকটা যে দুরু-দুরু করছে! ঘরখানা কেমন যেন অদ্ভুত বিচিত্র মনে হচ্ছে। বিশেষতঃ দেওয়ালের ঐ ছবিগুলো।

—কে আমার বাজনায় হাত দিয়েছে? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো কে একজন। মুখে তার হাসির মৃদু উদ্রেক। এই মাত্র সাজসজ্জা ক'রেছে, দেখেই বোঝা যায়। ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা রঙ, টানা-টানা চোখে কাজলের সূক্ষ্ম রেখা, পাৎলা ঠোঁট দু'টো আলতায় রাঙানো। টিকালো

নাকে হীরের নাকছাবি। কানে ঝুমকো। রুক্ষ চুলের খোঁপা পিঠে ঝুলে আছে। গায়ে একটা ফিরোজা রঙের আঁটসাঁট নিমা। হলুদ রঙের রেশমী সাড়ী, সাপের মত যেন জড়িয়েছে তাকে। পা মুড়ে ব'সলো সে ফরাসে। বললে,—এমন অসময়ে কেউ আসে? এমন দিনের বেলায়!

বসিরুদ্দিন কোন উত্তর দেয় না। হারমোনিয়ম বাজিয়ে যায়। ফিক-ফিক হাসে। হঠাৎ বাজনা থামিয়ে বলে,—এসেছে তোমার গান শুনতে। দু'টো মিঠে গান শুনিয়ে দাও দেখি। বাবুর মেজাজ তর্‌র্ ক'রে দাও, বক্‌শিস নগদা-নগদি মিলবে। আমি তবলা ধরছি।

কথা শুনে বিবি সলাজ হাসে। শ্রোতাকে চোখ ফিরিয়ে দেখে বার কয়েক। বলে,—গলাটা ক'দিন ভেঙ্গে গেছে। তেমন কি গাইতে পারবো?

বসিরুদ্দিন বললে,—ভাঙ্গা গলায় গান জমবে ভাল। আর দেরী নয়, চটপট ধ'রে ফেলো, গহর।

ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো গহরজান। মুখে কেমন যেন অনিচ্ছার ভাব। মিঞা ঠেলে দেয় হারমোনিয়ম। টেনে নেয় বাঁয়া আর তবলা। হাতুড়ীর ঘা মারতে শুরু করে, সুর বাঁধে। মাসী একবার দেখে যায় ব্যাপার কত দূর গড়িয়েছে। গহরজান খেয়ালের সুর ধরে মিহি গলায়। কথা নেই কোন, শুধু গুঞ্জন। মিঞা হঠাৎ হাতুড়ী রেখে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে,—লিমনেড, আইস-ক্রীমের পালা উঠিয়ে দিয়েছো নাকি?

গহরজান বললে গান থামিয়ে,—বল' না মাসীকে। জোগাড় ক'রে দেবে।

বসিরুদ্দিন বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পাশের ঘরে যায়। মাসী সেখানে তখন পানের বাটা পেড়ে বসেছে পান সাজতে। বসিরুদ্দিন চুপি-চুপি বললে,—মাসী, একটা বোতল বের কর' দিকিন। আর দু'টো সোডা।

মাসী হাত পাতলে সঙ্গে-সঙ্গে। বললে,—ফেলো কড়ি মাখো তেল। টাকা কৈ?

বসিরুদ্দিন বিরক্ত হয়ে বলে,—মাসীর সেই পুরানো অভ্যেস আর গেল না। কেবল টাকা, টাকা আর টাকা। টাকা কি মারা যাবে! খাইয়ে আগে বেহুঁস করি বাবুটিকে, তারপর নাও না তোমার টাকা, কত নেবে তুমি। টাকা কি আর আমি দেবো? দেবে ঐ কাপ্তেন।

মুখ-বিবরে দু'টো পান আলগোছে পুরলে মাসী। বললে,—দাঁড়াও দিচ্ছি বের ক'রে। ঐ দেরাজটায় আছে। ততক্ষণ তুমি দু'টো কাচের গেলাস পাড়ো না ঐ তাক থেকে। গেলাসও চাই তো!

—চাই না আবার! গেলাসই তো চাই। দু'টো নয় তিনটে। মিঞা তাক থেকে গেলাস পাড়ে আর বলে,—গহর খাবে না? তিনটে গেলাস চাই যে।

মাসী বললে,—এই দিন-দুপুরে মেয়েটাকে বেহেড্ ক'রে দিও না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। এখনও রাত্তির বাকী।

—আরে যাঃ! মিঞা বললে,—তুমিও যেমন মাসী। সামান্য এক-আধ গেলাসে বেহেড্ হওয়ার মেয়ে ও?

মাসী দেরাজ খুলতেই দেখা যায় একটা বোতল নয়। সারি-সারি নানা আকারের অনেকগুলি বোতল সেখানে। দেশী আর বিলেতী, সোডা আর লেমোনেড। একটা মাঝারি সাইজের বোতল বের ক'রে দিলে মাসী। হাতে নিয়ে বললে বসিরুদ্দিন,—চাবি কৈ?

মাসীর মুখে পানের পিক্। মাসী বললে,—চাবি আবার তোমার কি হবে? তুমি তো দাঁতে বোতল খুলতে পারো। খুলে ফেলো না।

—ওঃফ্, মেয়েমানুষ বটে তুমি! কথার শেষে সত্যিই বসিরুদ্দিন দাঁতের কামড়ে খুললে একটা বোতল নয়—সোডার বোতলটাও খুলে ফেললে এক কামড়ে। সমান অংশে ভাগ করলে তিন গেলাসে ঐ

দুই বোতলের জল। প্রথমে দুটি গেলাস ব'য়ে নিয়ে গেল। একটা গহরজানের হারমোনিয়মের ওপরে বসিয়ে দিলে। আরেকটা ঐ কাপ্তেনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে,—নাও, তেষ্টা মেটাও। স্রেফ্ লিমনেড দিয়েছি।

আর কৃষ্ণকিশোর একান্ত অজ্ঞের মত, অত্যন্ত মূর্খের মত, না জেনে মুখে তুললে ঐ গেলাস! কেমন যেন বিস্বাদ লাগলো। ভাবলে, কৈ, লেমোনেডের মিষ্টতা! এমন তিক্ত কেন? তবুও ভয় আর উত্তেজনায় তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ—মূর্খের মত দু'-তিন চুমুকে শেষ ক'রে ফেললে ঐ গেলাস। গলা থেকে বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত কোহলের প্রতিক্রিয়ায় জ্বলতে লাগলো। মুখে তবুও কিছু বললে না। গন্ধটাও বিশ্রী লাগলো যেন। তৃষিত কণ্ঠ—জল, জল চায় শুধু।

বসিরুদ্দিন ফিরলো নিজের গেলাস হাতে নিয়ে। বসলো ফরাসে। অতি ধীরে-ধীরে তারিয়ে-তারিয়ে খেতে লাগলো একেক চুমুক। যেন অনেক দিন খায়নি এমনি ভাবে। গহরজান মিঞাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো সহাস্যে। গান ধরলো মিহি স্বরে কৃষ্ণকিশোরের চোখে চোখ রেখে। খেয়ালের সুর থেকে এ কোন্ সুরে চলে গেল গহরজান! খাটি উর্দ্দু থেকে সোজা বাঙলায়। খেয়াল থেকে টপ্পায়! গহরজানের চোখে যেন আবেদনের আবেশ। গহরজান এক পলকে দেখেই বুঝে নিয়েছে আগন্তুককে। সে যে কে তার পরিচয় না জানলেও বুঝেছে, এ পথে এসেছে এই প্রথম। গহরজান বুঝতে পেরেছে, খদ্দেরটি শূন্য-কুম্ভ নয়। বেশ শাঁসালো। গহরজান তার চোখে চোখ রেখে গাইতে লাগলো:

তবে কি সুখ হ'ত—

মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভালবাসিত।

কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,

ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥ * * *

পাঠক-পাঠিকা, বল' দেখি এ গান কার রচনা? গহরজান যে-গান ধ'রেছে এত মিষ্টি-করুণ সুরে সেটির রচনাকার কে? নিধুবাবু? বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগে যেমন রচনাকারের বিভ্রাট, কোন্‌টি যে কার সে বিষয়ে যেমন নিশ্চিত ধারণার কোন অবকাশ নেই, বাঙলা গানের প্রথম যুগেও ঠিক সেই বিভ্রাট হতে দেখা যায়। একের রচনা অন্যের নামে পরিচিত হয়েছে। যে-গান রামনিধি গুপ্তর নয় সেই ধরণের বহু সুরচিত গীত নিধুর নামে প্রচলিত। বস্তুতঃ নিধুর সমসাময়িক সুঠাম, সুকণ্ঠ শ্রীধর কথক ঐ গানের স্রষ্টা। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ ঐ শ্রীধরের জন্ম।

বসিরুদ্দিন তার শূন্য গেলাস রেখে দেয় এক পাশে। তবলায় বসে। ঠেকা দেয় গানের তালে-তালে। কৃষ্ণকিশোর কেমন যেন এলিয়ে পড়ে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে। তার সর্ব্বাঙ্গে কেমন উত্তেজনা! চোখের দৃষ্টিতে যেন নেই কোন স্থিরতা। কেমন যেন চাঞ্চল্য আর অধৈর্য্য। গহরজানের অপরূপ মুখশ্রী দেখেই সে বিমুগ্ধ হ'য়ে গেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। একজন নারী, পূর্ণযৌবনা রমণী, এত কাছাকাছি ব'সে আছে তার! এই আবহাওয়ায় এই সুমধুর গান—সম্মোহনের মত আকৃষ্ট ক'রেছে তাকে। তবুও ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছে একজনকে। তিনি এখন হয়তো ভাতের থালা নিয়ে বসে আছেন প্রতীক্ষায়।

কুমুদিনী? তিনি তখন সিন্দুক খুলে কোষ্ঠী বের করতে ব'সেছেন। জ্যোতিষীর কাছে সংবাদ চলে গেছে। পাইকের হাতে পত্র লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন নায়েব মশাই। লিখেছেন কয়েক ছত্র। 'মহাশয়, পত্রপাঠ চলিয়া

আসিবেন। স্বয়ং মা-ঠাকুরাণী সাক্ষাৎপ্রার্থী। বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন। পত্রবাহক আপনার পাথেয় লইয়া যাইতেছে।'

রাশি রাশি কোষ্ঠী আছে সিন্দুকে।

কর্ত্তারা শুধু পণ্ডিতের বিচারেই ক্ষান্ত থাকেননি। তাই একেক জনের একাধিক কোষ্ঠী আছে সিন্দুকে। ভদ্রেশ্বর আর মূলাজোড়ের পণ্ডিতদের বিচার আছে। কাশীর পণ্ডিতরাও কেউ কেউ আছেন। এমন কি, ভৃগুর অকাট্য বিচারও আছে। তবে, অধিকাংশই যথাযথ মেলেনি। অনেক মিলিয়ে দেখেছেন কুমুদিনী। কর্ত্তাদের যে-সময়ে যাওয়ার কোন কথা ছিল না, সেই অসময়ে তাঁরা চলে গেছেন।

তবুও বিয়ের কথায় কোষ্ঠী-বিচার হবে না?

রাশিতে রাশিতে না মিললে বিয়ে হবে কেমনে? রাশির মিল না হ'লে কথাই উঠতে পারে না বিয়ের। কুমুদিনী তাই সিন্দুক থেকে ছেলের কোষ্ঠী বের ক'রে জ্যোতিষীর প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন। আর একেক বার ঘড়ি-ঘরে অতীত সময়ের সশব্দ ইঙ্গিত শুনে চম্‌কে-চম্‌কে উঠছেন। ছেলেটা গেছে বসিরুদ্দিনের সঙ্গে, ফিরছে না এখনও?

খাস মহলে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু অনন্তরামের অবাধ যাওয়া-আসা এখানে। কর্ত্তার আমলের লোক, তার প্রতি আর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ হয় না। আর সে এমন কিছু জরুরী দরকার না হলে আসে না। অনন্তরাম দরজার বাইরে থেকে বললে,—একটা ছোঁড়া এসেছে। দেখা করতে চাইছে বৌঠান তোমার সঙ্গে।

কুমুদিনী কথাটা শুনেই কোষ্ঠী রেখে ঘরের বাইরে এলেন। অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে বললেন,—কে বল' তো অনন্ত?

—কে আবার! তোমার ছেলের বন্ধু একজন। জেতে ফিরিঙ্গী। অনন্তরামের কথায় যেন বিরক্তি। বিতৃষ্ণার স্বর।

—ফিরিঙ্গী! ছেলের বন্ধু? কুমুদিনীর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ তাই। তুমি যে সব-কিছু জানবে এমন কিছু কথা আছে? তা একবার যেয়ে সাক্ষাৎ কর'। বাড়ীতে নেই শুনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। একেবারে নাছোড়বান্দা।

রহস্যের জাল দেখতে পেলেন যেন কুমুদিনী। বললেন,—চল' যাচ্ছি। আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

বৈঠকখানার তক্তাপোষে পা ছড়িয়ে ব'সে প'ড়েছিল নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। সেই ভোরে বেরিয়ে এতক্ষণ টো-টো ক'রে ঘুরেছে কলকাতার শহরে। কোথায় কোথায় গেছে যেন। জাফরির ফাঁক থেকে দেখলেন কুমুদিনী ছেলের বন্ধুকে। দেখে যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র বার্ডসাই খাচ্ছিল। দেখছিল ঘরের ইদিক-সিদিক। দেখছিল দেওয়ালের ছবিগুলো। কৃষ্ণকিশোরের পূর্ব্ব-পুরুষদের। খাকীর পাজামা পরেছিল নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। গায়ে চকোলেট রঙের ভেলভেটিনের কোট্। মাথায় টুপী ফেল্টের। কুমুদিনীকে সামনে দেখতে পেয়েই তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে হাসতে হাসতে বললে:

A mother is a mother still
—The holiest thing alive.

কুমুদিনী অবাক চোখে চেয়ে থাকেন।

বুঝলেন না কিছু। উত্তর করলেন না কোন কথার। নর্ম্মান অরুণেন্দ্রই বললে,—ছেলে কোথায়?

কুমুদিনী বললেন,—জানি না তো।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র সাগ্রহে দেখে কুমুদিনীকে। দেখে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত। বলে,—Mother, I want money.

কুমুদিনী শুধু বললেন,—আমি তো ইংরিজী জানি না।

হেসে ফেললো নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। হাসতে হাসতে বললে,—আমি টাকা চাই। At least two hundred rupees. দুই শত টাকা চাই।

—কেন? কুমুদিনী বললেন। আমি তো তোমাকে চিনি না।

—তোমার ছেলে আমাকে জানে। আমরা একটা দল বানিয়েছি। টাকা চাই শুধু।

কুমুদিনী বললেন,—দল?

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র খানিক চুপ ক'রে থাকে। বললে,—For the freedom of India. Freedom of Mother Earth. দেশের মুক্তির জন্যে দল। আর কিচ্ছু জিজ্ঞাসা ক'রো না Mother. ক'রলেও আমি বলবো না। বলা নিষেধ আছে।

আবার যেন রহস্যের জাল দেখতে পেলেন কুমুদিনী। সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন ছেলেটির মুখের দিকে। কি দেখলেন। নর্ম্মান অরুণেন্দ্রর চোখের তারা দু'টো আগুনের বিন্দুর মত জ্বলছে কি? কুমুদিনী চেয়ে থাকেন শুধু। কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। ছেলে বাড়ীতে নেই, এমন সময় কে আবার এলো? এসে এমন ভিক্ষার পাত্র তুলে ধরলো? স্পষ্ট বললো, দাও টাকা দাও। টাকা চাই।

টাকা চাই। টাকা চাই না?

বই ছাপাতে হবে। গুপ্ত মুদ্রাযন্ত্র চাই। এখানে-সেখানে যেতে হবে, চাই পাথেয়। অস্ত্র জোগাড় করতে হবে—শত্রুর বিনাশ চাই। এইসকল কিছুর জন্যে চাই আর কিছু নয়—শুধু টাকা, টাকা আর টাকা চাই।

কুমুদিনী শেষ পর্য্যন্ত বললেন,—অপেক্ষা কর'। নগদ টাকা আমার হাতে নেই। ছেলের হাতে টাকা। ছেলেরই সম্পত্তি। তবুও তুমি অপেক্ষা কর'। কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনলাম না।

আবার হেসে ফেললো নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। বললে,—এই তো প্রথম দেখলে আমাকে। একবার দেখে কেউ কাকেও চিনেছে!

কথা বলার আদব-কায়দা দেখে কিছু আর বলেন না কুমুদিনী। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে চলেন। নর্ম্মান অরুণেন্দ্র তক্তাপোষে ব'সে পড়ে। অপেক্ষা করে ভিক্ষার প্রত্যাশায়। কুমুদিনী যেতে যেতে ভাবেন, কিন্তু ছেলের কি কূল-কিনারা হ'ল। গেলো কোথায় এই অবেলায়!

বসিরুদ্দিন তখন মাত্র এক গেলাস খাইয়েই খুশী হয়নি। আরও এক গেলাস অন্য কি এক ধরণের পানীয় খাইয়েছে। তাকিয়ায় মুখ থুবড়ে পড়েছে কৃষ্ণকিশোর। বসিরুদ্দিন গহরকে ইশারায় কি একটা কথা শিখিয়ে দিয়ে চলে গেছে পাশের ঘরে। মাসীর সঙ্গে গল্প করতে গেছে। গহরজান হারমোনিয়ম ঠেলে কাপ্তেনের গা ঘেঁষে ব'সেছে। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মাসী একটা রেকাবী বসিয়ে দিয়ে যায় ফরাসে। রেকাবীতে চিংড়ীর কাটলেট আর ফুলুরী ভাজা। গহরজান রেকাবী ধরে মুখের কাছে। তার হুঁস নেই—চোখে কিছু দেখতে পায় না। জ্ঞানহীনের মত তাকিয়া ধ'রে প'ড়ে থাকে।

গহরজান খাইয়ে দেয় অবশেষে। ক্ষুধার তাড়নায় খায়। দোকানের তৈরী ভেজাল-দেওয়া কাটলেট খায় চিংড়ী মাছের। গহরজান আরও একটু এগিয়ে যায়। একেবারে তার বুকের কাছে। গহরজানের ঠিক বুকের ওপর কৃষ্ণকিশোরের শ্বাস লাগে। গহরজানের একটা হাত সাপের মত তাকে বেষ্টন করে। সাড় ফিরে আসে ক্ষণেকের জন্যে, চোখ মেলে চায় কৃষ্ণকিশোর। ক্ষণেকের জন্যে চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ঘোর নামে। বলে,—বসিরুদ্দিন?

গহরজান চুপি-চুপি বলে তাকে বক্ষে চেপে ধ'রে,—মিঞা আছে। ভয় কি তোমার?

তন্দ্রাতুরের মত সে মাথা এলিয়ে দেয়। খুব নরম আর কোমল মাংসপিণ্ডের 'পরে বোধ করি ঘুমিয়েই পড়ে। ঘুম নয়, নেশাচ্ছন্নতায় জ্ঞানই হারায় হয়তো। আর মিঞা মাসীর সঙ্গে গল্প করে পাশের ঘরে। ফুলুরী চিবোয় আর মাসীর আত্ম-স্মৃতি-কথা শোনে। সূর্য্য তখন ঠিক শহর কলকাতার মাথার ওপর। ভরা-দুপুর এখন।

অরুণেন্দ্র ব'সে ছিল ভিক্ষার অপেক্ষায়। আরেকটা বার্ডসাই ধরিয়ে খাচ্ছিলো আপন মনে। অনন্তরাম হঠাৎ বিরক্তি সহকারে বললে,—এই নাও, মা দিলেন।

ভিক্ষা দেখে চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। চোখ ঝলসে যায়, হাত পেতে নেয় সাগ্রহে। বলে,—Many, many thanks! I will be ever grateful to her.

কুমুদিনী নিজের অঙ্গের একটি গয়না পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাল্কা ওজনের তাঁর গয়না। এক গাছা হাঙর-মুখো ফাঁপা বালা। নর্ম্মান অরুণেন্দ্র আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে বেরিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ। খুশীর জোয়ার নামে যেন মনে।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র যেন ঠিক ঝড়ের মত আসে আর ঝড়ের মত চ'লে যায়। কিন্তু ছেলে আসে না কেন এখনও! প্রতি মুহূর্ত্তে যার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান, তার জন্যে কেন তবে মন ছটফট করে কুমুদিনীর? যার সঙ্গে বেশ কয়েক দিন ধ'রে নেই কোন বাক্যালাপ, সে এলো কি না-এলো তাতে কি যায়-আসে? ছেলের বন্ধুকে দেখে কুমুদিনী আরও যেন

কোন হদিস খুঁজে পান না। দেখতে পান, কি এক অজানা জটিল ইঙ্গিত ঐ ফিরিঙ্গী ছেলেটির মুখাবয়বে। তার কথা আর ভিক্ষা-প্রার্থনায় বুঝতে পারেন জটিল সমস্যায় জড়িয়ে আছে তারা। কুমুদিনী ফিরে-ফিরে ঘড়ির দিকে দেখেন। দেখেন বেলা কত হ'ল। দেখে আর স্থির থাকতে পারেন না। নানা রকম চিন্তায় মন আন-চান করে। বসিরুদ্দিনের সঙ্গে গেছে শুনে কত কি ভাবতে থাকেন আকাশ-পাতাল। আর মনে মনে কামনা করেন, তাঁর এই শরীরের বিনাশ হোক। এত লোকের মৃত্যু হচ্ছে, তাঁকে কেন যম দয়া করছেন না? মনে করেন, তিনি চলে গেলেই সকল জ্বালা জুড়াবে। তিনি বেঁচে আছেন, সেই জন্যেই তো এত কিছু চিন্তা আর ভাবনা!

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। বিধির নিয়মই নাকি এই।

আবার দরজার পাশে উপস্থিত হয় অনন্তরাম। বলে,—জ্যোতিষী এসেছেন। তোমার পত্তর পেয়েই নাওয়া-খাওয়া ফেলে হাজির হয়েছেন। কি বলব' তাঁকে?

কুমুদিনী বললেন,—বল', আমি নীচে নামছি এখুনি। বিশেষ কথা আছে। কিন্তু অনন্ত, ছেলেটা তো এখনও ফিরছে না! গেছে বসিরুদ্দিনের সঙ্গে, আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে!

অনন্তরাম বিরক্ত হয়ে বললে,—গেছে তো আর কি হবে? বড্ড যে গান-বাজনায় টান! কেউ জাহান্নমে গেলে তুমি তাকে মোড় ঘোরাতে পারবে? তোমার সাধ্যি আছে?

জাহান্নমে সত্যিই কি ছেলে যেতে চেয়েছে? গেছে তো শুধু ঐ মিঞার কথায়। বসিরুদ্দিন না নিয়ে গেলে জানতো কোথায় গরানহাটা? কোথায় টাকা দিয়ে গান শুনতে পাওয়া যায়? শহর কলকাতায় কোথায় কি আছে সে কোত্থেকে জানবে, যদি না ঐ বসিরুদ্দিন—

অনন্তরাম আরও বললে,—শুনলাম গেছেন আবার খালি হাতে নয়। নায়েবের কাছ থেকে কিছু টাকাও নিয়ে গেছেন।

—অ্যাঁ! কথাটি শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন কুমুদিনী। বললেন,—সে কি কথা অনন্ত!

—তবে কি বলছি তোমায়! আমি তো আর জানতুম না, নায়েব এই মাত্তর বললে আমার কানে-কানে। বললে অনন্তরাম, অদৃশ্য কুমুদিনীর উদ্দেশে।

মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না কুমুদিনীর। ক্রূরতার একটা কাঠিন্য ফুটে উঠলো তাঁর চোখে। হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ঘরের একখানা ছবিতে। অশ্বারোহীর বেশে কৃষ্ণচরণের তৈলচিত্রে! স্বামীর প্রতি তাঁর যেন পরম অভিমান হয়। অসহ্য এক জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত্ত দেখেই স্বগত করেন,—এই করতে রেখে যাওয়া হয়েছে আমাকে?

অনন্তরাম আবার কথা বলে,—তা হ'লে তুমি এসো, জ্যোতিষী বার-বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন।

হাতের কাছেই কখন্ রেখে দিয়েছিলেন কুমুদিনী। ছেলের কোষ্ঠীখানা। হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রুদ্র তপস্বিনীর মত তাঁর আকৃতি হয়েছে, অযত্নে বিন্যস্ত রুক্ষ চুল উড়ছে কপালের দুই তীরে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে সতেজ দৃঢ়তা। যন্ত্রচালিতের মত কুমুদিনী চললেন ওপরতলা থেকে নীচেয়, একতলা থেকে সদরের দিকে।

জ্যোতিষীর বাসা এই কাছাকাছি কোথায়।

ডাক পাঠাতেই তিনি উপস্থিত হয়েছেন। স্বয়ং মা-ঠাকরুণের ডাক পড়েছে তাই আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করেননি। যেমন অবস্থায় ছিলেন, সেই

অবস্থায় চলে এসেছেন। জ্যোতিষীর নাম কাঙালী। বাড়ীর দরজার মাথায় লেখা আছে আলকাতরার রঙে: শ্রীকাঙালী জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিনোদ। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্, হুগলী, ষাঁড়েশ্বরতলা নিবাসী ৺রাখহরি তর্কচূড়ামণির প্রপৌত্র।

বংশানুক্রমিক ব্যবসা রক্ষা ক'রে আসছে কাঙালী। পূর্ব্বপুরুষ জ্যোতিষ-চর্চ্চায় কালাতিপাত করতেন, কাঙালীও সেই ধারা বহন ক'রে চলেছে। কাঙালীর পূর্ব্বপুরুষের দেহের রঙ ছিল ঐ আলকাতরার মতই, কাঙালীও ঠিক সেই রূপ পেয়েছে। অন্ধকারে থাকলে কাঙালীকে নাকি চিনবার জো নেই। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায় কাঙালী। কাঙালীর শরীরে চোখ আর দাঁতগুলো শুধু সাদা—একেবারে শাঁকালুর মতই সাদা।

জাফরির পেছন থেকে বললেন কুমুদিনী,—একটি পাত্রীর ঠিকানা পেয়েছি। ছেলেটার কুষ্ঠীর সঙ্গে মিল হয় কি না, একটি বার তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসতে হবে।

কাঙালী এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় যেন। ভেবেছিল, কি না কি দরকার। শুনে বললে,—যথাজ্ঞা। সে আর এমন বেশী কথা কি? পাত্রীর গৃহের ঠিকানাটা—

কুমুদিনী বললেন,—এই কাগজে লিখে রেখেছি। আর এই ছেলের কুষ্ঠী। আমাকে কিন্তু রাত্রির আগেই ফলাফলটা জানাতে হবে।

কাঙালী বললে,—সে আর এমন বেশী কথা কি? অবশ্যই জানাবো।

একজন দাসী কাঙালীর হাতে দিয়ে যায় পাত্রীর পিত্রালয়ের ঠিকানা আর পাত্রের কোষ্ঠীপত্রখানা।

কুমুদিনী বললেন,—আর একটা কথা বলছিলাম। ছেলেটার সময়টা এখন কেমন, একটু যদি দেখো তো ভাল হয়।

কাঙালী কোষ্ঠী খুলতে শুরু করে। চোখ বুলোতে থাকে কোষ্ঠীর

মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত। কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে,—হ্যাঁ, বিবাহের যোগ আছে বটে এই সময়ে। সময়টা এখন ভালই, তবে কিনা সঙ্গদোষে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাঠে বিঘ্ন হবে, আর গৃহে অশান্তির একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি যেন।

জ্যোতিষীর কথাগুলো অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি মনে হয় কুমুদিনীর। সঙ্গ-দোষ; বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা; পাঠে বিঘ্ন; গৃহে অশান্তি—সব কিছুই তো ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এই সকল কিছুর ইঙ্গিত পেয়েই তো ছেলের বিবাহের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন কুমুদিনী। চার হাত এক ক'রে দিলে হয়তো এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। ছেলের মনটা ঘরে বাঁধা পড়তে পারে।

গরানহাটার সেই ঘরখানা তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। দরজা আর জানলাগুলো চুপিসাড়ে বন্ধ ক'রে দিয়েছে গহরজান। দিনের বেলায় রাতের অন্ধকার সৃষ্টি ক'রেছে। পাশের ঘরে গিয়ে বসিরুদ্দিনের সঙ্গে কি কয়েকটা কথা বলাবলি ক'রে আবার ফিরে এসেছে ঘরে। কি এক জোরালো পানীয়ের প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণকিশোর তখন অজ্ঞানের মত প'ড়ে আছে ফরাসে।

বসিরুদ্দিন ব'লেছে গহরজানকে,—আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি গহর। এখন তুমি চেষ্টা ক'রে দেখো ছেলেটার মন যদি বাঁধতে পারো। অগাধ টাকার একা মালিক—রাণীর হালে থাকবে তুমি।

কথাগুলি শুনে গহরজান শুধু হেসেছে। চটুল হাসি। মুখে আর বলেনি কিছু। বন্ধ ক'রে দিয়েছে ঘরের দরজা আর জানলাগুলো। তারপর একখানা হাত-পাখা হাতে নিয়ে ব'সেছে ঐ অজ্ঞানটার কাছ ঘেঁষে। বাজনাগুলো সরিয়ে রেখে দিয়েছে এক পাশে। হাত-পাখা

চালাতে চালাতে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। হাতের আঙটি আর জামার বোতাম ক'টা দেখেছে পরখ ক'রে। দেখে গহরজানের চোখে ফুটে উঠেছে কত আশা, মনে কত কল্পকথা। অন্ধকার ঘরে ঐ বেহুঁস ছেলেটার শরীর নিয়ে যেন খেলা করতে শুরু ক'রে দিয়েছে গহর। নিজের অঙ্গের শাড়ী আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। গহরজান যেন সম্মোহিত করেছে ফণিনীর মতো!

একেকবার চেতনা ফিরে আসতে কৃষ্ণকিশোর নেশাচ্ছন্ন হয়ে দেখেছে যে—সে যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা ফরাস নয়, একটা কোমল দেহ। পরিপূর্ণ যৌবনের একটি নারীমূর্ত্তি। তার পর গহরজান—

মাসীর সঙ্গে আর কাঁহাতক গল্প করা যায়। ফুলুরী ও গোটা-দুই কাটলেট চিবিয়ে বসিরুদ্দিন লাল-চোখে ঘরের কোলের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যিস বারান্দায় রেলিঙ ছিল তাই রক্ষে, নয়তো টলতে টলতে মিঞা ঠিক আছড়ে পড়ে যেতো। ওপর থেকে নীচের রাস্তা দেখে মিঞা। দেখে দোকান-পত্র, লোক-জন, আর ইদিক-সিদিকের বাড়ী-ঘর। কত রাত্রে দেখেছে এই বিচিত্র শহরাঞ্চল—ফূর্ত্তি আর উল্লাসে গুলজার। জোরালো আলোয় ভ্রম হয়েছে দিন না রাত? আর এখন? এখন যেন জেগেও ঘুমিয়ে আছে অঞ্চলটা। মানুষগুলোর ঘুম-ভাঙ্গা চোখ। শরীর সকলের ক্লান্ত, যেন। মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছে পেঁয়াজ আর রশুনের উগ্র গন্ধ। কে কোথায় তরিবতের মাংস রাঁধছে হয়তো। কোর্ম্মা কিংবা কাবাব বানাচ্ছে।

মাসী পাশ নেয় বসিরুদ্দিনের। পাশে দাঁড়ায় রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে। পানের পিক্ ফেললে মাসী বারান্দা থেকে। পচাৎ ক'রে পড়লো একজনের ফর্সা জামা-কাপড়ে। কোথায় লজ্জা পাবে, না মাসী হাসতে লাগলো খিল-খিল।

এক হাতে বসিরুদ্দিনের কনুইটা ধ'রে বললে,—ত্যাখ্, দোল খেললুম কেমন! ব'লেই হাসতে শুরু করলে মাসী। হাসি যেন আর থামে না।

যার গায়ে পড়লো সে তো হতবাক্।

বার কয়েক দেখলো শুধু সে। মাসীকে দেখে বোধ করি আর কিছু বলতে পারলে না। মাসী তখনও হাসছে। বসিরুদ্দিন শুধু বললে,—তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মাসী? লোকটাকে—

বসিরুদ্দিনের মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। কি একটা উগ্র কড়া মদের নেশায় বিভোর হয়ে আছে বসিরুদ্দিন।

মাসী হাসি থামিয়ে বললে—একটা ব্যবসায়ী গোপনীয় কথা। বললে,—দেখিস্ যেন ফস্‌কে বেরিয়ে না যায়! মেয়েটাকে যাতে বাঁধা রাখে সেই বন্দোবস্ত করিস্। দেখে তো মনে হ'ল বনেদী ঘরের—

মিঞা বিরক্ত হয়ে খ্যাঁক্ ক'রে উঠলো যেন। বললে,—ধ্যেৎ মাসী! তোমার কেবল ঐ ব্যবসাদারী কথা? মনটা আমার ভাল লাগছে না, একটা ছেলেকে অহেতুক কোথায় এনে তুললুম!

মাসী ধমক খেয়ে কথার মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেলো। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল বসিরুদ্দিনের কথা শুনে।

মাঝে-মাঝে গরম হাওয়ার একেকটা বেগ বইছে।

ভরা-দুপুরের শেষ। রৌদ্রের তাপ প্রখর, পথ প্রায় জনহীন।

• •

—এই মাসী?

মাসী কোন উত্তর দেয় না। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

আবার ডাক শোনা যায়।—মাসী খাবার ডে।

মাসী নিরুত্তর। ফিরেও তাকায় না। যে ডাকছে সে ডেকেই যায়। বলে,—মাসী, গহর টোকে ডাকছে। এই মাসী!

—আঁ মরণ! মাসী এতক্ষণে একটা কথা বলে।

বসিরুদ্দিন হাসে। যে ডেকেছে তার কাছে যায় টলতে টলতে। ডাক থামে না,—মাসী, খাবার ডে।

কোন মানুষ নয়। পশুও নয়। একটা পাখী। গহরের পেয়ারের একটা কাকাতুয়া। বারান্দার দাঁড়ে ব'সে ছিল ঝুঁটি ফুলিয়ে। মাসীকে দেখে কথা বলতে শুরু ক'রেছিল। হয়তো সত্যিই ক্ষুধায় কাতর হয়েছে।

গহরজানের আর সাড়া-শব্দ না পেয়ে বসিরুদ্দিন ঘরে গিয়ে একটা মাহুর বিছিয়ে সটান শুয়ে পড়লো হাতে মাথা রেখে।

একটা নধর-কান্তি বিড়াল কাছাকাছি এসে ব'সলো। দু'-চার বার ডাকলো মিউ-মিউ ক'রে। বসিরুদ্দিন তাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিতে চায়। নড়ছে না দেখে শেষ পর্য্যন্ত মারলো এক লাথি। মিউ-মিউ করতে করতে বিড়ালটা কিছু দূরে ছিটকে প'ড়লো।

মাসী সাড়া পেয়ে বললে,—আহা হা, মরে যেতো যদি? তুমি কি বল' তো? ও তোমার কি পাতের ভাত খেয়েছে যে, লাথি মারলে এমনি ধারা!

বসিরুদ্দিন বলে,—কুকুর আর বিল্লী, আদর দিয়েছো কি মাথায় উঠেছে।

মাসী বিড়ালটাকে কোলে তুলে নেয়। মুখে তার চুমু খায় কয়েকটা। বলে,—এ তোমার যেমন-তেমন বেড়াল নয়! জাতবেড়াল! কোথাকার মহারাজা দিয়েছে গহরকে। গহর শুনলে দেবে তোমাকে ঠিক ক'রে! চল্ ডালিম, তোকে চান করিয়ে আনি।

বিড়ালটির নাম ডালিম। গহরজান রেখেছে। ডালিমের কদর দেখে কে! গহরজানের সঙ্গী। দুধে আর মাছে তাই ডালিম হৃষ্টপুষ্ট। নধরকান্তি।

দেখতে দেখতে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢ'লে পড়েছে কখন্ সকলের অজ্ঞাতে। রশ্মিজালে নেই তেমন আর তীব্র দাহিকা। শহর কলকাতার আকাশ-চাঁচা অট্টালিকায় শীর্ষদেশে কে যেন মুঠো-মুঠো ফাগ ছড়িয়ে দিয়েছে। সূর্য্যের শেষ রৌদ্রালোকের রক্তিম বর্ণ অস্তাচলে। প্রতিবিম্বের ছায়া প'ড়ছে আকাশে। এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু ক'রেছে বৈশাখের। মানুষ যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এতক্ষণে, একটু হাওয়ার কাঁপনে।

বসিরুদ্দিনের ঘুম ভাঙ্গায় গহরজান। বলে,—আর কত ঘুমোবে? ঘরে ফিরতে চাইছে যে তোমার সাকরেদ!

মিঞা ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সলো। দেখলো গহরজানের আলুথালু বেশ। নেশার ঘোর তখনও কাটেনি মিঞার। গহরজান বললে হাসতে হাসতে,—এই দেখো মিঞা। আর, এই দেখো।

দু'টো হাতই দেখালে গহরজান। এক হাতের আঙুলে দেখালে কৃষ্ণকিশোরের হাতের একটা আঙটি, হীরে আর পান্নার একটা মারকুইস। আর এক হাতের তালুতে দেখালে ক'খানা নোট। কাগজের টাকা।

বসিরুদ্দিন বললে,—আদায় করেছিস্ তো?

গহরজান ওপরে-নীচে মাথা দোলালে। বললে,—হ্যাঁ, রূপ দেখে ভুলে গিয়ে দিয়েছে। বলছে যে—ভুলবে না আমাকে, আসবে ফাঁক পেলেই।

—এই তো চাই! বলে আর উঠে দাঁড়ায় মিঞা। বলে,—আমার দালালী? যাওয়া-আসার গাড়ী-ভাড়া?

কেমন খুশী হয়ে একটা নোটই দিয়ে দেয় গহরজান। বলে,—যাও যাও, সাকরেদকে এখন ঘরে নিয়ে যাও। বলছে, মা কোথায়? মায়ের কাছে যাবো।

—তাই নাকি? বলে বসিরুদ্দিন,—যাই তবে।

মা'র ঘরে তখন মা নেই। রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাস-মহল থেকে আবার নেমে এসেছেন সদরের দরজায়।

জাফরির আড়াল থেকে কথা বলছেন জ্যোতিষীর সঙ্গে। কাঙালী পাত্রীর পিত্রালয় থেকে ফিরেছে। সুসংবাদ। মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির কোষ্ঠীর মিল হয়েছে, যাকে বলে একেবারে রাজ-যোটক। কাঙালী ব'লছে,—মিল একেবারে অদ্ভুত হয়েছে। সে দিক দিয়ে বলবার কিছু নেই। তবে, তবে পাত্রীর বিবাহের কিছু পরেই একটা অপঘাতের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেন!

কুমুদিনী বলছেন,—অপঘাত! সে আবার কি? যোটকের মিল যখন হয়েছে তখন আর কোন কথা নেই।

কাঙালী বলেছে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। মিল যখন হয়েছে।

কুমুদিনী বললেন,—মৃত্যুযোগ দেখতে পেলেন?

কাঙালী অনেক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে,—তা তো কিছু দেখলাম না। অপঘাত মানে হয়তো চলতে-ফিরতে একটু ঘা খেতে পারে। এমনও হয় তো।

কুমুদিনী বললেন, দৃঢ় কণ্ঠে,—যাই হোক। আপনি তাদের কাছে গিয়ে পাকা কথা দিয়ে আসবেন। ওখানেই বিয়ে দেবো আমি আমার ছেলের। আর বলবেন যে, একটি কপর্দ্দকও চাই না আমার। মেয়েটিকে চাই শুধু। সব আমরা দেবো আমাদের বৌকে। আমি কুলগুরুর কাছে বিবাহের দিন স্থির করতে লোক পাঠাচ্ছি। এই বোশেখেই আমি বিয়ে দেবো।

কথা বলছেন, কিন্তু কথায় যেন মন নেই কুমুদিনীর। রাত্রি ঘনিয়ে এলো, আর এখনও ফিরলো না ছেলে। গেল কোন্ চুলোয়?

দাসী ছিল পাশে। বললেন কুমুদিনী,—নায়েবকে বল' জ্যোতিষীকে টাকা দেবে। গোটা কুড়ি টাকা যেন দেন। অনেক পরিশ্রম ক'রেছেন জ্যোতিষী। তেতে-পুড়ে গেছেন এই রোদ্দুরে।

টাকা পেতেই তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ষী বিদায় নেয়।

মায়ের মন। ভেবেছেন, চার হাত এক ক'রে দিয়েই পরিত্রাণ পাবেন। বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ এনেই চ'লে যাবেন মন যেখানে যেতে চায়। কাশী, বৃন্দাবন, যেখানে দু'চোখ যায়। কুমুদিনী ধীরে-ধীরে অন্দরের দিকে চলেন। ওপরে আর না উঠে পুকুরের দিকে চলেন। মনের মধ্যে তাঁর শুধু ছেলের মুখখানা ভেসে ওঠে না, ছেলের সেই ফিরিঙ্গী বন্ধুটিরও চেহারা যেন দেখতে পান। কে ঐ ছেলেটি?

এমন সময় পেছন থেকে দাসী বলে,—ছেলে ফিরেছে। নাট-মন্দিরে গিয়ে শালগ্রাম-শিলে নিয়ে বল্ খেলতে শুরু ক'রে দিয়েছে! পুরোহিত তোমাকে ডাকতে বললেন শীঘ্রি। ছেলে নাকি মদ খেয়েছে!

কথাগুলি শুনেই সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে কুমুদিনীর। তাঁর কানে যেন বজ্রপাতের শব্দ পৌঁছেছে। জিজ্ঞাসু চোখে দেখতে দেখতে হতচকিতের মত সেইখানেই ব'সে পড়েন। মূর্চ্ছাহত হয়ে প'ড়ে যান। দাসী কুমুদিনীর মাথাটি ধ'রে শুইয়ে দেয় সেইখানে। কোলে মাথা তুলে নিয়ে চেঁচাতে শুরু করে,—ওগো, কে কোথায় আছো! দেখে যাও মা-ঠাকুরণের কি হ'ল!

দাসী প্রায় কাঁদতে থাকে। সেই নাটমন্দিরে আর এই অন্দরের এইখানে যেন কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। শহরের অন্যান্য গৃহের তুলসীতলায় শঙ্খের ধ্বনি হচ্ছে তখন। শহর কলকাতায় তখন অতি ধীরে-ধীরে রাত্রি অবতীর্ণ হচ্ছেন, চুমকি-দেওয়া আঁচল বিছিয়ে।

মিঞা ফটকের কাছে ছেলেকে নামিয়ে দিয়েই পিঠটান দিয়েছে। ঠিকানা ব'লে দিয়েই খসে প'ড়েছে। আর ছেলেটা নেশার উত্তেজনায় বাড়ীতে পৌছেই সোজা নাটমন্দিরে উঠে প'ড়েছে। শালগ্রাম-শিলা নিয়ে বল্ খেলতে শুরু ক'রে দিয়েছে। কুমুদিনী শোনা মাত্র জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে আছেন। শুধু অনন্তরাম ব্যাপার দেখে-শুনে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে চরম দুঃখে।

দিকে দিকে তখন শাঁখের ধ্বনি হচ্ছে ঐকবাদনের সুরে। চুমকি-দেওয়া আঁচল বিছিয়ে রাত্রি দেবী অবতীর্ণ হচ্ছেন কলকাতার শহরে।

কেমন যেন একটা থমথমে আবহাওয়া।

মানুষের বসতি আছে কিনা ভ্রম হয়। তবুও ঝুলানো লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। কাছারী-ঘরে জ্বলছে দুর্গা-প্রদীপ। বেলা-শেষের বৈশাখী বাতাস বইছে এলোমেলো। লণ্ঠনগুলো দুলছে ধীরে ধীরে। তাঁবেদার, পাইক আর আমলারা জটলা পাকিয়ে ফিসফাস কথা কইছে। এই কিছুক্ষণ আগে যে আশাতীত ঘটনাটি তাদের চোখের সমুখে ঘ'টে গেলো, সেই গুরুতর বিষয়টির বিষয়ে যে যার মন্তব্য ব্যক্ত করছে। কাছারী-ঘরে খাতার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। দপ্তর ছড়ানো পড়ে রয়েছে। যক্ষপুরীর মত বাড়ীখানা যেন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। যেন দেখছে, দেখছে এই অঘটনের পরবর্ত্তী দৃশ্যপট। বহু শতাব্দীর সাক্ষী এই বাস্তুগৃহ—দেখেছে অনেক। অতীতকে দেখেছে, অভিজ্ঞের মত দেখছে এই বর্ত্তমানকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে। বৃদ্ধের যুবার প্রতি যে-দৃষ্টি ?

এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

নাটমন্দিরে ধৌতকার্য্য শুরু ক'রেছে পুরোহিতের সাঙ্গোপাঙ্গরা। মন্দির অপবিত্র হ'য়েছে শুধু নয়, অধিষ্ঠিত দেবতা পর্য্যন্ত অপবিত্রীকৃত হয়েছেন। পুরোহিতের ক্রুদ্ধ চক্ষু; ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি পদচারণা করছেন নাটমন্দিরে। এই মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত! মনে মনে শাস্ত্র মন্থন করতে শুরু ক'রেছেন। স্বীয় সঞ্চিত পুঁথির রাশি নামিয়েছেন মন্দিরের তেকাঁটা থেকে। দেখেছেন একেকখানি,—দেবস্তোত্র, মন্ত্র আর পূজা-পদ্ধতি। প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের কোন কিছু নেই, পুণ্যার্জ্জনের সকল কিছু আছে। আছে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ আর শ্রাদ্ধাদিকার্য্য-কথা। পাপক্ষালনের কোন কথা নেই?

কপালের বলিরেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠছে মধ্যে মধ্যে। পুরোহিতের মুখাবয়ব রক্তিমাকৃতি হয়ে আছে। গরদের ধুতি বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। কোঁচা আর কাছার ঠিক থাকছে না। উপবীত দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলে জড়িয়ে মধ্যে মধ্যে কি মন্ত্রোচ্চারণ করছেন কে জানে! পুরুষোত্তম, নারায়ণ, শালগ্রাম-নারায়ণের?

কলসপূর্ণ গঙ্গাবারি বহন ক'রে আনছিল একজন ব্রাহ্মণ—এক অনুচর। মুণ্ডিত-মস্তক। পুরোহিত চোখের সামনে তাকে পেয়েই সহসা শুধোলেন,—ঘটনাটির প্রারম্ভ কোথায়?

সেইখানে কলসীর জল ঢেলে দেয় ব্রাহ্মণ। ধৌত-কার্য্য করে। সবিনয় নিবেদন করে। বলে,—অনুমান করছি, বৎস মদ্যপান করেছে। অহো, ঐ বিধবা নারীর কি দুর্ভাগ্য!

—ভাগ্য-বিপর্য্যয়! কাতর কণ্ঠে বললেন পুরোহিত। সহসা কি মনে হতে বললেন,—তোমাকে একটি কাজ করতে হচ্ছে।

—আজ্ঞা করুন। বললে ব্রাহ্মণ। নতমস্তকে।

কি যেন চিন্তা করেন পুরোহিত। বক্র ভ্রযুগলে স্মরণের তীক্ষ্ণ চিহ্ন দেখা যায়। পদচারণায় বিরত হয়ে বলেন,—একটিবার শিরোমণি পণ্ডিতের গৃহে যাও। আমার নাম ল'য়ে বলো, ভবিষ্যোত্তর-পুরাণখানা একবার বিশেষ প্রয়োজন। এইক্ষণেই চাই। দেখিও, পথে অন্ধকার। সাবধানে পথ চলিও।

অনুচরটি সেইক্ষণেই যাত্রা করে শিরোমণির উদ্দেশে। যাওয়ার সময় দেখে একবার পেছন ফিরে। দেখে ঐ অতীত দিনের মূক সাক্ষীকে ; ইটের ঐ ইমারতকে।

আস্তাবলে জুড়ীর একটি চিঁহি-চিঁহি রব ডাকলো। কয়েকটা ডাঁস জ্বালাচ্ছে তাকে ! তাই ডাকলো বার কয়েক।

ঝি আর বাউড়ির দল তখন অন্দরে দস্তুরমত ফাজলামি শুরু ক'রে দিয়েছে। যে যার খেয়াল মত বলছে যা-খুশী তাই। তাদের মা-ঠাকরুণের জন্য কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করছে। কেউ বা তাদের হুজুরের এই বেলেল্লাগিরি দেখে হাসাহাসি করছে। টীকা-টিপ্পনী কাটছে।

আর কুমুদিনী তাঁর খাস-মহলে অশ্রুসিক্ত চোখে ব'সে আছেন। মূর্চ্ছাভঙ্গ হওয়ায় কোন রকমে ওপরে উঠেছেন কাঁপতে কাঁপতে। জানলার বাইরে তারকা-খচিত আকাশে চোখ মেলে আছেন চুপচাপ। দর-দর বেগে অশ্রু ঝরছে দু'চোখ থেকে। যেন তাঁর অশ্রুনদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেছে কি এক প্রচণ্ড ঝটিকায় ! সকল আশা আর আকাঙ্ক্ষা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। দুঃখ এবং ক্রোধ দু'য়ের সমান অনুভূতি—চক্ষে জল ঝরছে আর বক্ষে জ্বালা ধরছে।

নিদ্রা না নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল

ঐ একদিনের কাপ্তেন। অনন্তরাম বসেছিল মাথার কাছে। কপালে জলের ছিটে দিচ্ছিল অনন্তরাম। ওডিকোলন-দেওয়া জল।

প্রথম নারীসঙ্গলাভ এবং মদিরার উত্তেজনায় আত্ম-বিহ্বলতা। দুনিয়ার পবিত্র সকল কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা। অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার; সাবালকত্ব প্রাপ্তির অদৃশ্য-সুখে আত্মহারা। আর মনের গহনে ঐ মুখখানা গহরজানের। একটা আঙটি দিয়েছে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে; সাধ জাগে আরও মূল্যবান, আরও সৌখীন অলঙ্কারে মুড়ে দেয় ঐ রূপোপজীবিনীকে যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণ খুশী হয়। ওড়নার আড়াল থেকে দেখায় হাসিভরা মুখ। যদি চিনতে পারতো রূপের পসারিণীকে!

প্রথম কৌমার্য্য-ভঙ্গের খুশীভরা মনে আরও কত কি মনে হয়েছিল। গাড়ী থেকে নেমে তাই নাটমন্দিরে গিয়ে শালগ্রামকে পেড়ে খেলা শুরু ক'রে দিয়েছিল। কি বিচিত্র খেয়ালে!

চোখে জল পড়তেই চোখ চেয়ে তাকায়। শুশ্রূষাকারী বলে,—কি কেলেঙ্কারীটা করলি বল্ তো!

আচ্ছন্ন চোখ দু'টো কুঁচের মত রাঙা। অনন্তরাম যে কি বলছে বুঝতে পারে না যেন। চেয়ে থাকে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে।

হঠাৎ কোথায় যেন কামান-গর্জ্জন হ'ল। গুরু-গুরু ধ্বনি। কড়কড়িয়ে মেঘ ডাকলো। বিদ্যুতের কয়েকটা রেখা ছুটোছুটি শুরু করলো। কোথা থেকে এত দলিত কজ্জল-রাশির মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জমতে শুরু করলো। রণদুন্দুভি ধ্বনি আর বিদ্যুল্লতার খেলা! বৈশাখের প্রথম বারি-বর্ষণের ইঙ্গিত কি ঠিক এই রজনীতেই? আকাশের নক্ষত্র-রাশি লুকালো কোথায়?

পুরোহিতের অনুচরটি তখন পথিমধ্যে। উত্তরীয়ের আবরণে ঢেকে

ফেলেছে ভবিষ্যোত্তর পুরাণ। ক্ষণপ্রকাশ বিজলীর দেখায় গতি তার দ্রুত হয়। পথের ধূলিরাশি উড়ছে। কয়েক বিন্দু জলও যেন তীরবেগে পড়লো না ?

কুমুদিনী তাঁর খাস-মহলে এই ঝড়বৃষ্টির অনেক আগে থেকেই অশ্রুপাত করছেন। ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে চেয়ে .আছেন আর দর-দর বেগে কাঁদছেন। একজন দাসী একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন বসিয়ে দিয়ে যেতে আসে। ঘরে এক পাষাণ-মূর্ত্তির সহসা যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল। কুমুদিনী বললেন,—দাসী, আস্তাবল থেকে গাড়ী বের করতে বল'। অনন্তরামকে ডেকে দাও।

দাসী পুরানো আমলের। সাহস-ভরে বললে,—এই দুর্য্যোগে, এতের বেলায়, কোথায় আবার যেতে যাবে !

কুমুদিনী বলেন,—যা বলছি শোন'।

দাসী আবার বলে,—কিন্তুক, ভীষণ যে বিষ্টি নামছে !

কুমুদিনী আর বাক্যব্যয় করেন না। স্থিরদৃষ্টিতে একবার দেখেন শুধু। সেই কঠোর দৃষ্টির সমুখে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে পারে না দাসী। ঘরের বাইরে চলে যায় কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে।

দূরে কোথায় একটা বিকট বজ্রপাতের শব্দ হয় সজোরে। যুদ্ধক্ষেত্রে কামান গর্জ্জনের মত শোনায় যেন। ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি ঝরে আকাশে। খোলা জানলা দিয়ে জলের রেণু ভেসে আসে কুমুদিনীর চোখে-মুখে। জানলাটা তবুও বন্ধ করেন না। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। বিজলীর আলোয় দেখা যায় গাছপালা ঢলাঢলি করছে। দমকা হাওয়া বইছে ঝড়ের বেগে।

কোথায় কোন্ ঘরের খোলা-জানলা পড়ছে। জলদের জল-সম্পাতে গ্রীষ্মকালে কঠোর জ্বালায় প্রতপ্ত শহর যেন ধীরে-ধীরে শীতল হচ্ছে। আমলা থেকে বিনি-মাইনের তাঁবেদারগুলো পর্য্যন্ত এই দুর্য্যোগ

দেখে গুম মেরে আছে। মালিকের কীর্ত্তি আর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ দেখে দুঃখের ছায়া নেমেছে সকলের মনে। যাঁরা বহুদিনের মানুষ, যাঁরা এই বংশের উর্দ্ধতনদের দেখেছেন, তাঁরা অদ্যকার এই বিশেষ অঘটনের জন্য যেন দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন। বিগতদের মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁদের। আফসোস করছেন।

শিরোমণি তর্করত্নের বাস কিছু দূরে।

অনুচরের প্রত্যাবর্ত্তনে তাই কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। পথে অবিরাম বৃষ্টিধারা, তথাপি সে কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করে না। উত্তরীয়ে ভবিষ্যোত্তর পুরাণ আবৃত ক'রে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রেই পথ চলে। বিপরীত হাওয়ার দুরন্ত-বেগ গতি তার রুদ্ধ ক'রে দেয়। তবুও সে বারেক থামে না।

পুরোহিত তার সিক্তবাস দেখে কয়েক বার হায়-হায় করেন। গ্রন্থখানি গ্রহণ ক'রে বলেন,—যাও, বাস পরিবর্ত্তন কর'।

দীপের আলোয় ভবিষ্যোত্তর পুরাণ উন্মুক্ত করেন পুরোহিত। শালগ্রাম অপবিত্রীকরণের কোন প্রায়শ্চিত্ত-বিধান আছে কিনা দেখেন গ্রন্থে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় আঁখিপাত করেন। অবশেষে কি এক সমাধান দেখে সোল্লাসে হেসে উঠেন। আপন মনে। বার বার দেখেন সেই [illegible]া।

—এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি পুরুত ঠাকুর?

পুরোহিতের পেছনে কে কথা বলেন অতি গম্ভীর কণ্ঠে। পুরোহিত ফিরে দেখেন, এক রুদ্র সন্ন্যাসিনী! রুক্ষ কেশরাশি, তাঁর চক্ষুর তলদেশে

যেন মসীর প্রলেপ। দেহের শুভ্র রঙ মনে হয় পাংশু ও রক্তহীন। যেন নিষ্ঠা ও পবিত্রতার মূর্ত্তিমান প্রকাশ। দীপের আলোয় দৃষ্টিগোচর হয় তাঁর সজল, রক্তাভ চক্ষুর্দ্বয়।

পুরোহিতের মুখের হাসিও বিলুপ্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে। বলেন,—অবোধ বালক, কেন যে এই দুষ্কার্য্য করলো কে জানে! এ অপরাধের কোন দণ্ড নাই, কোন শাস্তি নাই। একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত অবলোকন করলাম, শালগ্রামশিলা-বারি পান। আজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

কুমুদিনীর শ্বেত-বস্ত্র। দীপের আলোয় দেখায় যেন শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি। স্থির, নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। শুধু কপালের পাশে স্পন্দিত হচ্ছে রুক্ষ কেশ। ঝ'ড়ো-হাওয়া বইছে যে এলোমেলো।

পুরোহিত বললেন,—মা, ক্রোধ সম্বরণ কর'। অতীতকে বিস্মৃত হও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। লাগাম আল্‌গা হলে শ্রীমানের বিপদে যাওয়ার সম্ভাবনা। মাতৃজাতির কর্ত্তব্য পালন কর'।

পুরোহিত বৃদ্ধ হয়েছেন। এই নারায়ণের সেবা তাঁদেরই বংশানুক্রমিক দেখেছেন এ বাড়ীর হালচাল। ভ্রূর চুলে তাঁর পাক ধ'রেছে। চোখে দৃষ্টি এখন ক্ষীণ। কুমুদিনী তাঁর কথাগুলি শুনলেন কি শুনলেন না রক্তাভ চোখ দু'টো শুধু দেখতে পাওয়া যায়, এখনকার মেঘের মত সজল যেন। আলো-আঁধারিতে হীরের মত জলছে। পড়ন্ত দু'ফোঁ জল মুছলেন কুমুদিনী চাদরের আঁচলে। বললেন,—আমাকে মার্জ্জ করবেন। যার ভবিষ্যৎ, সে দেখবে। আমি চললাম এখনি। এ বোশেখেই সে সাবালক হচ্ছে, আর চিন্তা নেই।

হাতের পুরাণখানা প'ড়ে যায় যায় হয়। পুরোহিত যেন হাওয়া বেগে কম্পমান। দন্তহীন মুখ। শিহরিত কথা বললেন,—যা অভিরু মুহূর্ত্তের ভ্রমে—

কুমুদিনী আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করেন না। সিংহাসন-ভ্রষ্ট শালগ্রামকে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন। প্রণামের শেষে নাটমন্দিরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। গাড়ী আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ভিজে গেছে এতক্ষণে। চললেন সেই দিকে, মাথায় অঝোর বর্ষার ধারা। আর ঘন ঘন বজ্রপাত জলদগম্ভীর শব্দে।

গাড়ীতে যখন উঠে ব'সেছেন, তখন প্রায় ছুটতে ছুটতে অনন্তরাম হাজির হ'ল একটা টোকা মাথায়। বললে,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন,—অনন্ত, চললাম। ঠাকুরঝির ওখানে আমি থাকবো। তুমি সব দেখো-শুনো। যেখানেই থাকি আমি, আমার খোরাকীর টাকাটা যেন পাঠিয়ে দেয়, কাছারীতে জানিয়ে দিও। সিন্দুক-ভর্ত্তি আমার গয়না রইলো। বৌমা এলে পাবে।

সত্যিই আবদুল রাশ আলগা করলে।

গাড়ী চলতে শুরু করলো ফটকের দিকে। আকাশ যেন কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বৃষ্টির বেগও যেন এই সময়টায় বর্দ্ধিত হয় উত্তরোত্তর। গাড়ী ফটকের বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় বাঁক খেতেই গাড়ীর দরজা থেকে দেখলেন কুমুদিনী। দেখলেন, যেন লক্ষ হাতছানিতে ডাকছে ঐ প্রাসাদ। আকাশের মতই যেন কাঁদছে লক্ষ চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে।

আবদুল যেন জানতো কুমুদিনী যাবেন কোথায়। সেও গাড়ী ছোটালে সেই দিকে যে-দিকে হেমনলিনীর শ্বশুরালয়।

যার জন্যে এত কাণ্ড সে তখন সবে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। চিনতে পারছে মানুষ। ঘুমের জড়তা কেটে গেছে। কেটেছে মদের ঘোর। উঠে পড়েছে বিছানা থেকে। কৃতকর্ম্মের কাহিনীর কিছু-কিছু মনে পড়ছে

যেন। মনে পড়ছে কি এক ভীষণ অন্যায় ক'রেছে ; কি এক অসম্ভব কল্পনাতীত অন্যায়। যার প্রায়শ্চিত্ত খুঁজছে পুরোহিত। সে এখনও জানে না। জানে না, কে একজন এইমাত্র চলে গেলেন। ত্যাগ করলেন এই গৃহ হয়তো চিরদিনের মত!

টাটকা বর্ষায় কতকগুলো ভেক বাগানে না পুকুরের তীরে কোব্র্-কোব্র্ ডাকতে লেগেছে। খেয়ালী বৈশাখী ঝড়-বৃষ্টি ; রুদ্রতা অসীম, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। বর্ষণ ক্ষান্ত হবে হয়তো। হাওয়ার বেগে ভেসে যাচ্ছে অঞ্জন-ঘন মেঘপুঞ্জ। বৃষ্টির বেগ যেন নেই তেমন আর তীব্র।

মা কোথায়? কেমন যেন আত্ম-সমর্পণের উদ্রেক হয়। অন্যায় করলে দোষী যেমনটি করে। যেতে চায় মায়ের কাছে। তাঁর পায়ের কাছে। খাস-মহল শূন্য। কৃষ্ণকিশোর গিয়ে দেখলো, খাস-মহল যাঁর দখলে ছিল তিনি সেখানে নেই। লণ্ঠনটা শুধু জ্বলছে। মাকে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে চলেছিল রান্না-বাড়ীতে, সিঁড়ির মুখে বিনোদার সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই বললে বিনোদা,—এখন থেকে তো হুজুরের পোয়া বারো। মেজাজের যা খুশী হবে, করবে। আমরা সব হুকুমের বাঁদী, যা হুকুম করবে তাই পালন করবো। দেখো হুজুর, আমাদের নিয়ে যেন বল খেলো না। দোহাই!

বিনোদা যে এত কথা কেন বলছে হুজুরের কিছুই বোধগম্য হয় না।—মা কোথায় রে?

—কোথায় আবার! তোমার কীর্ত্তি-কলাপ দেখে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। বিনোদা কথার সঙ্গে একটু হাসে বা।

—কোথায় গেছেন? কীর্ত্তিমান শুধোয় সবিস্ময়ে। বলে,—আঃ, বল্ না কোথায় গেছেন?

—বিরক্তি দেখো ছেলের। ইস্! কোথায় গেছেন তা কি আমাকে

ডেকে ব'লে গেছেন। বিনোদা কথার শেষে আর থাকে না সেখানে। খাস-মহলের তালায় চাবি দিতে যায়।

নবযৌবনা বর্ষার মেঘমল্লার রাগিণী বাজলো না বেশীক্ষণ। উতলা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে রাশি-রাশি মেঘ। হিমকণাবাহী বাতাস, শহর যেন কিছুটা স্নিগ্ধ হ'ল ধারা-স্নানে। ঝড়ে উড়ে গেছে হয়তো বাসা, কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে নিস্তব্ধ কোথায়।

বর্ষার জল পড়েছে। আর টুপ-টুপ ফুটেছে পাপড়ি ছড়িয়ে? মাঝে মাঝে বাতাসে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে। বাগানের যেদিকে বেলা-জুঁইয়ের এলাকা সেই দিক থেকে ভেসে আসছে সুমিষ্ট সুরভি। অন্ধকারে সেখানে যেন শুভ্র তারা ফুটেছে অসংখ্য। বৃষ্টির জলে এখন সদ্যস্নাত।

ঘরে ঘরে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না কুমুদিনীকে। রান্না-বাড়ীতেও নেই।

কোন বারব্রত কিংবা কোন পুণ্যকর্ম্মের জন্য হয়তো নাটমন্দিরে আছেন। এমনও হয়তো কোন কোন দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত নাট-মন্দিরেই থাকেন কুমুদিনী। এমন কত পূর্ণিমা আর অমাবস্যায়। কত ব্রত আর কত শুভ-লগ্নে। মা মন্দিরে আছেন মনে ক'রে নাটমন্দিরের দিকে এগোয় কৃষ্ণকিশোর। দেখে পুরোহিতের সাঙ্গোপাঙ্গরা মুছতে শুরু করেছে নাটমন্দির। ধৌতকার্য্যের শেষে।

মন্দিরের ভেতরে বেদীর পাশে ব'সেছিলেন পুরোহিত।

নারায়ণের বেশ-ভূষা আর শয্যা পরিবর্ত্তন ক'রে সবেমাত্র ব'সেছিলেন। বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন হয়তো। নাটমন্দিরের সিঁড়িতে আবার সেই মূর্ত্তিমানকে দেখে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বেদীমূল থেকে উঠে পড়লেন। চক্ষের দৃষ্টি তেমন আর নেই, দেখার ভুল হয়নি তো! চোখ

দু'টোকে কুঞ্চিত ক'রে দেখলেন। নাঃ, সেই মূর্ত্তিমান। সেই অবোধ, জ্ঞানহীন, হতবুদ্ধিই আসছে এই দিকে। পুরোহিত ত্বরায় গমন ক'রলেন আগন্তুকের সম্মুখে। বললেন,—এখন কোন্ অভিলাষে!

—মা আছেন এখানে? ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

ব্রাহ্মণের মুখে স্মিতহাস্য। কেমন বিচিত্র হাসি। তাচ্ছিল্য না অবজ্ঞার ঠিক বোঝা যায় না। বলেন,—না। এসেছিলেন এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে। চলে গেলেন।

—কোথায়? কোন্ দিকে গেলেন? কৃষ্ণকিশোরের মুখে দেখা দেয় ব্যাকুল ব্যস্ততা। কথায় কাতর কৌতূহল।

পুরোহিত আবার হাসলেন। মৃদু মৃদু হাসি। বললেন,—গন্তব্য ব্যক্ত করা হয়নি আমাদিগের সমীপে। গৃহ ত্যাগ করলেন, এই মাত্র জ্ঞাত

পুরোহিতের কথায় কেমন তাচ্ছিল্য না অবজ্ঞার রেশ শুনতে পেয়ে মনে মনে বিরূপ হয় এই বেতনভোগীর প্রতি। তবুও মনের ভাব চেপে রেখে বলে,—কেন গেলেন?

—কেন? আবার হাসলেন পুরোহিত। গভীর অর্থপূর্ণ হাসি। বললেন,—কেন, তাও কি আমাকে মুখে ব্যক্ত করতে হবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে কৃষ্ণকিশোর।

পুরোহিতের ওষ্ঠের হাসি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। বলেন,—মদ্যপায়ী পুত্রের অপকীর্ত্তির জন্য! নেশার বশীভূত হয়ে ছেলে যে গর্হিত কর্ম্ম করলেন, সেই লজ্জায়!

কথাগুলি শুনতে শুনতে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। শাল-গ্রামশিলার সিংহাসনচ্যুতির কথা স্মরণ হয়। সন্ধ্যার অতীত কাহিনী ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে। আর কোন বাক্যব্যয় করে না। অনুশোচনার উদয় হয়

কি মনে? ফুল, চন্দন আর ধূপ-ধুনার মিশ্রিত পবিত্র সুগন্ধে নিজেকে অত্যন্ত হীন আর হেয় মনে হয় যেন সেখানে। নাটমন্দির ত্যাগ করতে উদ্যত হবে, এমন সময় পুরোহিত আবার বলেন,—একটি নিবেদন ছিল। অন্যায় করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় যে!

কৃষ্ণকিশোর ফিরে দাঁড়ায়। বলে,—কি করতে হবে আমাকে?

পুরোহিতের রুষ্ট কণ্ঠ। বলেন,—প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত!

একজন নমস্য ব্যক্তি। কৃষ্ণকিশোর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কথাটি আর বলে না। পুরোহিত কাঁপতে কাঁপতে বলেন,—আজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় যে বিধানে, সেই বিধানটি পালন করতে হবে। আমি শালগ্রামশিলা-বারি দিই। পাত্রের জলটুকু বিনা দ্বিধায় খেয়ে ফেলতে হবে।

কথার শেষে মন্দিরের দিকে চললেন পুরোহিত। পাপিষ্ঠ সলজ্জায় দাঁড়িয়ে থাকে। পুরোহিতের গতিবিধি লক্ষ্য করে অনুতপ্ত হৃদয়ে। এক-জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তখন সছন্দে শান্তি না মঙ্গলস্তোত্র পড়ছে মূল সংস্কৃতে। —ভাবদেব মনুষ্যাণাং সংসারঃ স্বস্তিদায়কঃ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্যান্য সহকর্ম্মীরা কেমন যেন শুদ্ধ ও গম্ভীর বদনে ঘোরা-ফেরা করছে নাটমন্দিরে। যেন তারা মূক না বধির।

পুরোহিত রূপার একটি পঞ্চপাত্র ব'হে আনেন। জলপূর্ণ। বলেন,—পানের পূর্ব্বে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ কর' একশত আট বার। তৎপূর্ব্বে পরিধানের বস্ত্র পরিবর্ত্তন কর'। গায়ত্রীর মন্ত্র স্মরণ আছে তো?

রুদ্ধ কণ্ঠ কৃষ্ণকিশোরের। বাষ্পরুদ্ধ নাকি! বলে,—হ্যাঁ, ঘরে পৌঁছে দিতে বলুন কাকেও। আমি সেইখানে আছি।

আমলা থেকে বিনি-মাইনের তাঁবেদারগুলো পর্য্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে দেখে যেন এই পরবর্ত্তী দৃশ্যপট। দেখে রুদ্ধশ্বাসে। কি প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে কে জানে,

কিন্তু ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলেই বাঁচোয়া। আবার যদি পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করেন হুজুর!

ঘড়ি-ঘরের সজোর ঘণ্টা হঠাৎ পড়তে শুরু হয় কাকেও কোন রকম নিশানা না জানিয়েই। সময়ের অদমনীয় বাদ্যধ্বনি পরম উপেক্ষায় বেজে যায়। দর্শকবৃন্দ প্রথম শব্দটা শুনেই চমকে ওঠে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাসে ঝুলন্ত লণ্ঠনগুলো শুধু দু'লে যায়। দুলতে থাকে তাদের আলো। যেন মনে হয় কখন বা নিবে যাবে হয়তো।

অনন্তরামের চোখ দু'টো কেমন রাঙা হয়ে আছে যেন।

গরদের হাত-কোঁচানো ধুতি একখানা এগিয়ে দেয় অনন্তরাম। একটিও কথা বলে না। শুধু তার নাকে না মুখে শব্দ হয় ফোঁস-ফোঁস। হুজুর দেখে একবার ভৃত্যের মুখখানা। একটা পশমের নক্সা-তোলা আসন পেতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনন্তরাম। দরজার বাইরে পুরোহিতের একজন অনুচর দণ্ডায়মান, সেই মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণ। দু'হাতে দু'টি রৌপ্য পাত্র ধ'রে অপেক্ষা ক'রছিল। এক পাত্রে গঙ্গোদক আর অপর পাত্রে শালগ্রামশিলা-বারি। আসন পেতে দিতেই ভেতরে গিয়ে ব্রাহ্মণটি গঙ্গাজল ছড়িয়ে বসিয়ে দেয় পাত্র দু'টি।

ব্রাহ্মণ চলে যেতেই অনন্তরাম বাইরে থেকে বললে,—আমাকেও টাকা চুকিয়ে দিতে বল'। দেশে ফিরে যাই আমি।

গায়ত্রী বলতে বলতে কথাগুলি শুনতে পায়। কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। পবিত্র এক অনুষ্ঠানে ব'সে মনটা যেন হু-হু ক'রে ওঠে মা'র জন্যে।

অনন্তরাম দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে একটা জানলার ধারে

গিয়ে লুকিয়ে দাঁড়ালো। লুকিয়ে দেখে—সত্যিই কিছু করছে, না, করছে না। মুদিত-চক্ষে পূজায় ব'সেছে দেখেই পালিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। সে শূদ্র, তাকে যে দেখতে নেই ব্রাহ্মণের পূজাহ্নিক। সেখানে তার, ছায়াতেও অস্পৃশ্যতা। অনন্তরাম অদৃশ্য হয় ঠিক ছায়ার মতই।

নেশার ঘোরে একটা কিছু অন্যায় আর অস্বাভাবিক আচার-ব্যবহার এমন কিছুই নতুন নয়, এই বংশের রক্ত যার গায়ে আছে তার কাছে। নেহাৎ পিতা আর খুল্লতাত দুজনেই ছিলেন ভিন্ন ধরণের মানুষ। বয়সকালেই জেনে ফেলেছিলেন যেন কি ন্যায় আর অন্যায়, কি উচিত আর উচিত নয়। সর্ব্বত্র ব্যতিক্রম থাকেই, তেনারা দুই ভাই ছিলেন এই ব্যতিক্রম। একেবারে যাকে বলে বংশছাড়া। আর তাই তাঁদের অবর্ত্তমানেও এখনও বেঁচে আছে এই বিশাল সম্পত্তি। কোন স্থাবর আর অস্থাবর বন্ধক পড়েনি তেজারতের কারবারে। যেমন ছিল তেমনিই আছে।

নয় তো এ পরিবারে এখনও এমন কেউ-কেউ আছেন, যাঁরা সত্যিই দিলদরিয়া। উদার-চরিত। বছরের সব দিনই এক রকম, কিন্তু বছরের একটা সময় মরশুম আসে যেন তাঁদের। বাবুদের তখন আর গৃহে মন বসে না। যার যার মোসাহেবদের ডাক পড়ে। সদলবলে বাবুরা তীর্থযাত্রার মত যাত্রা করেন জমিদারীর কোন্ এক নিভৃত পল্লীতে। যেখানটা বাবুদের খাস-দখলে।

মোসাহেবরাই শুধু সঙ্গ লাভ করে না। যার যার সখের চাকর, যার যার বাক্স-বিছানা বহন করে। আর যায় কতকগুলো বন্দুক নানান্ জাতের। ছররা আর টোটা। বাবুরা তখন আর দেশী পোষাক পরেন না। দামী দামী স্যুট পরেন। ব্রিচেস্ পরেন। তামাকের স্বাদ ভুলে গিয়ে পাইপ ধরেন দাঁতে। বেশ দিন-কতকের জন্যে, ইহলোকের সকল সম্পর্ক যেন ভুলে গিয়ে তাঁরা যাত্রা করেন হাসতে হাসতে।

কি যেন নাম সেই জায়গাটার ?

হ্যাঁ, চর-বসন্তপুর। যেখানে নাকি শুনতে পাওয়া যায়, চিরদিন বসন্ত বিরাজ করে। চর-বসন্তপুর চিরসবুজ। বঙ্গোপসাগরের কোন এক মোহানার কাছাকাছি এই চর-বসন্তপুর। কাঁচা বাঁশের বন, যেদিকে তাকাবে সেদিকে। জলাভূমিতে পাটের ফসল অনাদরের। শীতের দিনে কুয়াশায় ঢেকে যায় চর-বসন্তপুর। বাঁশের পাতা থেকে টুপ-টাপ জল পড়তে শুরু হয় অবিরত। কুয়াশা জল হয় আর পড়ে। বঙ্গোপসাগরের দম্‌কা হাওয়ার ছিটেফোঁটা আসে সেদিকে, চর-বসন্তপুরে যেন তুফান বইতে থাকে তখন।

ঠিক এই শীতের সময় চর-বসন্তপুরে উড়ে আসে ঝাঁক ঝাঁক মরাল। চর-বসন্তপুরে আশ্রয় নেয় সপরিবারে। আর কত, তার সংখ্যা গণনা হয়! বোধ হয় কয়েক সহস্র। কেউ জানতে পারে না এই মরাল-যূথের আবির্ভাবের দিন, ক্ষণ, লগ্ন। এলেও কেউ জানতে পারে না। দলে দলে আসে তারা, চর-বসন্তপুরের তীরে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে। দেখতেও বিচিত্র—ছাই রঙের শরীর, লাল রঙের ঠোঁট। কুয়াশার সঙ্গে যেন তাদের রঙ মিশে যায়। শুধু চঞ্চুর রঙ কুয়াশায় ঢাকা পড়ে না। তাজা রক্তের মত লেগে থাকে কুয়াশার বুকে।

কাকদ্বীপ। লক্ষ্মীকান্তপুর। কুলপী। মাংলা আর জামীরা নদী। বঙ্গোপসাগরের মোহানা। পোর্ট ক্যানিঙের রাস্তা ধ'রে বাবুরা শীতের দিনে যাত্রা করেন। চর-বসন্তপুরের কুয়াশায় তাঁবু পড়ে বাবুদের। আর ঐ হংসবলাকারা বাবুদের বন্দুকের শব্দে ভয়ে আর ত্রাসে পাখা ঝাপটাতে থাকে কুয়াশা কাঁপিয়ে। চর-বসন্তপুরের বাতাসে বারুদের গন্ধ ভাসতে থাকে। হংস মেরে মাংস খান বাবুরা। মদ আর মাংস। আর, আর বলতে লজ্জা হয়, চর-বসন্তপুরে নিরীহ বসতি আছে দু'-চার ঘর, তাদের

নিটোল-দেহ সমর্থ মেয়েদের কয়েক জনকে কয়েক রাতের মত থাকতে হয় তাঁবুতে। আপত্তি করলে চলবে না। আসতেই হবে। খুশী রাখতে হবে শিকারীদের। নাচতে হবে, গাইতে হবে। কত অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক ঘটনায় যোগ দিতে হবে!

কৃষ্ণকিশোর সেই চর-বসন্তপুরের নামই শুনেছে এতদিন। দেখেনি কখনও। সবে এই প্রথম দেখলো নারী, আর আস্বাদ পেয়েছে মদিরার। চর-বসন্তপুরের কাহিনী শুনেছে কারও কারও কাছে, যেন এক কল্পনার স্বর্গরাজ্য।

পিসীমা তো শুনেই হতবাক্।

যেন বিশ্বাস করতেই পারেন না হেমনলিনী। ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে মুখ থেকে যেন কথা বেরোয় না। শুধু বললেন,—বৌঠান, আমি নিজে মরছি সোয়ামী আর ছেলে দু'টোর জ্বালায়! তোমার আবার এ জ্বালা এলো কোথা থেকে! দাদারা আমার কি ধরণের মানুষ ছিলেন! তাঁদের ছেলে হয়ে— ?

কুমুদিনীও সেই কথাটাই ভাবছেন তো। তাঁদের ছেলে হয়ে এ কি দুর্মতি! হেমনলিনী বার বার শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। পারেন না নয়, যেন বিশ্বাস করতে চান না। তাঁর অত আদরের, কত স্নেহের পাত্র সে, শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় হেমনলিনী নিজের ছেলেদের চেয়ে যে পৃথক্ কেউ কখনও মনে করেননি। তবে, ত্রি-মকারের উপাসক এক-আধ জন তিনি দেখেছেন, সেই জন্যেই হয়তো কুমুদিনীর মত অশ্রুবর্ষণ করছেন না, অবিচলিতের মত শুনছেন শুধু।

জহর আর পান্না সেই কখন যে বেরিয়েছে বেলা থাকতে! এখনও ফিরে

আসেনি। একেবারে যে আসবেনা তা নয়, আসবে হয়তো। এমন অবস্থায় আসবে যখন আর দাঁড়াতে পারবে না। টলতে টলতে সোজা যাবে বিছানায়। রাতের খাওয়াটা হয়তো খেয়েই আসবে বাইরে কোথাও থেকে। ঘরের খাবার ফেলা যাবে। আর তাদের জন্মদাতা পিতা, হেমনলিনীর পতি পরম গুরু, কুমুদিনীর ঠাকুর-জামাই, তিনি হয়তো কেন, সত্যি সত্যিই আর ফিরবেন না এই রাতটার মত। সিমলের কাছাকাছি কোথায় কার কাছে থাকবেন, ফিরবেন রাত ফুরিয়ে ফর্সা হলে আকাশ।

হেমনলিনী বললেন,—এই বোশেখেই বে দিয়ে দাও মেয়েটার সঙ্গে। রূপ আছে যখন বলছো, তখন তাই দেখেই ভুলে থাকবে।

দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের প্রাঙ্গণে দেখে ছেলের সঙ্গে যে-মেয়েটির সম্বন্ধ করছেন কুমুদিনী, তারই বিস্তারিত বৃত্তান্ত বলেছেন ননদিনীকে। শুনে একমত হয়েছেন হেমনলিনী। সেই কথাই বলাবলি করছেন দুজনে মুখো-মুখি বসে। এখানে ঘড়ি-ঘর নেই, কিন্তু ঘড়ি তো আছে। হেমনলিনীর ঘরের এক কোণে মেকেবের দামী টেবিল-ঘড়ি রয়েছে। ঠুং-ঠাং শব্দে বাজছে।

কুমুদিনী বললেন,—রাত কত হ'ল ঠাকুরঝি!

হেমনলিনী বলেন,—অনেক, প্রায় বারোটা। তুমি কিছু মুখে দেবে না বৌঠান—তা কখনও হয়?

কুমুদিনী কোন্ মুখে আর খাবেন। বলেন,—না ঠাকুরঝি, তুমি আর খেতে ব'ল না আমাকে। তুমি খেয়ে এসো, রাত ঢের হয়েছে।

—আমি তো খেয়ে আসবো। তোমারও খাবার নে আসবো সেই সঙ্গে। খেয়ে-দেয়ে দুই বোনে শুয়ে পড়বো'খন। একটা করুণ নিশ্বাস ফেলেন পিসীমা। আবার বলেন,—তোমার ভাবনা কি বৌঠান? আমি যখন রয়েছি, তোমার কোন চিন্তা নেই। কথা বলতে বলতে হেম ঘর

থেকে বেরিয়ে যান। বলেন যেতে যেতে,—কি কথা শোনালে বৌঠান! শালগ্রাম নিয়ে বল্ খেললে ছেলে! তাই বলি, ছেলে আর আসে না কেন ইদিকে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্তির আছে! ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা!

বাইরে নিশুতি রাত। আর এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া। হতাশার শ্বাস ফেলছে যেন এই যক্ষপুরী!

কেন কে জানে, ঘুম আসছে না চোখে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে পুরোহিতের আদেশে, তবুও ফিরে এলো না কুমুদিনী। শূন্য জুড়ী ফিরে এসেছে অনেক্ষণ। শোচনা আর লজ্জা; কুমুদিনীর না-ব'লে চলে যাওয়া; লোকজনের রোষদৃষ্টি—দুঃখের এক চাপা আবেগে ঘুম আসছে না চোখে। সুখ আর দুঃখের সমব্যথী টম্ শুধু এই বিনিদ্রার একমাত্র সঙ্গী। দরজা আগলে যেন ব'সে আছে টম্। সোঁ-সোঁ বাতাস বইছে বাইরে। ঘষা-কাচের লণ্ঠনে আলোর দীপ্তি নাচছে থরো-থরো।

আর থেকে-থেকে একটি অনিন্দ্য মুখবিম্ব সকল কিছুকে ছাপিয়ে উঁকি মারছে যেন ঐ আকাশের অন্ধকারে। তার আয়ত চোখে ইসারা আর ওষ্ঠাধরে চটুল হাসি যেন। কে সেই কুঁচবরণ, যার মেঘবরণ চুল! সে কি গহরজান? গহরজান? গহরজান?

ইতিহাস কি পরিবর্ত্তনশীল ?

এতদিন চলেছিল যে ধারায়, রাতারাতি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল ? যে-দিকে সূর্য্য উঠছিল, সেদিকে যেন আর উঠলো না। বন্ধন ছিঁড়ে গেছে আপনা থেকেই। ছেলেকে ত্যাগ ক'রে গেছেন মা। বজ্রের মত শাসন যাঁর কঠোর, কুসুমের মত মৃদু হয় না সে একটি বারের মত ? দয়া-মায়ার লেশ মাত্র নেই, এমনই ক্ষমাহীন ! সেই সদাগম্ভীর আর স্বল্পভাষীর কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে আর যেতে হবে না, মুক্তির বাতাস লাগে যেন গায়ে। পাঠ-শালা, যেখানে আর কিছু নয়, শুধু লেখা আর পড়া, ব্যাকরণের সেই শুষ্ক হাওয়ার সঙ্গে চুকে গেছে সম্পর্ক। দেবভাষার ধাতু-শব্দের জটিলতায় আর ভারাক্রান্ত করতে হবে না মন আর মস্তিষ্ক। ভট্টি, ভাস, বাণ আর মল্লি-নাথের শরণাপন্ন হওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। সন্ধির ঘন-ঘন বিচ্ছেদেরও চিন্তা নেই আর !

এখন যা মন চায় করতে পারো। বলবার কেউ আর রইলো না।

জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর দৃঢ় বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল খান-খান হয়ে। তাদের কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলে না, বিধবা বৌটার এই-সেদিনের-ছেলেটা মদ আর মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়লো এই কাঁচা বয়সেই ! একটা রাত যেতে না যেতেই হাওয়ায় হাওয়ায় জানলো কেউ কেউ। আর আর শরিকদারেরা, নসিরুদ্দিনের ছেলে বসিরুদ্দিনকেই যত নষ্টের মূল জানলো। জানলো, সে-ই পথ দেখিয়েছে। জেনে, সত্যিই মন থেকে অত্যন্ত খুশী হ'ল।

ঘুমটা ভেঙ্গেছে টম্ কুকুরের লাফালাফিতে। ভোর হ'তে না হ'তেই ঘরে ঢুকে কি একটা বই দাঁত আর নখের সাহায্যে ছিঁড়েছে কুটি-কুটি। বেড়ালে তেলাপোকা হত্যা করে যে-প্রক্রিয়ায়, ঠিক সেইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ছিঁড়েছে। কাগজের খড়-মড় শব্দে চোখ মেলতেই দেখলো

মের কীর্ত্তি। টুকরো-টুকরো বইয়ের পাতা। ঘরের মেঝেয় ছড়াছড়ি।

বললে না কিছু। দেখেও।

বিছানার কাছাকাছি কোথায় প'ড়ে ছিল প্যারীচরণের ফার্ষ্ট বুক! কে জানে, কেন যে হঠাৎ টম্ তার এই শতছিন্ন অবস্থা ক'রেছে। রাজভাষা ধূলায় লুণ্ঠিত ক'রেছে।

জানলার ওপরে রঙীন কাচের নক্সা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে। ভোরের প্রথম আলোয় যে যার রঙ বিকিরণ করে। ফুল আর লতাপাতার ডিজাইনে দেখা যায় সূর্য্যোদয়ের ইঙ্গিত। অনেক দূরের থেকে ভেসে আসে মুরগীর ডাক। আস্তাবলে সইসদের পোষা-মুরগীর পাল—গমের কুটো খুঁটছে আর ডাকছে থেকে থেকে।

ঝড়-বৃষ্টির রাত গেছে। ভিজে বাতাস বইছে এখনও। বর্ষার আমেজে এখনও যেন ঘুমিয়ে আছে কলকাতা। শুধু মুরগী ডাকছে। মুন্সিপালের গাড়ী যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। বিশ্রী শব্দ উঠছে থেকে থেকে।

বিছানা থেকে উঠে ঘরের বাইরের দালানে বেরিয়ে পড়লো মিষ্টি ভোর-বেলায়। দালানে যেতেই দৃষ্টি পড়লো একটা গাড়ী যেন ফটকের মুখে।

হাওড়া ষ্টেশনের একটা ছ্যাকরা গাড়ী কোন্ কেলাসের। এই ভোরের ট্রেনে ফিরেছেন ম্যানেজারবাবু। বিহার থেকে পুণ্যাহ মিটিয়ে আদায়-পত্র ক'রে ফিরেছেন প্রচুর মাল সঙ্গে নিয়ে। একখানা গাড়ীর প্রয়োজন হয়েছে। সিপাই আর পাইকরা মাল নামাচ্ছে গাড়ীর মাথা থেকে।

·

মহলের ফেরতা ম্যানেজারবাবু। শুধু হাতে আসবেন? কলসী কলসী দই, ঘিয়ের মটকী, বালুসাই গজার চ্যাঙ্গারী, বস্তা বস্তা কড়াই আর অড়হর। আরও কত কি। টাকার থলি, কারেন্সী নোট আর

রৌপ্যমুদ্রা। বিহারী প্রজাদের মাটির তলায় পুঁতে-রেখে-দেওয়া টাকা। চৈত্র কিস্তীর নগদান খাজনা আদায়ের টাকা। কিছু বা বকেয় খাজনার।

সম্পত্তির মালিকানার গর্ব্ব বোধ। অহঙ্কার হয়। যা-কিছু দেখছি সব আমার। এমন কি চাবিটিও। কুমুদিনী কত কষ্টে বাড়ী-ছাড়া হলেন তাতে কোন দুঃখ নেই! তাঁকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা নেই। বরং যেন স্বস্তির শ্বাস পড়ে। সম্পত্তি ও জমিজমা হাতে পাওয়ার তৃপ্তিতে কৃতকর্ম্মের ক্ষোভ আর থাকে না মনে। এখন যা-খুশী তাই করবে। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন যেমন-তেমন ক'রে কাটিয়ে দিতে পারলেই একেবারে মালিক হয়ে বসবে গদীতে। জমিদারীর রূপোর সিংহাসনে বসবে—যেটা আসন নয়, সিংহও নয়, তবুও রূপোর। মা যেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। নাগাল পাওয়া যায় না। না পাওয়া যাক্, গেছে যখন তখন আপদ গেছে। কে কার কথার ধার ধারে!

অনন্তরাম পেছন থেকে হঠাৎ বললে,—ম্যানেজারবাবু সদর থেকে ফিরেছেন। কত মালমসলা এনেছেন। তোলা-পাড়া করবার লোক কৈ? যে করতো সে তো—

অনন্তরাম বুঝতে পারে যে, রাতারাতি ভোল পাল্টে গেছে। চোখে আর মুখে যেন ফুটে উঠেছে মুক্তিলাভের আভাস। চালাক-চতুর নয়, মুখে যেন মূর্খামি মাখানো। জন্মাবধি দেখছে অনন্তরাম, চিনে ফেলেছে, যখনই দেখেছে তখনই। যেখানে ঝাঁটা থাকে সেদিক পানে চলে অনন্তরাম। ঘর-দোর পরিষ্কার করবে।

দালান থেকে দূরের একটা জানলা, অন্য কাদের, দেখা যায়। চোখ

প'ড়ে যেতেই লক্ষ্য করে অনন্তরাম—সেই মেয়েটা না? ভোরের আলোয় ঝলসে গেছে যেন জানলাটা। গুণ্ঠনে মুখখানার খানিক ঢাকা। তবুও চেনা যায়। সেই ভঙ্গী যাবে কোথায়! সেই অঙ্গভঙ্গী। রামধনু রঙের কি একটা সাড়ী প'রেছে, তায় সূর্য্যালোক।

ঘরে ঢুকে দেখলো অনন্তরাম, ঘরের মেঝেয় কাগজের ছেঁড়া পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে। টুকরো-টুকরো কাগজ। কি একটা বই; যেন দাঁতে কামড়ে কে ছিঁড়েছে কুটি-কুটি। পাতাগুলো দেখেই বুঝলে অনন্তরাম, ম্লেচ্ছ ভাষার সেই প্রথমভাগ। ছেঁড়া কাগজের বুকে কত টুকরো কথা মূক হয়ে আছে। হুজুরের সখের বিদেশী কুকুরের খেলা, আন্দাজ করে অনন্তরাম।

—যাক্, বাঁচা গেছে। বললে অনন্তরাম। হাসলে কৃত্রিম হাসি।

গৃহের যিনি কর্ত্রী তিনিই নেই।

একজন নারী! বাড়ী যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। যে দিকে দেখো সে দিকেই যেন তার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার অভাব যেমন মর্ম্মান্তিক তেমনি চক্ষুর পক্ষেও পীড়াদায়ক। তবুও যেন তার চলা-ফেরা আর কথা বলার শব্দ শোনা যায়। যেন কুমুদিনী আছে অশরীরী হয়ে কোথায়।

খোদ্ জমিদারকে দেখেই ম্যানেজারবাবু যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে একটি নমস্কার করলেন। বললেন,—মা চণ্ডীর কৃপায় অনুমান করি, সকলে কুশলেই আছেন?

ভদ্রতার খাতিরে প্রতি-নমস্কার জানালো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—হ্যাঁ। কিন্তু ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন?

ম্যানেজারবাবু হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—হুজুর,

নির্ঝঞ্ঝাটেই মিটে যাচ্ছিল, চলেও আসছিলাম নির্দ্ধারিত দিনে। সহসা, চণ্ডীপীঠ মৌজার প্রজারা, হুজুর, খাজনা দিতে অস্বীকার করলে। হুজুর, সে একেবারে একজোট হয়েই। তিন-চারটে গ্রামের প্রজা, সর্ব্বসমেত শদাবধি হবে।

—কেন? জিজ্ঞেস করলে কৃষ্ণকিশোর। কাছারীর দালানে বেতের আরাম-কেদারা টেনে নিয়ে বসলো।

ঠোঁটের কোণে চাপা-হাসির জের টেনে বললেন ম্যানেজারবাবু,—সে আর বলেন কেন, হুজুর। আপনাদের যেমন শরিকদারী ব্যাপার! আপনার প্রতিপক্ষ, যারা হুজুর আপনার গিয়ে ন' আনার মালিক, তারাই নাকি চণ্ডীপীঠ মৌজার মোড়লদের হাত ক'রেছিল। খাজনা দিতে মানা করেছিল। ব'লেছিল, চণ্ডীপীঠ মৌজার মালিক নাকি তাঁরা। খাজনা তাঁরাই আদায় করবেন।

—তাই নাকি! যেন এ্যাডভেঞ্চারের আভাস পেয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর।

নৌকা আর ট্রেনের ধকলে ক্লান্ত ম্যানেজারবাবু। বিহারের রৌদ্রে মুখখানা যেন পুড়ে গেছে। তামাটে রঙ মুখের। কিছুই যেন হয়নি এমনি একটা ভাব তাঁর কথায়। বললেন,—গরমেণ্টের হাতে এষ্টেট হুজুর আপনার গিয়ে। সোজা গিয়ে নর্থব্রুককে সকল বৃত্তান্ত জানাতেই বারোটা আর্মড্ গার্ড দিলে সঙ্গে। একেবারে হুজুর আপনার গিয়ে তকমা-আঁটা। তা হুজুর আপনার গিয়ে ঐ বারোটা দোনলা দেখেই তারা আর টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না। যে যার দেনা মিটিয়ে দিলে।

নর্থব্রুক সাহেব হচ্ছেন বিহারের একচ্ছত্র কমিশনার। একে খাস-সাহেব, তায় আই-সি-এস্। দেশের বাইরে ইংরেজের এমন স্বজাতি-বন্ধু

আর দু'টি আছে কিনা, ইংরেজই জানে না। রাজভক্ত নর্থব্রুক; আগে নেটিভ্ল্যাণ্ড, তার পর অন্য কিছু। বৃটেনের পক্ষ থেকে কার্য্যভার গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে এসেছে। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে বদলী হয়েছে বিহারে। রেল কোম্পানীর লাল নিশেনের ট্রলিতে চেপেই গোটা বিহার দেখে নিয়েছে। আর দেখেছে একখানা ম্যাপ সরকারী ছাপাখানার। বিহারের মানচিত্র। ভৌগোলিক।

নর্থব্রুকরা জানে গভর্ণমেণ্ট চালাতে হ'লে কোন দেশের ম্লান, মূঢ় আর মূকদের সঙ্গে মিতে পাতিয়ে কোন ফয়দা নেই। জাহাজ থেকে নেমেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে ভারতবর্ষকে দেখেছে নর্থব্রুক। দেখতো না, তার পূর্ব্বপুরুষদের দেওয়া শিক্ষায় দেখেছে। রাজত্ব করতে হ'লে চোখ মেলে রাখতে হয় যে।

দূরবীক্ষণের ভেতর থেকে দেখেছে নর্থব্রুক, ভারতবর্ষের জল আর মাটিতে পাশাপাশি দু'রকমের বসতি। আকাশ-চুমী নগর-সৌধ আর পর্ণকুটির। বন্দরে নেমেই দূরবীক্ষণের ভেতর মুসলিম রাজত্বের নিশানা দেখতে পেয়েছে। মহমেডান আর্কিটেক্চর, মুসলমিন স্থপতি—শেষ মুসলমান রাজত্বের বাকী অবশিষ্ট।

আর গায়ে গা মিলিয়ে কত যেন শঙ্কায় দাঁড়িয়ে আছে শত শত ঐ পর্ণকুটির! যত ম্লান, মূঢ় আর মূক দেশবাসী। এই রাজ্যেরই আসল অধিবাসী।

ম্যানেজারবাবুর প্রোক্ত নর্থব্রুকরা বেছে নিয়েছিলো দেখে দেখে।

যাদের চাল-চুলো আছে তাদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। যাদের সাত-পুরুষের বৈঠকখানা আছে তাদের সঙ্গে ভাব। আর যাদের ঐ পাতার ঘর—তাদের সঙ্গে আড়ি নয়, কাজের সম্পর্ক। এসো, চাকরী কর', মাইনে নাও। চাকর হও।

ম্যানেজারবাবুর লিখিত আবেদন-পত্র পেয়ে নর্থব্রুক একবার শুধু জেলাটার মানচিত্র দেখেছে। তারপর কি একখানা কেতাব দেখেই পেয়াদা পাঠিয়ে দিয়েছে ম্যানেজারবাবুর কাছে। সঙ্গে একখানা লেফাফা। 'আর্মড্ গার্ড দাও, জমিদারের পক্ষে।' ফাঁড়ির অফিসারকে চিঠি দিয়ে দিয়েছে।

নর্থব্রুক আপীল শুনেই বুঝে নিয়েছে, এ দেশের ঐ নগর-সৌধের মালিক জমিদারেরা। বকলমের মালিক। কিন্তু মুসলমান নয়, হিন্দু।

জমিদারীর মালিক দেখে-দেখে না ব'লে আর পারলে না। কাছারীর দালানের অর্দ্ধেকটা ভ'রে গেছে যে জিনিষ-পত্রে। বললে,—কত কি এনেছেন!

ম্যানেজারবাবু বললেন,—সে হুজুর আপনার গিয়ে যাকে বলে নাছোড়বান্দা। মানা শুনলে না।

কয়েকটা বাঁশের অদ্ভুত ঝুড়ি। কি আছে তাতে। থাজা না গজা? বললে,—ঐ চ্যাঙ্গারীতে কি আছে ম্যানেজারবাবু?

ম্যানেজারবাবু যেন বলতে ভুলে গেছেন। বলতে মনে পড়তেই বললেন,—সে আর বলবেন না হুজুর। ক' ঘর প্রজা দু'টো খাসি কেটে ছ'ড়ে পাঠিয়েছে হুজুরের জন্যে। জিনিষটা আর বেলা হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে জানিয়ে দিন মা-ঠাকরুণকে।

তাঁবেদারের দল নজরানার দ্রব্যাদি নিয়ে যায়। যেদিকে ভাঁড়ার সেদিকে।

কৃষ্ণকিশোর ম্যানেজারবাবুকে বলে,—কাছারীতে আক্রামুদ্দিনের ঠিকানা আছে? নায়েব মশাইয়ের কাছে খোঁজ করুন। তাকে ডাকতে পাঠাতে বলুন।

আক্রামুদ্দিন আবার কে ?

অনন্তরাম কোথা থেকে এসে হাজির হ'ল। একেবারে মুখোমুখি হয়ে ফিস্-ফিস্ বললে যেন কি। শেষে জোড় হাত ক'রে মিনতির ঢঙে বললে,—দোহাই, দাদু যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারেন। তিনি এই এলেন ব'লে! ফটকের সামনে আসতে দেখে এসেছি।

দাদু আসছেন। জানবাজারের দাদু। জীবনে যিনি কখনও কাঁদেননি। হেসেছেন। জানবাজারের সেই আঙটি-দাদু আসছেন। হাসতে হাসতে।

—দাদু! ছেলেবেলার খেলার হাসির সম্পর্ক দাদুর সঙ্গে। জানবাজারের দাদুর, ঠিক সাহেবদের মত চেহারা। বয়সের আধিক্যের কোন পরিচয় নেই, সদাহাস্যে যেন মুখর হয়ে আছেন। সাহেবদের মত ফর্সা রঙ দাদুর। রঙীন আদ্দির বুটিদার বেনিয়ান পরেন। মাথায় একটা অর্গাণ্ডির মুসলমানী নক্সা-তোলা টুপি। হাতের দশ আঙুলে দশ-দু'গুণে কুড়িটা আঙটি পরেন জানবাজারের দাদু। দেখলেই হাসেন।

—দাদু, পেস্তা লিবি? বাদাম লিবি? মতিয়া লিবি? আসমান লিবি? দুনিয়া লিবি?

দাদু এই কথাগুলি বলেন আর হাসতে হয় নাতিকে। দাদু বলেন আর সেই সঙ্গে হাসেন অট্টহাসি। দেখা হ'লেই বলেন। সেই ছেলেবেলার খেলা, হাসি-হাসি-খেলা দাদুর সঙ্গে।

এখনও দাদু ভুলতে পারেননি। দেখা হ'তেই বললেন শুধু,—দাদু, পেস্তা লিবি? কেমন আছো দাদু?

প্রণাম করতে হয় এই দাদুকে। দাদুর অনেক বয়স। মাথার চুল একেবারে পেকে গেছে। তবু সিঁথি আছে। পাকা চুল হ'লে কি হবে, ঢেউ-খেলানো।

—চলুন, সদরের ঘরে চলুন। এখানে গরমে আপনি কষ্ট পাবেন।

—না, দাদু। আর যাবো না। তোমার একখানা চিঠি আছে, চিঠিটা। পৌঁছতে এলাম। এই নাও তোমার চিঠি। বিয়াস্পি হোটেল থেকে পিটার পাঠিয়েছে তোমাকে। আমার চিঠির ভেতর পুরে দিয়েছে।

ইংলণ্ডের এক মহলের একটা হোটেলের নাম বিয়াস্পি। পিটার আছে সেখানে। পিটার হ'ল দাদুর কনিষ্ঠ পুত্র। কন্টিনেণ্টে কৈশোর থেকে যৌবন অতিক্রান্ত করছে। পিটার যে গেছে আর একটি বারও দেশমুখো হয়নি। পত্র-ব্যবহারের সম্পর্ক রেখেছে শুধু। টাকা ফুরোলেই পত্র আসে ঘন ঘন। জাহাজে ভাসতে ভাসতে চিঠি আসে সেই সাত সমুদ্রের ওপার থেকে।

—ফুলকাকা চিঠি দিয়েছেন? চিঠিখানা দাদুর হাত থেকে নিয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে ফেললে। চিঠি বের করতেই এক টুকরো কাগজ পড়লো মাটিতে। কাগজ নয়, একটি মুখ। আবক্ষ ছবি কার আবার!

দাদু মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আর দেখলেন না। ছবির পেছনে লেখা রয়েছে 'তোমার ফুলকাকীমা'। বরফ-নীল রঙের চোখের তারা তাদেরই একজনের ফটো। একজন বিদেশিনীর। লজ্জা আর ব্রীড়ায় আনত মুখভঙ্গী; ঘন কেশের বিচিত্র কবরী দু'পাশের বুকে এসে নেমেছে। বুকের কাছে মরশুমী ফুলের তোড়া ধরা দু'হাতে। বিদেশিনীর ঈষৎ আনত বিম্বাধরে বিনম্র হাসির ক্ষীণ রেখা।

দাদু সত্যিই আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে থাকলেন না। অনেক দূরে গিয়ে একবার ফিরে বললেন,—দাদু, আমি ভাই আসলাম।

আসলেন না, সত্যিই চলে গেলেন কি এক মনের দুখে। দাদুর কানেও পৌঁছেছে ঐ ছবির অধিকারিণীর কথা। পিটার গীর্জ্জায় গিয়ে বিয়ে করেছে যে তাকে। মন-উদাসী বিদেশিনী একজন ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করেছে। পয়সাওলা লোকের মেয়ে। বিয়াস্পিতে স্বামি-স্ত্রী আছে। পিটারের

কিছুর অভাব হয় না, মেয়েটির বাবা-মা সব কিছুর ভার নিয়েছে। অক্স-ফোর্ডে পড়তে গিয়েছিল পিটার। পড়াশুনা আর হয়নি। পিটার তার বাবাকে টাকা পাঠাতে পত্র দেয়, পিটারের যখন মদের আর টাকা থাকে না। পিটার তখন ঘন ঘন পত্র ছাড়ে।

পিটারের এই কীর্ত্তিতেই যত লজ্জা দাদুর। যেন সহ্য করতে পারেননি। পিটার খ্রীশ্চান হয়েছে, পিটার একজন শেতাঙ্গিনীকে—

সত্যি চলে গেলেন দাদু। পিটারের দুঃখে তিনি এখন আর হাসেন না! হাসেন যখন, তখন সে-হাসিতে যেন মনের উল্লাস নেই। পিটার দাদুর কলঙ্ক-স্বরূপ।

ফুলকাকা। শুধুই কি সে কলঙ্ক।

কৈ, কেউ বিলেতে গিয়ে রইল না? ফুলকাকা সেই ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন যাযাবরী মনোবৃত্তির, বাঙলা দেশে পড়া শেষ ক'রে অক্সফোর্ডে পড়বেন স্থির ক'রেছিলেন। ফুলকাকা পড়তে গিয়ে কিন্তু পড়লেন পাঠ্য-পুস্তক নয়। যত সব পড়ার বাইরের অপাঠ্য পুস্তক। ফুলকাকা সেখানে বই কিনে আর মদ খেয়েই ফতুর হচ্ছেন। বই আর মদ, মদ আর বই। আর এখন সেই সঙ্গে জুটেছে এক বিদেশিনীর সাহচর্য্য—যার রূপে নাকি প্রাচ্যের লাবণ্য; প্রতীচ্যের রঙের সঙ্গে অদ্ভুত অসামঞ্জস্য।

ফুলকাকার পড়ার সখ অসাধারণ।

বাঙলা সাহিত্যের খোঁজ রাখে না, অথচ কেম্‌ব্রিজের সর্ব্বশেষ ক্যাটালগও সঙ্গে রাখে। ক্ল্যাসিক হোক, আধুনিক হোক, বই ছাপা হলেই কিনে ফেলেন। ফুলকাকার পৃথিবী বই-পড়া বিদ্যায় গ'ড়ে উঠেছে, বাস্তবের সঙ্গে তাই পদে পদে বাধে বিভ্রাট। ফুলকাকা বাঙলার জল আর বায়ু পান করতে পায়নি, লণ্ডনের কি এক বিয়াল্লি হোটেলে গিয়ে বসবাস করছে। তিনিই পত্র দিয়েছেন তাঁর অভ্যাস মত। লিখেছেন :

'আয় চ'লে আয় এখানে। একবার দেখলে আর ভুলতে পারবিনে। তুষারের রাজ্যে শুধু মদ নয়, মার্ভেলাস্ সাইট্ দেখতে দেখতেই দিন কেটে যাবে। সভ্যতার শিখরে এরা বাস করছে; জীবন-যাত্রায় আমাদের মত স্বাদেশিকতা বজায় রাখতে যেয়ে দেশকে হারায়নি। রাজার জাতকে একবার দেখে যা। তোমার ফুলকাকীমা'র ফটো পাঠালাম, কনসারভেটিভ্ কুমুকাকী যেন না দেখে। অন্তরের ভালবাসা রইলো। ইতি—'

চিঠি পাঠের পরেই চোখ তুলে দেখলে জানবাজারের দাদু কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন। চ'লে গেছেন। বিপথগামী পুত্রের অপকীর্তিতে যেন ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন সেই সদাহাস্যমুখর মানুষ। যেন হাসতেই ভুলে গেছেন।

কনসারভেটিভ্ কুমুদিনী! ফুলকাকার স্বপ্নে আচ্ছন্ন মন নিয়ে সদরের দিকে চলেছিল কৃষ্ণকিশোর। হঠাৎ বসিরুদ্দিনের কণ্ঠস্বর পেয়েই থম্‌কে যেন পেছন ফিরলো। বসিরুদ্দিন! আবার এসেছে বসিরুদ্দিন? সূর্য্য ধীর গতিতে কখন্ এগিয়ে গেছে আকাশের শেষ সীমা থেকে। রৌদ্রে উষ্ণতা যেন!

—কেমন গান শুনলে বল' গহরের? বসিরুদ্দিন সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো।

গহর, গহরজান? এতক্ষণ যেন মন থেকে মুছে গিয়েছিল গত দিনের সেই গায়িকার হাসি আর গান—গান, হাসি, আর—

বসিরুদ্দিন কাছাকাছি আসে। বলে,—লাখ্ লাখ্ রূপেয়া দিয়েও শুনতে পাওয়া যায় না গহরজান বাঈয়ের গান। নাম শুনলে নেচে ওঠে কত লোক। গহরজানকে—

থামলো কেন বসিরুদ্দিন? কি বলতে চাইছিল। এমনই দুষ্প্রাপ্য যে,

টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না গহরজানকে? তার মানে কি যার-তার পাওয়ার সৌভাগ্য হয় না!

গত দিনের কিছু কিছু ছবির মত ভেসে ওঠে মনশ্চক্ষে বসিরুদ্দিনকে দেখে। খুশী হওয়ার চেয়ে যেটা হয়, সেটা এক রকমের লজ্জাই।

উত্তরের অপেক্ষায় থাকবার পাত্র বসিরুদ্দিন? এ-কথা থেকে সে-কথায় চলে যায়। বলে,—অর্গান না শুনিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তুক হুজুর, শুধু বাজাবো। গাইতে বোলো না।

অর্গান শোনাবে মিঞা? কথা কইবে না মনে ক'রেও কথা বললে গীত-পিয়াসী। বললে,—অর্গান শোনাবে?

—বলছি তো শোনাবো। বসিরুদ্দিন এদিক-সেদিক দেখে আর বলে,—শোনাবো আর খাবো দুপুর বেলায়। কি খাওয়াবে বল'। কিমার বড়া খাওয়াবে? কাঁকড়া খাওয়াবে? চিংড়ী না খাওয়াও, দাড়ার ঝাল? কি খাওয়াবে বল'?

মুখ ফুটে খেতে চাইছে বসিরুদ্দিন। কিন্তু ভাঁড়ারে এদের মিলবে না যে।

—হ্যাঁ, খাওয়াবো। বাজনা শোনার কথায় সে সব আর মনে থাকে না।

বসিরুদ্দিন কথায় কথায় কাছারীর আওতা থেকে বেরিয়ে যায়। একশো আটটা সিঁড়ি দেখে বলে বসিরুদ্দিন। বলে,—যেন হিন্দুদের স্বগ্যের সিঁড়ি! খাওয়াবো, মুখে বললে তো আর হবে না, তার বন্দোবস্তের হুকুমটাও হয়ে যাক্।

অনন্তরাম এলো কোথা থেকে। রুখে যেন দাঁড়ালো। কথায় হাসির রেশ টেনে কথা বললে বসিরুদ্দিন। অনন্তরামের সঙ্গে। বললে,—কোথায় থাকা হয়?

—যেখানে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে। অনন্তরাম বলে।

—ইটি কে আছেন হুজুরের ? বসিরুদ্দিন অনন্তরামের এমন উত্তরটা আশা করেনি। কথার ধরণ দেখে কে আছেন জানতে ব্যস্ত হয়। অথচ লোকটার পরনে মলিন বস্ত্র।

অনন্তরাম কে তাই বলতে গিয়ে, অনন্তরাম কে তা আর বলতে পারে না যেন। মাইনের চাকর, বলতে পারে না। অনন্তরাম কে ?

কে অনন্তরাম ? অনন্তরামই বললে,—আমি একজন তাঁবেদার।

—তবে তুমি তো চুপ ক'রে থাকবে। তুমি বুঝি হুজুরের নগিচ নগিচ ছাড়া থাকতে পারো না ?

—চল' মিঞা, বাজনার ঘরে চল'। অনন্তদা, ওস্তাদজী এখানে খাবে, ওর জন্যে কাঁকড়া, কিমা আর চিংড়ি মাছের দাড়া বানাতে বল'।

হোতা বোঝে না এইসব খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদ যে-সে চায় না। যখন-তখন। আবার যারা চায় তারা আর অন্যের আস্বাদ চায় না। এদেরই ভালবাসে। বসিরুদ্দিনের আহারের মেনু শুনে অনন্তরাম বললে,—আমি তরজা শুনতে যাচ্ছি। ছুটি নিতে এসেছি এক দিনের। ফিরতে রাত হবে।

অনন্তরাম সত্যিই হয়তো তরজা শুনতে চলে যায়। সত্যিই অনন্তরামের ভাল লাগে না এই ওস্তাদী কথা আর ঐ ওস্তাদকে। সে আর এক মুহূর্ত থাকে না ওদের কাছে। মুখখানা গম্ভীর হয়ে যায় অনন্তরামের। অসম্ভব গম্ভীর।

—তাই যাও। আর যাওয়ার আগে ব'লে যাও পাক-ঘরে। নকল হাসিতে মাখানো বসিরুদ্দিনের কথা। বলে,—অর্গান শুনবেন হুজুর। ঘরের চাবিটা আনতে বল'।

বসিরুদ্দিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি অনন্তরাম। আর এক মুহূর্ত থাকে না সে সেখানে। তরজা শুনতে চলে যায়।

—তুমি চল' মিঞা, আমি চাবি আনতে বলছি। অনন্তরামের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে সলজ্জায় বললে কৃষ্ণকিশোর।

বসিরুদ্দিন চললো যেদিকে বাজনার ঘর সেদিকে। বসিরুদ্দিন জানতো, আগে দেখেছে কয়েক বার। যন্ত্রের একজিবিশন দেখে তাজ্জব বনে গেছে।

তখন অর্গান চলেছিল পুরা দমে।

একখানা পাল্কী এসে অন্দরের মুখে ভিড়েছে, শ্রোতা আর বাদ্যকার, কেউ জানতে পারেনি। কে এসেছেন? কুমুদিনী? না পিসীমা, হেমনলিনী। কি একটা কথা বলতে এসেছেন। কি একটা কথা নিতে এসেছেন। কুমুদিনীকে আশ্বস্ত ক'রে এসেছেন,—ছেলের পাকা কথা আমি এনে দেবো। সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি সে ভার নিচ্ছি।

অর্গানের সুরে তখন বাজনার ঘর মাতোয়ারা। বসিরুদ্দিন বাছা বাছা কতকগুলো গান বাজিয়ে চলেছে। এমন সময় একজন তাঁবেদার এসে বললে,—হুজুর, পিসীমা এসেছেন। ডাকছেন আপনাকে।

বসিরুদ্দিন অর্গান থামায় না। কৃষ্ণকিশোর পিসীমা এসেছেন শুনে তক্ষুণি উঠে পড়লো। বসিরুদ্দিন থামলো না কিন্তু। বাজিয়ে চললো, যে-সুর ধরেছিল সেই সুর।

অন্দরের মুখেই ছিলেন হেমনলিনী। বাপের বাড়ী, তাঁর এত লজ্জা নেই। অপেক্ষা করছিলেন। দেখা হ'তেই বললেন,—কি আরম্ভ করেছো? মাকে রাখতে পারলে না? একটা কথা বলতে এসেছি। ব'লেই চলে যাবো।

স্নেহময়ী পিসীমার কথার সুর এমন রুক্ষ কেন? এমন অশ্রুতপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে ভরা! কৃষ্ণকিশোর চুপ-চাপ চেয়ে থাকে পিসীমার দিকে। ভয়ে-ভয়ে।

হেমনলিনী বললেন,—তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে। অনুরোধ রাখতে হবে তোমাকে। আমি একটি পাত্রী দেখেছি, তোমাকে বিয়ে করতে হবে এই মাসেই। মনের মত মেয়ে, দেখে তুমিও খুশী হবে। বিয়ে করবে তো?

—হ্যাঁ, তুমি যখন ব'লছো। ব'লে কৃষ্ণকিশোর। যদি পিসীমা খুশী হন, কথা বলেন আগের মত। পিসীমার কথার ধরণ শুনে বেশি কথা বেরোয় না মুখ থেকে। শুধু বলে,—হ্যাঁ।

হেমনলিনীর মুখে যেন হাসির রেখা দেখা দেয়। নিশ্চিন্ত হওয়ার হাসি। বলেন,—আর কোন কথা নেই। তুমি যেতে পারো। আমি চলে যাচ্ছি এখন। আমি বিয়ের জোগাড় করি?

—হ্যাঁ। আবার ঐ একটা কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। গমনোদ্যত পিসীমার পায়ের ধূলো মাথায় নিলে। প্রণাম করলে। হেমনলিনী চিবুক স্পর্শ করলেন। বললেন,—তবে আমি যাচ্ছি এখন। দেখো, যেন মত বদলে না যায়। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবো না আমি!

দুঃখ-কাতর কণ্ঠে বললে কৃষ্ণকিশোর,—পিসী, মা কোথায় চ'লে গেছেন? খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার ওখানে গেছেন কি?

মৃদু হাসি ফুটে ওঠে হেমনলিনীর মুখে। দুঃখপূর্ণ হাসি। বললেন, —কি জানি কোথায় গেছেন? আমি চললাম এখন।

হেমনলিনী কথার শেষে নিজের পাল্কীতে উঠে বসলেন ঘেরাটোপ সরিয়ে। আট জন বেয়ারায় পাল্কী তুলে নিয়ে গেল কি একটা বলতে বলতে। বাজনার ঘর থেকে তখন অর্গানের তরঙ্গায়িত ধ্বনি ভেসে

আসছে। ভারী মিঠে সুর ধ'রেছে বসিরুদ্দিন। একটা ইংরেজী সুর। বিদেশী যন্ত্রে বিদেশী গান?

কথা দেওয়ার পরে কথাটা যেন মনে পড়লো।

বিয়ের কথা দেওয়া হয়ে গেছে পিসীমার কাছে, সে-কথা আর ফেরানো চলবে না। আর হলেই বা বিয়ে। বিয়ে তো জানা-শুনা সকলেরই হচ্ছে।

হেমনলিনীও কুমুদিনীর কথায় সায় দিয়েছেন। বিয়ে দিয়ে দেওয়ার তিনিও পক্ষপাতী। ছেলেকে রাজী করাবার ভারও নিয়েছেন তিনি। কুমুদিনী মনে মনে শুধু স্থির করেছেন, বিয়েটা দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়বেন। কাশী কিংবা বৃন্দাবন কিংবা লছমনঝোলায় চ'লে যাবেন। তীর্থবাস করবেন।

কিন্তু বসিরুদ্দিন কেন যাচ্ছে না! বসিরুদ্দিনের সঙ্গ যেন আর ভাল লাগে না। অর্গান কেন থামছে না?

মুখে কাকেও বলা যায় বিদায় গ্রহণ করতে?

বসিরুদ্দিনকেও বলতে পারে না। বাজনার ঘরে গিয়ে বসে বসিরুদ্দিনের পাশে। নায়েবদের একজনকে ডেকে ব'লে দেয়, বসিরুদ্দিন যা খেতে চেয়েছে তার ব্যবস্থা করতে। বসিরুদ্দিন অর্গান বাজিয়ে যায় ইংরিজী সুরে—মূর্চ্ছনায় ঘর যেন মুখর হয়ে উঠেছে। বসিরুদ্দিনকে দেখেই বারে বারে মনে পড়ছে গত দিনের কল্পনাতীত অলৌকিক কাহিনী—আরব্য উপন্যাসের মত মনে পড়ছে। একজন বিবি, বেদুইনের মত, যার চোখ দু'টোতে ইন্দ্রজাল যেন। মাদকতা রূপশ্রীতে।

ওস্তাদে বাবুকে নষ্ট করলে এমন কত কত দেখেছে কত কে। কাছারীতে তাই একটা চাপা গুঞ্জরণ চলতে থাকে। সকলেরই দৃষ্টি

আকৃষ্ট হয় ঐ মুসলমান ওস্তাদের প্রতি। কুগ্রহের মত এসে জুটলো কোথা থেকে?

বাজনার স্থর কমিয়ে কথা কইলে বসিরুদ্দিন। বললে,—আবার যে দেখতে চেয়েছে নাগরী। না দেখে মন নাকি তার আইঢাই ক'রছে। হুজুর যেন ভুলে না যান, বলতে বলেছে আমাকে।

বিবি গহরজান। তার মন আইঢাই।

লজ্জা আর বিস্ময়ের সঙ্গে বসিররুদ্দিনের কথাগুলো শুনতে থাকে। সত্যিই কি বলেছে গহরজান এইসব মন-ভোলানো কথা। বসিরুদ্দিন বলে,—খাওয়া-দাওয়া হোক্, রোদটা মরলেই বেলাবেলি একবার চল' না ঘুরে আসা যাবে। কে আর জানছে? আরে, হেসে নাও, ছ'দিন বইতো নয়!

বসিরুদ্দিন হাসতে হাসতে শেষের ক'টা কথা বললে। কৃষ্ণকিশোর শুনলে শুধু এই বিচিত্র কথা। গহরজানকে দেখতে পেলে যেন চোখের সামনে। দেখতে পেলে গহরজানের শুভ্র বক্ষদেশ, কাঁচুলীর দয়াহীন বন্ধন থেকে উন্মুক্ত!

হেমনলিনী পাল্কীতে উঠেই পরমানন্দে হেসেছেন একবার। তিনি জানতেন তাঁর কথা উপেক্ষা করতে পারবে না। হেমনলিনী একটি রূপার বাক্স খুলে কয়েকটা পান খেলেন। আর স্ফূর্তি। পাল্কীর ভেতরে ছিল একখানা হাতপাখা। পাখীর লেজের। হাওয়া খেতে খেতে চললেন হেমনলিনী। কখনও বা ঘেরাটোপের ফাঁক থেকে দেখছেন,—কোথায় এলো পাল্কী।

কুমুদিনীও জানতেন ঠাকুরঝি একটা হেস্তনেস্ত ক'রে আসবে। তিনি

থাকবেন অন্তরালে। নেপথ্যে। তার পর তিনিও বিদায় নেবেন। থাকতে তিনি আসেননি, এসেছেন উপায়হীন হয়ে। উপায় হলেই যথাসময়ে তিনি যাত্রা করবেন। তাই দিনের আলো ফুটতেই পাঠিয়েছেন হেমনলিনীকে। একটা হেস্তনেস্ত ক'রে আসতে।

গত রাত্রির মধ্যযামে যে আশাতীত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন কুমুদিনী, স্বচক্ষে যা দেখেছেন, তা দেখেও আর থাকবেন এই ভিটের ত্রিসীমানায়! কুমুদিনী দেখেছেন, যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি। দেখেছেন ঐ ঠাকুরঝি হেমনলিনীকে! দেখেছেন গভীর রাত্রে, যখন তাঁর তন্দ্রা ভেঙ্গে গিয়েছিল ঠকঠাক শব্দে। খুটখাট দরজা খোলার শব্দে।

দেখতে দেখতে চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন কুমুদিনী। কি দেখলেন তিনি? কাকে দেখলেন, ঠাকুরঝি হেমকে? দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও ক'বার ক্ষণেকের জন্যে কুমুদিনীও ভেবেছিলেন, ঠাকুরঝি যে স্বামীর সোহাগ পায়নি কোন দিন!

দ্বিজপদ নামে একজন যুবক। মাঝে মাঝে আসে, এসে বেশ কয়েক দিনের জন্যে কাটিয়ে যায় এ বাড়ীতে। হেমনলিনীর কি সম্পর্কের দেওর দ্বিজপদ। শিক্ষিত যুবক একজন। বেশ দেখতে। মাথায় কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল। গালপাট্টা দু'ই গালে। কুমুদিনী কিছু কিছু শুনেছিলেন ইতিপূর্ব্বে। শুনেছিলেন অন্য রকম। স্বচক্ষে দেখলেন?

হেমনলিনী দ্বিজপদকে ঠিক যে কোন্ চক্ষে দেখেন অনেকেই জানে না। জানে শিক্ষিত যুবক একজন, লক্ষেও একটা যা মেলে না, দ্বিজপদ তাই। সবাই জানে হেমনলিনী তার শিক্ষার সমর্থক, আর কিছু নয়। শুনা যায় দ্বিজপদ সাহিত্যিক, সাহিত্যের সভা-সমিতির আমন্ত্রণ আসে দ্বিজপদর নামে।

দরজার বাইরে লণ্ঠনের আলো-অন্ধকারে দেখেছেন কুমুদিনী গত রাত্রির মধ্যযামে, ঐ দ্বিজপদ আর হেমনলিনী প্রেম নিবেদন করছে যেন

পরস্পরকে। হেমনলিনীর শাড়ীর অবাধ্যতাও দেখেছেন। দেখেই চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন। আর চোখ মেলেননি সারা রাত। ঠাকুরঝির রূপের জৌলসও দেখেছিলেন, এখনও যেন যৌবনভারাক্রান্তা। ধপধপে রঙ, নিটোল স্বাস্থ্য।

দেখে, আরও যেন মন ছটফট করেছে কুমুদিনীর।

রৌদ্র যথা সময়েই মরে। সূর্য্য অস্তাচলে নামে।

সাপের চামড়ার সেলিমের বদলে কুমীরের চামড়ার পাম্প্ বেরোয়। আলমারী থেকে জরির কল্কা-দেওয়া বেনারসী পিরান। একটা উড়ুনী। চুলের টেড়ী বাগাতেই আধ ঘণ্টা লাগে। প্যারিসের কি-একটা সেণ্টের শিশি প্রায় খালি হয়ে যায়। চুনট-করা লাটিম পাড় ধুতির কোঁচা লুটোপুটি খেতে থাকে। দিন-শেষের প্রথম সন্ধ্যায় ভাড়া-গাড়ীতে আর নয়, নিজেদের জুড়ীতেই বেরিয়ে পড়ে দুজন। ওস্তাদ আর মক্কেল।

দূর থেকে শোনা যায় বেলফুল আর মালাইওয়ালার চীৎকার। জুড়ী এগোয় সেদিকে। ঘন ঘন ঘণ্টা বাজিয়ে।

রাত্রি হতেই কাছারীর দালানে যখন একজন ফিরিঙ্গীর আবির্ভাব হয় তখন গাড়ী প্রায় পৌঁছে গেছে। ফিরিঙ্গীকে বিতাড়িত ক'রে দিয়েছে বাড়ী থেকে তার পিতা। নর্ম্মান বিনয়েন্দ্র সরকারী ট্রান্স্লেটর, ছেলের রাজদ্রোহমূলক মতিগতিতে ওপর থেকে হুড়ো খেয়েছেন। ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তবেই সরকারী চাকরীতে থাকতে পাবে, ওপর থেকে পরোয়ানা এসেছে। নর্ম্মান বিনয়েন্দ্র তাই ছেলেকে মানে-মানে স'রে

পড়তে বলেছেন। নর্ম্মান অরুণেন্দ্র সহাস্যে বরণ ক'রে নিয়েছে পিতৃ-আজ্ঞা। বেরিয়ে প্রথমে তাই এখানে এসেছে। কয়েকটা দরকারী কথা ব'লে যেতে এসেছে। কাছারীর দালানে তারই বুটের মশ-মশ শব্দ হচ্ছে। বলতেই হবে কথাগুলো, তাই বন্ধুর প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু বন্ধুর চোখে আর নেই নর্ম্মান অরুণেন্দ্রর বিচিত্র পৃথিবীর স্পষ্ট কোন ছবি!

রাত্রির অন্ধকারে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল নর্ম্মান অরুণেন্দ্রর বুটের মশ-মশ শব্দ হচ্ছে কাছারীর দালানে। আজে-বাজে কি সব বলছে। বলছে:

'Twill vex thy soul to hear what I shall speak ;
For I must talk of murders, rapes, and massacres,
Acts of black night, abominable deeds,
Complots of mischief, treason, villanies,
Ruthful to hear, yet piteously performed.

মশালচিরা লণ্ঠন জ্বালতে বেরিয়েছে এদিকে-সেদিকে। ফুরফুরে বাতাস বইছে বৈশাখী দিনের। ভোঁ-ভোঁ মশা উড়ছে। গোধূলির পর রাত্রি নেমেছে কলকাতার শহরে। কয়েকটা নতুন তারা জ্বল-জ্বল করছে আকাশে।

আশা করেনি গহরজান।

দেখেই তার বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা। তবে ঈপ্সিতকে দেখলে বুকের মাঝে যে সুখানুভূতি হয়, ঠিক সেই সুখের আলোড়ন নয়। মুক্তকেশে, ম্লানবেশে বসেছিল গহরজান। কোলের কাছে বসেছিল ডালিম, নিদ্রামগ্ন। স্বপ্নাতীতকে চোখের সমুখে দেখতে পেয়েই এক লাফে উঠে পড়লো। খুশী-ভরা সহাস্য সম্ভাষণ জানিয়েই বিদ্যুদ্গতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গেল পাশের ঘরে, একেবারে আয়নার সামনে। রূপোপজীবিনী, আসল রূপে দেখা দিতে চায় না। তাই নকল রূপের সজ্জাসম্ভার নিয়ে সাত তাড়াতাড়ি সাজতে থাকে। চোখে আর মুখে রঙের স্পর্শ দেয়। কাজল আ খড়ির গুঁড়ো। অভ্রচূর্ণ। ঠোঁটে আলতা। কাঁচা ঘুমে ব্যাঘাত হওয়া ডালিম বিরক্ত হয়ে পায়ের কাছে মিউ-মিউ করে। আয়নায় গহরজা দেখে পেছনের দরজায় মাসী এসে দাঁড়িয়েছে। পান-রাঙা দাঁত দেখিয়ে হাসছে মিটি-মিটি। আনন্দের আতিশয্যে। আর পারে না মাসী, ঠিবে খদ্দের জোগাড় করতে। দালালদের পায়ে তেল মাখাতে। গহরে একটা পাকাপাকি হিল্লে হয়ে গেলে মাসীও নিশ্চিন্ততায় বাকী দিনগুলে কাটাতে পারে একটু-আধটু পুণ্য অর্জ্জন ক'রে। গঙ্গাস্নান আর বাব শ্মশানেশ্বরের মাথায় ফুল চাপিয়ে।

—কি প'রবো মাসী? ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক তুলে জিজ্ঞেস করে গহরজান।

মাসী চোখ দু'টো মুদে থাকে খানিক। বলে,—কেন, জঙ্লা পর্ না একখানা। সেই খয়েরী রঙের বেনারসীটা পর্ না। রেতের বেলায় মানাবে চমৎকার। আর সেই লাল শলমার জামাটা পর্।

আবদারের স্বর গহরজানের কথায়। বলে,—তুমি তবে তোরঙ্গ থেকে বের ক'রে দাও।

মাসী পানের পিক্ গলাধঃকরণ করে। কড়া দোক্তার পিক্। মাথাটা যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। বলে,—দাঁড়া তবে, আমি ওস্তাদকে বোতল দিয়ে আসি। ততক্ষণ বাবুকে বেতালা করুক। সাদা চোখে থাকলে—

মাসীর একটা ইতিবৃত্ত আছে। গহরজানের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

যৌবনে মাসীরও নাকি দেখবার মত রূপ ছিল। এখন না হয় বয়স হয়েছে। মাথার চুলে পাক ধ'রেছে। ক'টা দাঁতও পড়েছে। নয় তো এমন দিন ছিল যখন হাসলে মাসীর গালে টোল খেতো একটা নয়, অনেক-গুলো। আলসেয় দাঁড়ালে যে-কোন লোকের চোখ কপালে উঠতো। মাসীকে পাওয়ার লোভে হাতাহাতি বেধে যেতো বাবু-মহলে। ক'বার তো প্রায় খুনোখুনি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল পুরুষদের মধ্যে। ছোরা-ছুরি চলেছিল। আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল ব্যাপার। শেষ পর্য্যন্ত মাসীকে নিয়ে রাতারাতি হাওয়া কেটেছিল যে, তার সঙ্গেই আজীবন কাটিয়েছে মাসী। একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। অনেক টাকার মালিক ছিল সে। হীরে আর মাণিকে মুড়ে দিয়েছিল মাসীর সর্ব্বাঙ্গ। মাটীতে পা ফেলতে দিতো না, দুগ্ধফেননিভ পালঙ্কে বসিয়ে রাখতো সদাক্ষণ। মেওয়ার রেকাবী ধ'রে রাখতো মুখের কাছে। মসলিনের শালোয়ার-পাঞ্জাবী পরিয়ে রাখতো দিবারাত্রি।

পাঞ্জাবী মুসলমানটি ছিল বিপত্নীক। নাম শের আহমেদ খাঁন।

একটি মাত্র কন্যা উপহার দিয়েই বিবি তার রক্তাল্পতা রোগে ভুগে ভুগে অবশেষে মৃত্যুপথযাত্রী হয়। বিত্তবান স্বামী, অসময়ে বিবিকে হারিয়ে কিছু দিনের জন্য বৈরাগ্যব্রত পালন করে। বিবির শোকে বিহ্বল হয়ে শিশুকন্যাটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। দূর বেলুচ আর আফগানিস্থান থেকে পারস্য আর তুর্কীস্থানে চলে যায় ঘুরতে ঘুরতে। সেখান থেকে ফিরে এসে লাহোরে কাটায় কয়েক বছর। শেষ পর্য্যন্ত ফকিরী জীবন যাপন ক'রছে যখন, তখন এক গুজরাটী বন্ধুর আমন্ত্রণে চ'লে আসে বরুণা আর অসির সঙ্গম-স্থল কাশীতে। কাশীর চকবাজার তখন হাসি আর হল্লায় মাতোয়ারা। গুজরাটী বন্ধুটি চকবাজারের তখন একজন নামজাদা মহাজন—চাল আর ডালের আড়তে বিশ-পঁচিশ লক্ষ টাকার

কারবারী। গদিতে বসলে কাশীতে হেন লোক ছিল না যে, যেতে-আসতে সেলাম না জানাতো।

এই গুজরাটী যখন শূন্যহাতে ভাগ্যান্বেষণে যত্র-তত্র ঘোরা-ফেরা করছে, তখন ঐ শের আহমেদ খাঁন বিনা সর্ত্তে কর্জ্জ দিয়েছিল কয়েক হাজার টাকা, কেবল মাত্র বন্ধুত্বের বিনিময়ে। জাতিগত ও স্বভাবজাত ব্যবসাদারী বৃত্তির প্রেরণায় কয়েক বছরের মধ্যে ঐ গুজরাটী কয়েক হাজার টাকা কয়েক লক্ষে পরিণত করে এবং ধারের টাকা পরিশোধ দিতে চায় শের আহমেদ খাঁনকে। কিন্তু বন্ধুবর প্রত্যাখ্যান করে সেই আবেদন! বলে,—প্রকারান্তরে শোধ দিও ঐ অর্থ। টাকা আমি চাই না।

বন্ধু প্রকারান্তরে শোধ দিয়েছিল বন্ধুকে কোন নির্জীব বস্তু নয়, এক জলজ্যান্ত নারী। কাশীর অলিতে-গলিতে কোথায় কোন্ কোন্ বারাঙ্গনার বাসা, তাদের একজনও অজ্ঞাত ছিল না এই গুজরাটীর শের আহমেদ খাঁনকে বিপত্নীক দেখে পরিচয়-সূত্রে আবদ্ধ ক'রে দিয়েছিল মাসীর সঙ্গে। মাসীর তখন পরিপূর্ণ যৌবন। কাশী শহরে রূপসী সৌদামিনীর নাম তখন কোটি আর লক্ষপতিদের মুখে-মুখে। এখন না হয় মাসী রূপ আর যৌবন হারিয়েছে, কিন্তু তখন? সৌদামিনীর জন্যে খুন, রাহাজানি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল সৌদামিনীর নাম। শেষে ঐ পাঞ্জাবী মুসলমান শের আহমেদ খাঁন মাসীর রূপে আত্মহারা হয়ে, মৃত পত্নীকে বেমালুম ভুলে গিয়ে রাতারাতি চম্পট দিয়েছিল মাসীকে নিয়ে। কাশী থেকে একেবারে লাহোরে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে।

আহমেদ খাঁনের শিশুকন্যাটির তখনও জ্ঞান হয়নি। মাসীকেই জেনেছিল একমাত্র আপন।

শের আহমেদ খাঁন হৃদয় শুধু নয়, টাকা-পয়সা সব কিছু তুলে দিয়েছিল

সৌদামিনীর হাতে। আর দিয়েছিল ঐ শিশুকন্যাকে। কিন্তু সৌদামিনী সব দিয়েও দেয়নি শুধু একটি বস্তু, নিজের মন। মনটা মাসী অনেক আগে দিয়ে দিয়েছিল একজনকে—যে মাসীকে ঘর থেকে বাইরে বের ক'রে এনেছিল, তাকে। সে মাসীরই এক আত্মীয়, সম্পর্কে গ্রামতুতো দাদা। সৌদামিনীদের চালার খানকয়েক চালার ওদিকে সে থাকতো; নাম ভজহরি সামন্ত। সেই ভজহরির সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে মাসী অবশেষে শের আহমেদ খাঁনকে মদের সঙ্গে এক রাতে খাইয়ে দেয় সেঁকো বিষ। ভজহরি দারোগার হাতে ক'খানা হাজার টাকার নোট গুঁজে দিয়ে লেখায়,—'অত্যধিক মদ্যপানের পরিণামে হৃৎযন্ত্র ফাটিয়া মারা গিয়াছে। মৃতের সকল স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মালিক তাহার রক্ষিতা সৌদামিনী দাসী। সে মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মৃতের একমাত্র শিশুকন্যাকে পালন করিবার জন্য সৌদামিনীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছে। সাক্ষী কেবলমাত্র ভজহরি সামন্ত, সৌদামিনীর গ্রামের সম্পর্কের ভাই।'

কিন্তু সৌদামিনীও রাখতে পারেনি এত টাকার সম্পত্তি। ভজহরিই ফুঁকে দিয়েছে দিনের পর দিন ব'সে ব'সে খেয়ে। তারপর একদিন ভজহরি ম'রে গেছে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে। সৌদামিনী যখন ফতুর হয়ে যায় তখন ভজহরি তাকে এনে তুলেছিল গরানহাটার এই বাড়ীতে। দিনে-দিনে মাসীর যৌবন ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু তিলে-তিলে তিলোত্তমা হয়েছে শের আহমেদ খাঁনের শিশুকন্যাটি। সে কন্যা এখন আর শিশু নেই, ষোড়শীর রূপ ধারণ ক'রেছে।

সে-ই এই গহরজান। আর এই হ'ল মাসীর ইতিকথা। ঘটনা এবং দুর্ঘটনায় পরিণত হয়েছে এক রোমহর্ষক কাহিনীতে—যার পরিচয় জানতো শুধু ভজহরি। আর কিছু-কিছু জানে বসিরুদ্দিন। ছাড়া-ছাড়া

শুনেছে মাসীর কাছে, মাসী যখন মদে জ্ঞান হারিয়ে ব'লে ফেলেছে নেশার ঝোঁকে কিছু-কিছু।

পাশের ঘরে একটা হাসির রোল ওঠে। হো-হো শব্দে হাসে কারা যেন। হাসছে বসিরুদ্দিন। আর হাসছে মাসী, কৃষ্ণকিশোরের কথার ধরণ শুনে। তাদের হাসির শব্দে আয়নার সামনে কাঁচলের 'পরে আঁচলের বেষ্টন দিতে দিতে গহরজানও হাসে। ডালিমের অবিরাম বিরক্তিপূর্ণ মিউ-মিউ ডাক শুনে কিছু বা দয়ার উদ্রেক হয় তার মনে। ডালিমকে পুতুলের মত এক হাতে তুলে নিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধ'রে চুমু খায় পর-পর অনেকগুলো পরম স্নেহভরে। তার পর নামিয়ে দেয় ঘরের মেঝেয়। বলে,—যাও, নিদ্ যাও। ফুরসৎ নেহি আবি হামারি।

পাশের ঘরে হাসির কলরোল উঠেছে মাত্র একদিনের কাপ্তেনের ভয়-কাতর মন্তব্যে। ঘরের আবহাওয়া আর মাসীর তৈলচিক্কণ বিশ্রী মুখাকৃতি দেখে কেমন ভয়-ভয় ক'রেছে। মাসীকে দেখাচ্ছে যেন রাক্ষসী। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ঝুলছে শনের মত। ঠোঁটের দু'পাশে রক্তধারার মত পানের পড়ন্ত পিক্। চোখ দু'টো কেমন ঘোলাটে. যেন এই মাত্র উঠেছে ঘুম থেকে। ঘন ঘন হাই তুলছে মাসী। পরনে একটা ময়লা শাড়ী শুধু, আর কিছু নয়। দেয়ালের বাতিদানের আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ঘরের মধ্যে। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল,—মিঞা, চল' চল' এখান থেকে চ'লে চল'। আমার ভয় করছে এখানে থাকতে। কি বিশ্রী একটা গন্ধ আসছে!

এই কথাগুলিই যত হাসির উৎস। ভয় পেয়েছে শুনে, মিঞা আর মাসী হেসে উঠেছে একসঙ্গে। নাচতে নেমে লজ্জা পাওয়া! বসিরুদ্দিন হাসতে-হাসতেই বলে,—আরে ভাই, ডরো মৎ। বিবিজানকে দেখলে

আর ভয় লাগবে না। মাসী, বিবিজান কোথায় ডুব মারলো বল' তো?

মাসী তখন বসেছে পানের সরঞ্জাম পেড়ে। গেলাসে ঢালছে পানীয়। তারই উগ্র গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ভ'রে গেছে। মাসী বললে,—গহর এই এলো ব'লে। গেছে শুধু পোষাক বদলাতে। তোমরা ততক্ষণ খাও-না লেমোনেট্। ভয় কি? পেথম পেথম ভয় এমন করে!

মুহূর্ত্তের অপেক্ষা যেন আর সয় না। বসিরুদ্দিন একটা গেলাস তুলে নেয় ছোঁ মেরে। বলে,—পেটের ভেতরটা যেন আইঢাই করছে। হুজুর খাইয়েছে অনেক। কিমা, কাঁকড়া, চিঙ্ড়ী, কত কি খাইয়েছে! একটু সোডা না খেলে, চলে?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তুমি খাও মিঞা, আমি আর খাবো না লেমোনেড! খেলে আমার শরীর খারাপ লাগে। মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। লোক চিনতে পারি না।

আবার হেসে ফেললে বসিরুদ্দিন কথাগুলো শুনে। হাসি চাপতে চেষ্টা ক'রে মাসীও হেসে ফেললে ঠোঁট কামড়ে। বললে,—একেবারে ছেলেমানুষ! ও-সব মনের ভুল। লেমোনেট্ খেলে কখনও কারও শরীল খারাপ হয়! খেলে বরং চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

দরজায় গহরজানের আবির্ভাব।

শেষ রাতের অন্ধকার বাগিচায় সহসা যেন ফুটলো এক গুল্। কি এক সেণ্টের গন্ধ ছড়ালো বাতাসে। গহরজানের পোষাকের শলমা আর জরি বাতির আলোয় ঝলমলালো। গহরজান কয়েক মুহূর্ত্ত নির্নিমেষ তাকিয়ে বললে,—তোমরা এখান থেকে বিদেয় হও দেখি। আমি দেখছি কার মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। কে লোক চিনতে পারে না। তোমরা দুজনে চ'লে যাও।

—সেই ভাল, সেই ভাল। কথা বলতে বলতে গেলাস হাতে উঠে পড়লো বসিরুদ্দিন। বললে,—চল' মাসী, আমরা পাশের ঘরে যেয়ে দু'দণ্ড দাবা খেলি গে চল'। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দাবায় বসিনি।

গানের একটা মৃদু সুর ভেসে আসছিল কোথা থেকে। সঙ্গে হারমোনিয়ম আর ডুগী-তবলার সশব্দ ঝঙ্কার। বসিরুদ্দিন খানিক কান পেতে বললে,—কে এমন মিঠে সুরে ইমন ধ'রেছে, মাসী?

—কে আবার, তিনতলার পটল গাইছে। মেয়েটার আর কিছু না থাক্, মিষ্টি গলাখানা আছে তো! মাসীও একটা গেলাস তুলে নেয়, কথার শেষে ইশারায় গহরজানকে কি একটা ব'লে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বসিরুদ্দিন পিছু নেয় তার। মাসী ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় বাইরে থেকে।

এক ঝলক হেসে গহরজান ব'সে পড়ে ফরাসে। একটা তাকিয়ায় এলিয়ে পড়ে বুক চিতিয়ে।

গহরজানের রূপে ছিল সম্ভ্রান্ত রক্তের ছাপ; মুখাবয়বে ছিল না সাধারণ বারবনিতার স্বাভাবিক প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু তাদের আদব-কায়দা আর ব্যবহারের শিক্ষা পেয়েছিল সৌদামিনীর কাছে। পাখী-পড়া ক'রে ধাপে-ধাপে শিখিয়েছিল মাসী—কখন্ কি বলতে হয়, কখন্ কি করতে হয়। কখন্ হাসতে হয়, আর কাঁদতে হয় কখন্। আজন্মের সাহচর্য্য; দিবারাত্রির সঙ্গদোষে, রক্তে না থাকলেও, বাধ্য হয়ে কিছু কিছু শিখেছে গহরজান। দিনের পর দিন দেখে আর ঠেকে শিখেছে—মাসী যেমন ভজহরির সঙ্গে পালিয়ে কাশীর চকবাজারে উঠে শিখেছিল এই জীবনযাত্রার অভিনয়।

গেলাসটা যেমনকার তেমনি রাখা ছিল। গহরজান ঘরের মানুষের

মুখের কাছে ধরলো তুলে গেলাসটা। বললে,—আমি খাইয়ে দিচ্ছি। না খেলে আমার মনে কষ্ট হবে।

গহরজানের এই কাকুতিতেও মন যেন সাড়া দেয় না কৃষ্ণকিশোরের। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে গহরজানের চোখে। আশ্চর্য্য লাগে যেন। জানা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে—সে এমন কেন পরমাত্মীয়ের মত কথা বলছে এত কাছাকাছি ব'সে! বিস্ময় বোধ করে গহরজানের এই আকুল আবেদনে। তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে গহরজানের চোখে। দয়ার সঞ্চার হয় যেন মনে। গেলাসটা হাতে নিয়ে বলে,—খেয়ে আমার কষ্ট হয় যে! কি করি, কি বলি তার ঠিক থাকে না। বাড়ী ফিরে কেলেঙ্কারী করেছিলাম।

—তাই নাকি! হাসির তরঙ্গ তোলে গহরজান। হাসি থামিয়ে বলে, —সে জিনিষ নয়, অন্য রকমের আছে। কিছু হবে না। না খেলে আমার মনে কষ্ট হবে। কি কেলেঙ্কারী হয়েছিল, খেতে খেতে বল'। আমি শুনবো।

কেলেঙ্কারী? ছায়া-ছায়া ভাসতে থাকে যেন চোখের সামনে। স্পষ্ট কিছুই মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু মাকে—কুমুদিনীকে, যে গৃহত্যাগী হয়েছে তারই কি এক দুর্ব্যবহারে। বাড়ীর হাওয়া যেন বদলে গেছে একটা রাতে। মানুষগুলির চাল-চলনেও পরিবর্ত্তন দেখা গেছে। সকলেই যেন কাতর হ'য়ে পড়েছে কি এক অব্যক্ত দুঃখে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গহরজানের কথা যেন এড়াতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর মুখে তোলে গেলাস। মুখ বিকৃত ক'রে ধীরে ধীরে পান করে ঐ রঙীন তরল পদার্থ। মদির নয়নে চেয়ে থাকে গহরজান। শাড়ীর জরিদার আঁচল পাকায় আনমনে।

রাস্তার লোকের কলকণ্ঠ আর ফেরীওয়ালাদের কণ্ঠস্বর বন্ধ দরজা-

জানলা ভেদ ক'রেও পৌছয় ঘরের ভেতর। দিনের শেষে এ তল্লাটের কূলে-কূলে জেগেছে নিশাচর। অন্ধকারের স্বাদ পেয়ে উন্মুক্ত হয়েছে শীকারের সন্ধানে। পান আর সোডা-জলের দোকানীর নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। শুঁড়ির দোকানে যেন গাঁদি লেগে গেছে যত অমৃত-লোভীর। হোটেলগুলোর চুল্লীতে গম-গমে আঁচ, ডিম আর মাংসের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। জুঁই, বেল ফুল আর রশুনের মিশ্রিত উগ্র গন্ধে ঠিক যেন মৌমাছির মত ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে আসছে অগণিত লোক। কেউ কারও তোয়াক্কা করছে না, কারও দিকে কেউ দৃক্‌পাত করছে না। ছক্কড় মাতালরা মনের সুখে কেউ গান গাইছে, কেউ বা পথের নর্দ্দমাকে স্বর্গভ্রমে শয্যা ক'রে নিয়েছে। জারজ কুকুরগুলোর যেন মরশুম লেগে গেছে। হাঁক-ডাক থামিয়ে এদিক-সেদিক ঘোরা-ফেরা করছে। নর্দ্দমায়-গড়িয়ে-পড়া চুর মাতালদের নাক-মুখ আর পা চাটছে; হোটেলের চাতালের তলায় গিয়ে কখনও বা খোঁজাখুঁজি করছে যদি কিছু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। আর এ-পাড়ার যারা আসল মালিক, সেই নটী নারীরা যার যার এলাকায় অস্বাভাবিক সাজ-সজ্জায় সহাস্য বদনে লজ্জার মাথা খেয়ে বিরাজ করছে। বেলোয়ারী ঝাড় আর বেল-লণ্ঠনের হরেক রকম প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে যেদিকে চোখ পড়েছে সেদিকেই।

জুড়ীর চালক আবদুল এতক্ষণে যেন বুঝতে পেরেছে হুজুর কোথায় এসেছেন। গাড়ীর মাথায় ব'সে সইসদের সঙ্গে একান্ত আফসোসের সুরে কি যেন সে বলাবলি করছে। কিন্তু সে মাইনের চাকর, মুখে কিছু বলতে পারছে না। নয় তো, আবদুলের ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি গিয়ে হুজুরের কান ধ'রে তুলে নিয়ে আসে বিবির ঘর থেকে।

গহরজান যে কখন্ এত কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে যেন বুঝতে পারেনি

কৃষ্ণকিশোর। হঠাৎ লক্ষ্য করে গহরজান আর তার মধ্যের ব্যবধানের শূন্য স্থান কখন পূরণ হয়ে গেছে। শেষ-হয়ে-যাওয়া গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। কাচের পাত্র, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ঘরের দেওয়ালে ঘা খেয়ে। সামান্য গেলাস, কতই বা মূল্য। একটা গেছে, আরেকটা আসবে। গহরজান খিল-খিল শব্দে হাসে সে দৃশ্য দেখে। হাসে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে। বাতির ক্ষীণ আলোক-রশ্মিতে দাঁতগুলো তার দেখায় যেন মুক্তার সারি।

বিশ্রী লাগে এই আবহাওয়া। হাসি আর গান, সুরা আর নারী, অধিকাংশ মানুষের আন্তরিক কামনার স্থান আর পাত্র—কেমন যেন বিতৃষ্ণা আসে তবুও মন থেকে। কি মনে হয়, হঠাৎ কৃষ্ণকিশোর বলে, —আমি এখন যাবো। মিঞাকে ডাকো, আমাকে গাড়ীতে পৌছে দেবে।

—গান শুনবে না? ব্যথাহত স্বরে শুধোয় গহরজান।—কি কসুর হয়েছে?

—না। গান তো শুনেছি তোমার। খুব ভাল গাও তুমি। কথা বলতে বলতে বিমুগ্ধ শ্রোতা টেনে নেয় একটা তাকিয়া। যাব বলেও, এমন ভাবে এলিয়ে পড়ে যেন ভুলে গেছে পূর্ব্ব উক্তি। সত্যিই তার চোখের দৃষ্টি যেন প্রতি মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। কথায় যেন ফুটে উঠছে জড়তা। গহরজানের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে দেখছে দেওয়াল-গাত্রের সারি-সারি ছবি। একখানা ছবিতেই কি নিবদ্ধ হয়ে যায় চোখের তারা! এমন কি আছে দেখবার ঐ ছবিতে?

ছবিখানা আর কিছু নয়, বৈষ্ণব-গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের রঙীন বর্ণনা। শচীদেবী বাহুতে মাথা রেখে পালঙ্কে নিদ্রামগ্না। শিয়রের কাছে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা। যুগাবতার গৌরাঙ্গদেব গমনোদ্যত। আকর্ণবিস্তৃত

আঁখিযুগলে তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি। কৃষ্ণকিশোর দেখে সেই ছবিটা।

কিন্তু গহরজানের তখন কম্পিত-চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছল-ছল। শুভ্র উজ্জ্বল মুখে যেন রক্তিমবর্ণ। ঘরের মানুষ যাওয়ার নামে আর কিছু বলছে না দেখে সে ব'সে থাকে চুপ-চাপ। নিশ্বাসে যেন তার অভিমানের হাওয়া।

রুদ্ধ জানলা-দরজা ভেদ করেও থেকে থেকে বাতাসে ভেসে আসছে সারেঙ্গীর করুণ ক্রন্দন। কাছাকাছি কে কোথায় গাইছে, কে জানে. এখন শুধু তিনতলায় পটল নয়, অনেকেই অনেকের ঘরে হাস্য-লাস্য আর গানে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গহরজান স্তিমিত নয়ন মেলে ব'সে আছে যেন রূপকথার রাজকন্যার মত। শুধু তার চোখ দু'টোতে চাকচিক্য, অশ্রুর সজল রেখা।

—গান গাইবে না? গহরজানের শাড়ীর আঁচল ধ'রে দেখতে দেখতে বললে কৃষ্ণকিশোর।—কৈ, গান গাইলে না?

শাড়ীটা দেখবার মতই লোভনীয়। দেখলেই মনে হয় অনেক যেন দামী। সচরাচর দেখা যায় না এমনটি, এমনি তার বাহার। সাঁচ্চা জরির কাজ জমিতে। সূচীশিল্পের অনবদ্য নিদর্শন। শাড়ীটা গহরজানের নয়, সৌদামিনীর। বহুদিনের পুরাতন, তবুও জৌলস তার হ্রাস পায়নি এত দিনেও। আহমেদ খাঁন একবছর সবেবরাতের দিনে উপহার দিয়েছিল সৌদামিনীকে। তখনই দাম নিয়েছিল নাকি হাজার খানেক রৌপ্যমুদ্রা। উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে গহরজান।

হ্যাঁ, না, কোন কিছুই বললে না গহরজান। টেনে নিলে হারমোনিয়মটা। খানিক বাজিয়ে ধীরে-ধীরে সুর ধরলে কি একটা গানের। বৈষ্ণবী কীর্ত্তন ধরলে একটা। শ্রোতার চোখ থেকে তখন মুছে গেছে ফিরে যাওয়ার কল্পনা। রঙীন তরল পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় দেহ আর মন

বিভোর হয়ে গেছে। গহরজানের কণ্ঠে বাঙলা ভাষার আদিম যুগের বাক্যরাশি শুনে বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। গহরজান দেহ হিল্লোলিত ক'রে মৃদু কণ্ঠে গাইলে :

কহত কহত সখি, বোলত বোলত রে
হমারি পিয়া কোন্ দেশ রে।
মদন শরানলে হিয়া তু জরজর
কুশল শুনইত সন্দেহ রে॥

রাত্রির মন্থর গতি। দীর্ঘদুঃখনিশা?

সন্ধ্যার অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে রাত্রির তমসা নেমেছে দিকে দিকে। চিৎপুরের মসজিদে আজানের সমবেত ধ্বনিতে বিরাম প'ড়েছে অনেক্ষণ আগে। আলো জ্বলেছে পথের দু'পাশের আলোকস্তম্ভে। দিবান্ধ পেচকের পাল কোটর ত্যাগি' উড়েছে আকাশে। তীব্র কর্কশ স্বরে ডাকছে শহরের হেথায়-সেথায়। গরানহাটার গণজনের আনন্দমুখর আর্ত্তনাদে পেঁচাদের ডাক কানে আসছে না কারও।

গহরজান গেয়ে চলেছে অন্তরের দরদের সঙ্গে। গহরজানের এই বিচিত্র জীবনে এত দরদী সুরে বোধ করি আর কখনও সে গায়নি। কিন্তু গান গাইবে তো হাসতে-হাসতে। চোখের কোণে জলবিন্দু কেন? সৌদামিনীর দেওয়া শিক্ষা এতটা আয়ত্ত ক'রেছে গহরজান? কথায়-কথায় শিখেছে কাঁদতে, যখনই প্রয়োজন হয়েছে? যে-ক্রন্দন সত্যিকার নয়, আসল নয় যে-কান্না, সেই রকম কান্না কাঁদছে গহরজান। আবার সঙ্গে সঙ্গে গানও গাইছে। বাইরের নকল আবরণ না দেখে যদি ভেতরটা দেখতে পেতো কৃষ্ণকিশোর, তা হ'লে বোধ করি সহানুভূতিতে কণামাত্র ভিজে যেতো না তার মন। গহরজানের সজল নয়ন দেখে কেমন যেন বিসদৃশ

আঁখিযুগলে তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি। কৃষ্ণকিশোর দেখে সেই ছবিটা।

কিন্তু গহরজানের তখন কম্পিত-চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছল-ছল। শুভ্র উজ্জ্বল মুখে যেন রক্তিমবর্ণ। ঘরের মানুষ যাওয়ার নামে আর কিছু বলছে না দেখে সে ব'সে থাকে চুপ-চাপ। নিশ্বাসে যেন তার অভিমানের হাওয়া।

রুদ্ধ জানলা-দরজা ভেদ করেও থেকে থেকে বাতাসে ভেসে আসছে সারেঙ্গীর করুণ ক্রন্দন। কাছাকাছি কে কোথায় গাইছে, কে জানে। এখন শুধু তিনতলায় পটল নয়, অনেকেই অনেকের ঘরে হাস্য-লাস্য আর গানে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গহরজান স্তিমিত নয়ন মেলে ব'সে আছে যেন রূপকথার রাজকন্যার মত। শুধু তার চোখ দু'টোতে চাকচিক্য, অশ্রুর সজল রেখা।

—গান গাইবে না? গহরজানের শাড়ীর আঁচল ধ'রে দেখতে দেখতে বললে কৃষ্ণকিশোর।—কৈ, গান গাইলে না?

শাড়ীটা দেখবার মতই লোভনীয়। দেখলেই মনে হয় অনেক যেন দামী। সচরাচর দেখা যায় না এমনটি, এমনি তার বাহার। সাঁচ্চা জরির কাজ জমিতে। সূচীশিল্পের অনবদ্য নিদর্শন। শাড়ীটা গহরজানের নয়, সৌদামিনীর। বহুদিনের পুরাতন, তবুও জৌলস তার হ্রাস পায়নি এত দিনেও। আহমেদ খাঁন একবছর সবেবরাতের দিনে উপহার দিয়েছিল সৌদামিনীকে। তখনই দাম নিয়েছিল নাকি হাজার খানেক রৌপ্যমুদ্রা। উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে গহরজান।

হ্যাঁ, না, কোন কিছুই বললে না গহরজান। টেনে নিলে হারমোনিয়মটা। খানিক বাজিয়ে ধীরে-ধীরে সুর ধরলে কি একটা গানের। বৈষ্ণবী কীর্ত্তন ধরলে একটা। শ্রোতার চোখ থেকে তখন মুছে গেছে ফিরে যাওয়ার কল্পনা। রঙীন তরল পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় দেহ আর মন

বিভোর হয়ে গেছে। গহরজানের কণ্ঠে বাঙলা ভাষার আদিম যুগের বাক্যরাশি শুনে বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। গহরজান দেহ হিল্লোলিত ক'রে মৃদু কণ্ঠে গাইলে :

কহত কহত সখি, বোলত বোলত রে
হমারি পিয়া কোন্ দেশ রে।
মদন শরানলে হিয়া তু জরজর
কুশল শুনইত সন্দেহ রে॥

রাত্রির মন্থর গতি। দীর্ঘদুখনিশা?

সন্ধ্যার অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে রাত্রির তমসা নেমেছে দিকে দিকে। চিৎপুরের মসজিদে আজানের সমবেত ধ্বনিতে বিরাম প'ড়েছে অনেক্ষণ আগে। আলো জ্বলেছে পথের দু'পাশের আলোকস্তম্ভে। দিবান্ধ পেচকের পাল কোটর ত্যাগি' উড়েছে আকাশে। তীব্র কর্কশ স্বরে ডাকছে শহরের হেথায়-সেথায়। গরানহাটার গণজনের আনন্দমুখর আর্ত্তনাদে পেঁচাদের ডাক কানে আসছে না কারও।

গহরজান গেয়ে চলেছে অন্তরের দরদের সঙ্গে। গহরজানের এই বিচিত্র জীবনে এত দরদী সুরে বোধ করি আর কখনও সে গায়নি। কিন্তু গান গাইবে তো হাসতে-হাসতে। চোখের কোণে জলবিন্দু কেন? সৌদামিনীর দেওয়া শিক্ষা এতটা আয়ত্ত ক'রেছে গহরজান? কথায়-কথায় শিখেছে কাঁদতে, যখনই প্রয়োজন হয়েছে? যে-ক্রন্দন সত্যিকার নয়, আসল নয় যে-কান্না, সেই রকম কান্না কাঁদছে গহরজান! আবার সঙ্গে সঙ্গে গানও গাইছে। বাইরের নকল আবরণ না দেখে যদি ভেতরটা দেখতে পেতো কৃষ্ণকিশোর, তা হ'লে বোধ করি সহানুভূতিতে কণামাত্র ভিজে যেতো না তার মন। গহরজানের সজল নয়ন দেখে কেমন যেন বিসদৃশ

লাগে। অভিমানিনীর প্রতি বুঝি বা মনে-মনে দয়ার উদ্রেক হয়। বলে, —খুব ভাল গান গাও তুমি।

দেওয়ালের এক জায়গায় ছিল একটা সস্তা দামের ক্লক্‌-ঘড়ি। টিকটিকির মত টিক-টিক শব্দে তার ক্ষণ-সঞ্চরণ। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ধীর সুরের সময়-জ্ঞাপন শোনা যায়। সহসা বাজতেই, ঘড়ির দিকে তাকায় কৃষ্ণকিশোর। দেখে আটটা বাজে। পানীয়ের উগ্র প্রতিক্রিয়ায় চোখে যেন ঝাপসা দেখে। কুমুদিনী বাড়ীতে নেই, তবুও মনের কোথায় যেন ভেসে ওঠে মায়ের মুখ; কানে যেন ভাসে তাঁর সস্নেহ কথা। চোখের সমুখে ছবির মত দেখতে পায় যেন, অন্দরে ভাঁড়ারের দরজার কাছে ব'সে আছে কুমু। একেক বার হু-হু ক'রে ওঠে সত্যিই বুকের ভেতরটা। তবুও গহরজানের চোখের জল দেখে, মিথ্যা কান্না দেখেই, তাকিয়াটা এগিয়ে নেয় খানিক। এগিয়ে আসে গহরজানের একেবারে কাছে। বলে,—গান থাক্‌, তুমি—

অন্দরে কেউ কোথাও নেই।

ব্রাহ্মণী শুধু উনুনের সামনে ব'সে রাতের আহার প্রস্তুত করে। গৃহের মালিক ফিরে যদি দয়া ক'রে খান। ঝি আর বাউড়িরা জটলা করে ফিসফাস, সিঁড়ির তলায় ব'সে। ব্রাহ্মণী রান্না করে আর গিন্নীমা'র জন্যে চোখের জল ফেলে মধ্যে-মধ্যে। তিনি থেকেও রইলেন না।

আর সদরে, কাছারীর দালানে অপেক্ষারত নখান অরুণেন্দ্র এতক্ষণে একটা বসবার কেদারা পায়। ম্যানেজারবাবু তাকে লক্ষ্য ক'রে দেখেন অনেক্ষণ নিজের কামরা থেকে। ফিরিঙ্গী দেখে, কাছাকাছি এসে কথা বলেন। বলেন,—Who are you? What are you? Take your seat.

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র বললে,—মালিকের বন্ধু আমি। I have few talks with him. আমাকে এই রাতের ট্রেনেই লুধিয়ানা যেতে হবে।

—লুধিয়ানা! বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন ম্যানেজারবাবু।—লুধিয়ানায় কেন? সেখানে কে আছে?

খানিক চুপচাপ থাকে নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত ক'রে দেখে ম্যানেজারবাবুকে। দেখে হয়তো এ লোকটির কাছে কোন কথা ব্যক্ত করা যাবে কি না। বলে,—Secret matter. আপনাকে বলতে পারি?

—Secret!—বাধা থাকলে কেন বলবে? বলেন ম্যানেজারবাবু।—তবে বললে ফাঁস হবে না কথা।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র আন্দাজে বলে,—I hope, you are the appointed manager of this Estate of that minor chap.

—Yes, you are right. ম্যানেজারবাবুর মুখে যেন কৌতূহল ফুটে ওঠে ফিরিঙ্গী বাচ্ছার কথা শুনে। পাশের চেয়ারে ব'সে পড়েন তিনি। বলেন,—How do you come in touch with that chap? মালিকের সঙ্গে কোথা থেকে আলাপ হ'ল?

হাসলো নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। বললে,—গড়ের মাঠে প্রথম আলাপ হয়। We met each other. Then I found, he belongs of a rich family.* •আমার টাকার দরকার, and I made friends with him.

টাকার দরকার!* আরও যেন বিস্মিত হলেন ম্যানেজারবাবু।—You need money! Why?

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র যেন ভাবছিলো বলবে কি বলবে না। অনেক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অবশেষে বললে,—আমরা একটা Party form করেছি, just alike the Nihilists of Russia, for the freedom of our mother-

land. সেই Partyর কাজের জন্য দরকার huge money, for collecting arms and ammunitions.

—তা, লুধিয়ানায় যাওয়া হবে কেন? ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞেস করেন ধীরে-ধীরে।

নর্মান অরুণেন্দ্র একটা বার্ডসাই ধরায়। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে,—To unite the Panjabis and the Bengalees. আমাদের ভার দিয়েছে Party, আর—

কথা বলতে বলতে থেমে যেতে দেখে কথাটা ধরিয়ে দেন ম্যানেজারবাবু। বলেন,—আর?

—আর আমাকে আমার father থাকতে দিলে না তার কাছে। সরকারী চাকরী। বললে যে, anarchism করলে আমার কাছে জায়গা নেই। কথার শেষে বার্ডসাই মুখে তোলে নর্মান অরুণেন্দ্র।

এবার ম্যানেজারবাবু চুপ করেন। আর কোন বাক্যব্যয় না ক'রে ব'সে থাকেন একদৃষ্টে তাকিয়ে। সহসা কি মনে হ'তে বলেন,—বন্ধুর সঙ্গে কি দরকার? What kind of secret talk? টাকার দরকার?

নর্মান অরুণেন্দ্র বললে,—না, টাকার দরকার নেই। আমি কিছু document রেখে যাবো তার কাছে। Few days পরে আমাদের একজন worker এসে নিয়ে যাবে তার কাছ থেকে। কিন্তু where is he? সে কেন এখনও আসছে না? I can't wait any more. ট্রেন ধরতে পারবো না।

মনে মনে কি বুঝলেন কে জানে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে খানিক ব'সে থাকলেন ম্যানেজারবাবু। তিনিও সব শুনেছেন মালিকের কীর্ত্তিকাহিনী। মদ্যপানে আসক্ত হয়েছে শুনে তিনিও আর খুশী নন মালিকের প্রতি। কাছারীতে হুকুম দিয়েছেন, তাঁর বিনা অনুমতিতে যেন একটি আধলাও না

দেওয়া হয় মালিককে। কিন্তু যখনই ভেবেছেন, সাবালকত্ব প্রাপ্তির আর বেশী দেরী নেই, তখনই মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ছেন। ম্যানেজারবাবু আন্তরিক স্নেহ করেন মালিককে। তাই তার দুরাচারে সত্যিই আঘাত পেয়েছেন মনে। হঠাৎ কথা বলেন তিনি,—আমাকে দিয়ে যাওয়া হোক। আমি তাকে দিয়ে দেবো।

নর্ম্মান অরুণেন্দ্র কথাগুলি শুনে সরল বিশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে,—Will you ? Kindly, will you ?

—Yes, yes. Rest assured, ঠিক জায়গায় যাবে। Hand over to me without hesitation. কথার শেষে ম্যানেজারবাবু উঠে পড়েন কেদারা থেকে।

বার্ডসাই মুখে ধ'রে খুশীর হাসি হাসতে-হাসতে পকেট থেকে একটা আঁটা লেফাফা বের ক'রে দেয় নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। ম্যানেজারবাবু সেটি নিয়ে বলেন,—Now you can go being assured.

—Many, many thanks with all my true love to you! Please do it my friend. বলতে বলতে কাছারীর সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে যায় নর্ম্মান অরুণেন্দ্র। দ্রুতবেগে চলে যায় ম্যানেজারবাবুর দৃষ্টির অন্তরালে। পরম পরিতৃপ্তির হাসি দেখা দেয় তার মুখে। আনন্দের বিকাশ। যেতে যেতে বলে :

True love's the gift which God has given
To man alone beneath the heaven
It is not fantasy's hot fire,
Whoso wishes, soon as granted, fly ;
It liveth not in fierce desire,
With death desire it doth not die ;

It is the secret sympathy,
The silver link, the silken tie,
Which heart to heart, and mind to mind,
In body and in soul can bind.

ঘনান্ধকারে শহর তখন সুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে। আকাশের দিগ্বলয়ে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সঞ্চয় যেন। হয়তো বর্ষণ হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে। গাছের শাখা দোদুল্যমান। মাঝে-মাঝে হাওয়া বইছে এলোমেলো। জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মদিনের দাবদাহের পরে স্বস্তির শ্বাস ফেলছে শহরবাসী। সঞ্চরমান ছিন্ন মেঘের আস্তরণে লুকোচুরি খেলছে নক্ষত্ররা।

লেফাফাখানা ধ'রে ম্যানেজারবাবু ক্ষুব্ধ চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকেন কাছারীর দালানে। মালিক এখনও ফিরে আসে না। গৃহকর্ত্রীকে মনে পড়ে তাঁর। শুদ্ধ, গম্ভীর ও ধৈর্য্যের প্রতীক তিনি, ছেলের অপকর্ম্মে ত্যাগ ক'রে গেছেন এই গৃহ। মনে-মনে ইতস্তত করেন ম্যানেজারবাবু, লেফাফাখানা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবেন, না গভর্ণমেণ্টের কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন। পাঠিয়ে, জানিয়ে দেবেন তার বিরুদ্ধে গুপ্ত-আন্দোলনের সূত্র?

নায়েবদের একজন এসে বলেন,—গিন্নীমা'র মাসিক খোরপোষের টাকাটা যেন পিসীমা'র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি জানিয়ে গেছেন।

ম্যানেজারবাবু বলেন,—নিশ্চয়ই। আগামী প্রাতেই পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।

কুমুদিনী তখন ননদিনীকে নিয়ে বসেছেন ফর্দ্দ করাতে। ছেলের বিয়ের ফর্দ্দ। কুমুদিনী বলছেন আর লিখছেন হেমনলিনী। তত্ত্বের তালিকা প্রস্তুত করছেন তাঁরা। হেমনলিনীর লিখিত বাঙলা অক্ষর যেন ঠিক

মুক্তার মত। হেমনলিনী যে শিক্ষা পেয়েছিলেন কিশোরী-বেলায়! ভাই-দের চেষ্টায় শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্তর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর। অনেক বই শেষ ক'রে-ছিলেন। পরীক্ষায় পুরস্কার পর্য্যন্ত পেয়েছিলেন।

কুমুদিনী বলছেন আর লিখে চলেছেন হেমনলিনী। লিখছেন তত্ত্বের উপকরণ। কনের আত্মীয়-স্বজনের নাম। গহনা, বাসনপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদের ফিরিস্তি।

আর ছেলে তখন একেবারে বেহুঁস হয়ে বিবি গহরজানের কাছে—

চিৎপুরের মসজিদের মিনার দেখা যায় চকিতে।

অন্ধকার। তমসাবৃত দিক্‌চক্রে সহসা দেখা দেয় তড়িৎশিখার হঠাৎ আলো। মসজিদের পেছনে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকায় কয়েক বার। মিনারের কবুতরেরা সন্ত্রাসে কাঁপতে থাকে আসন্ন ঝঞ্চার আশঙ্কায়। হাওয়ার বেগও কেমন দুরন্ত। শোঁ-শোঁ শব্দ। বিপ্লব ঘোষণা করে যেন প্রকৃতি, এই সৌখীন নগরীর ঠিক মাথার ওপর। চক্রাকারে পথের ধূলা উড়তে থাকে। হাওয়ার দাপটে নিবে যায় অনেক দোকানের ঝুলন্ত লণ্ঠন। মালিকরা ঝাঁপ ফেলে দেয় দোকানের। কপাট বন্ধ হয়ে যায় নিশাচরীদের জানলার। তবুও হাওয়ার গতি যখন হ্রাস পায় কখনও কখনও, শোনা যায় সারেঙ্গীর করুণ ঝঙ্কার। কোথা থেকে ভেসে আসে কে জানে, তবলার মৃদু-মৃদু শব্দ। আর নূপুরের রুনু-ঝুনু। রাত্রির আঁধার তার ধীর-মন্থর পদক্ষেপে কতটা অগ্রসর হয়েছে ঠিক বোঝা যায় না। আকাশের মেঘে ঘন কাজলের স্পর্শ, হাওয়ায় ঝড়ের দোলা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পথ প্রায় জনহীন। শুধু গলির মোড়ে-মোড়ে গাঁটকাটারা বসে আছে ওৎ

পেতে। অসাবধানী মাতাল দেখলে হয় একবার! ক্রূর, তির্য্যক্ দৃষ্টি তাদের চোখে। রোজগারের আশা আর পুলিশের ভয়ে তাকাচ্ছে এধার-ওধার। অশ্লীল ভাষায় কথা ক'চ্ছে পরস্পর। শিষ দিচ্ছে থেকে-থেকে কর্কশ স্বরে, মুখে আঙুল পুরে।

রাত্তিরটা মাঠে মারা গেল বুঝি। ঝড়-বৃষ্টির রাত, নিশাচরীদের দুর্দ্দিন। খদ্দের আসে না, আলসের ধারে দাঁড়ানো যায় না, রোজগার হয় না,—শুধু সাজাগোজাই সার হয়। যারা রোজ আনে রোজ খায়, তাদের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মওকা পেয়ে জানাশুনারা আসে, নামমাত্র মূল্য দিয়ে রাত কাটিয়ে যায়। তাই রাত্রে বর্ষার ইঙ্গিত পেলেই মুখের হাসি মিলিয়ে যায় তাদের। খিটখিটে মেজাজ হয়ে যায়। দেবতাদের দোষে।

ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকায় আর দুড়-দাড় দরজা-জানলা পড়তে থাকে। কড়-কড় শব্দে বজ্রপাত হয় কোথায়। হঠাৎ নাম ধ'রে কে ডাকে শুনে আবদুল ইতি-উতি তাকায়। বসিরুদ্দীন গাড়ীর কাছাকাছি এসে বলে,—কোচম্যান্ সায়েব, হুজুর আর ফিরবেন না এই বাদলার রাতে। তুমি গাড়ী ফিরিয়ে নে যাও। ভোর নাগাদ এসো, হুকুম করলেন হুজুর।

কথাগুলো শোনে আবদুল। শোনে স্তব্ধ-বিস্ময়ে। উত্তর করে না কিছু। কেমন হতাশার হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। দুঃখের হাসি। সামান্য এই ক'দিনে এত বেশী উন্নতি আশা করতে পারে না যেন। বেড়াতে এসে রাত্রি অতিবাহিত ক'রে যাবেন হুজুর, কার রূপের এত প্রলোভন? ক্রোধ আর উত্তেজনায় বেশী কিছু বলে না আবদুল, শুধু বলে,—যো হুকুম।

বসিরুদ্দিন বললে,—হ্যাঁ, কোচম্যান সাহেব, হুজুর এই হুকুমই করেছেন। চটপট হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাও, আসমানে যা বিজ্‌লীর ঝলক মারছে!

বসিরুদ্দিন যে এসে কথাগুলো বলতে পেরেছে তাই যথেষ্ট। মদের

নেশায় তার জড়িত কণ্ঠ, টলটলায়মান মূর্ত্তি। তবুও নেশার উগ্র আনন্দে নেশাকে তুচ্ছ ক'রেই সিঁড়ি বেয়ে প্রায়ান্ধকার রাস্তায় নেমে হুজুরের প্রতীক্ষারত গাড়ীখানাকে খুঁজে বের করেছে। বলেছে ঠিক, যা-যা বলতে হবে। তারপর এলোমেলো দমকা বাতাসে খুশীমনেই ফিরে যায় যথাস্থানে। নেশার ঘোরে বেশ লাগে তার এই উড়ো বাতাস। তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত মাত্র এক গেলাসেই বসিরুদ্দিন তুষ্ট থাকেনি, মাসীকে হুজুরের সম্বন্ধে অনেক আশার বাণী শুনিয়ে আদায় ক'রেছে আরও দু'তিন পাত্র। হুজুর গহরজানের কাকুতি-মিনতিতে নেশার ঝোঁকে রাত্রি কাটাতে সম্মত হওয়ায় মাসীও খুশীতে উপ্‌চে পড়েছে। আনন্দাতিশয্যে মুখ ফুটে ক'বার আশীর্ব্বাদও করেছে বসিরুদ্দিনকে। বলেছে,—বসির, তোকে কি ব'লে আর আশীর্ব্বাদ করব! বাবা শ্মশানেশ্বর তোর মঙ্গল করুন।

গহরজানের গতি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বসিরুদ্দিনের এত যে ব্যস্ততা কেন, তার ভেতর কিছু রহস্য না থাকলেও সহজ কথায় বলতে হয় তার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল দু'পক্ষ থেকেই কিছু-কিছু আয় করা। নগদ-নারায়ণের জোগাড় দেখা। বসিরুদ্দিনের গানের গলা আছে, দু'-চার রকম বাজনায় দখলও আছে; কিন্তু থাকলে কি হবে, গান-বাজনার কদর ক'টা লোক করে? বসিরুদ্দিন ক'বার চেষ্টাও করেছিল যাতে কোন করদ রাজ্যের বাঁধা গাইয়ে হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বসিরুদ্দিনের চেয়ে আরও অনেক খ্যাতিমানেরা আছে। তাদের ফেলে কে ডাকবে তাকে? তবে, মাঝে-মিশেলে ডাক পড়ে তার কোথাও কোথাও থেকে। কিছু-কিছু আয়ও হয়। তবুও বসিরুদ্দিন সেই সব ডাক একেবারে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরে না—ছ'মাসে-ন'মাসে হয়তো এক-আধ বার। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি আর সেরাইকেলার রাজকীয় গানের আসরে হয়তো গাইতে যায়। যাওয়া-আসার পাথেয় আর কিছু উপরি টাকা। তাতে

দিন গেলেও বছর গড়ায় না। বসিরুদ্দিন তাই এই পল্লীর আশ্রয় নিয়েছে। রূপে আর গুণে সত্যিই যাদের বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, শুধু তাদের ঘরেই তার গমনাগমন। যৌবন যাদের বিলীয়মান, কণ্ঠস্বরে যাদের নেই আর তেমন আকর্ষণ, নৃত্যকলায় যারা পারদর্শিতা হারিয়েছে—তাদের জন্যে মুখ নষ্ট ক'রে কি হবে? সময় নষ্ট ক'রে? যাদের দেখলে চরিত্র রক্ষা করা কঠিন, তাদের জন্যে বসিরুদ্দিন। যাদের দেখলে চরিত্র ভাল হয়ে যায়, তাদের জন্যে নয়। আর বসিরুদ্দিন খদ্দেরও করে না চুনোপুঁটিদের, কুই-কাৎলাদের ধরে। যাদের নাম করলে উনুনে হাঁড়ি চাপে না, তাদের চেনে না বসিরুদ্দিন; যাদের নাম করলে দু'-দশটা লোক চিনতে পারে তাদের সঙ্গে তার যত দোস্তি।

ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। বসিরুদ্দিন তাকায় আকাশের দিকে। আকাশটা যেন লাল মনে হয়। গঙ্গার ঘোলা জলের মত রঙ মেঘের। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ খেলে আকাশের তীরে। অন্ধকার সহসা হাসতে থাকে যেন। রাস্তা থেকে ভেতরে যায় বসিরুদ্দিন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠে গহরজানের ঘরের দিকে। নেশায় কাতর হয়ে বসিরুদ্দিন টলছে; সিঁড়িটা আরও যেন টলতে থাকে বাসুকির ফণার মত।

সিঁড়ির মুখে, অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে। খুব কাছাকাছি আসতে আন্দাজে বোঝে বসিরুদ্দিন। নাকে তার ভেসে আসে মিষ্টি এক সুগন্ধি। ছিল গহরজান, অপেক্ষা করছিল বসিরুদ্দিনের। জামার বুকে মেখেছিল সে জেস্‌মিনের আতর। অতি উগ্র গন্ধ তার পেয়েছে বসিরুদ্দিন। একেবারে কাছে আসতেই ফিসফিস কথা বললে গহরজান,—একটা কাজ করতে হবে তোমায়।

—হুকুম কর' বিবিজান। কারও শির তোমার পায়ে হাজির করতে হবে? বসিরুদ্দিন বললে চাপা কণ্ঠে। গহরজানের চিবুক ধ'রে।

—না, না। সহাস্যে আবার ফিসফিস করলে গহরজান।—এই নাও একটা টাকা। গোটা দুই জুঁইয়ের গোড়ে এনে দিতে হবে এখুনি।

—আলবৎ এনে দেবো বিবিজান। তবে পানি পড়ছে বাইরে। দাও, রূপেয়া দাও। কথার শেষে টাকাটা নিয়ে নেমে যায় বসিরুদ্দিন। কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলে,—মালাবদল হবে বুঝি, বিবিজান?

গহরজান হাসে ক্ষণেক। বলে,—হ্যাঁ, মালাবদল হবে। তবে সাদি হবে না।

গহরজানের কথাগুলিতে কেন কি জানি দুঃখের স্বর বেজে উঠলো। হাসলো যেন হতাশার হাসি। গহরজানের মনের গহনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কথা হয়ে কি ফুটে উঠলো! বিয়ে যার সত্যিই হ'তে পারতো এই ভাগ্য-বিপর্য্যয় না হ'লে, তার মনে সাদির সাধ জাগবে না? বিয়ে যার আর কখনও হ'তে পারে না, সে খেলতে চাইবে না মালাবদলের খেলা! বসিরুদ্দিন চলে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে গহরজান। অবিন্যস্ত পোষাক ঠিকঠাক করে। বর্ষার ঠাণ্ডা বাতাস লাগে চোখে-মুখে, বেশ লাগে যেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ। চমকে ওঠে যেন গহরজান। শিউরে ওঠে ভয়ে। কার ঘরের মানুষ মাতলামি করছে। পশুর মত চীৎকার করছে। কাছাকাছি কোন্ ঘরের। গহরজানের দু'খানা ঘর আর এক ফালি বারান্দা, আর আর ঘরে আছে আর আর কত কে।

—গহর, গেলি কম্‌নে?

দরজার ফাঁক থেকে গহরজানকে দেখতে না পেয়ে সিঁড়ির মুখে খুঁজতে আসে মাসী। বার্দ্ধক্যের জন্যে দিনের বেলাতেই দূরের কিছু ঠাহর করতে পারে না, রাত্রে তো বটেই। তাই অতি সাবধানে ধীরে ধীরে এসেছে মাসী। সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে কথা বলেছে,—গহর, গেলি কম্‌নে?

—এই যে মাসী, এখানে। জানান দেয় গহরজান। বলে,—দেখো, সাবধানে এসো।

মাসী আর এগোয় না। সেখান থেকেই বলে,—তুই হেথায় এমন নিরিবিলিতে কেন?

কি উত্তর দেবে ভাবছিল গহরজান। খানিক পরেই বললে,—বসিরকে পাঠিয়েছি জুঁইয়ের গোড়ে কিনতে। এখুনি এলো ব'লে।

হ্যাঁ, এখনি আসবে বসিরুদ্দিন। এ তল্লাটে ফুলের দোকান যে অনেক আছে। ফুলের কদর করে এ পল্লীর বাসিন্দা। খোঁপায় ফুল গোঁজে, ফুলের মালা পরে, ফুলদানিতে ফুল ভরে। এখানে ফুলের ছড়াছড়ি।

—তা বেশ করেছিস্। বললে মাসী,—রাতে থাকবে তো খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করবি? ভাতের থালা তো আর ধ'রে দেওয়া যাবে না। আমি না হয় যাই একবার, দেখি যদি ডিম মাংস কিছু পাই। দেরাজ খুলে ক'টা টাকা বের ক'রে দে দেখি।

—তুমি যাবে কেন এই রাত্তিরে আবার। রাস্তায় নেমেই তো খাবারের দোকান। বসির না হয় ব'লে আসবে। দোকানের লোকই দিয়ে যাবে'খন। গহরজান কথাগুলো ব'লে ব্যাপারটা অনেক হালকা ক'রে দেয়।

মাসীও নিশ্চিন্ত হয়। বলে,—তা বেশ কথা। বসির ফিরলে তবে তুই টাকা দিয়ে কি আনবে না-আনবে ব'লে দিস্। আমি ততক্ষণ গড়াচ্ছি ও-ঘরে। কোমরের বেদনাটা চাগা দিয়েছে আবার।

মাসীর কোমরে পুরানো বাত। মাঝে-মাঝে ব্যথিয়ে ওঠে। শুয়ে-শুয়ে কাতরায়। মাসী আর মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে শয্যা নিতে যায়। গহরজান অন্ধকারে অপেক্ষা করে চুপচাপ। আশা-নিরাশার অনেক স্বপ্নই দেখতে থাকে গহরজান। কেমন যেন মন থেকে বিতৃষ্ণা আসে দিনযাপনের এই

ঘৃণ্য ধারার প্রতি। টাকা রোজগারের অছিলায় কত জঘন্য লোকের মুখে হাসি ফোটাতে হয়, কত হীন আর কদর্য্য অবস্থায় মানিয়ে নিতে হয় নিজেকে। বেশ মনে পড়ে গহরজানের, সেই প্রথম দিনের কথা! যেদিন মাসীর কঠোর শাসনের ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গহরজান অজানা-অচেনা কোন লোকের সঙ্গে রাত্রি যাপন ক'রেছিল। কান্নার বেগ সামলে হাসি ফুটিয়েছিল মুখে। পরিবর্ত্তে কি সে পেয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের বদলে মাসীর ক'টা মিষ্টি কথা ছাড়া আর কি পেয়েছিল? তার পর থেকে এখনও পর্য্যন্ত চলেছে সেই মন নয়, দেহ দেওয়া-নেওয়ার অফুরন্ত লীলাখেলা। বিতৃষ্ণায় ভ'রে যায় গহরজানের অন্তর, তাই সে পূর্ণচ্ছেদ টানতে চায় এই হীনতম কাজে। হাজারো জনের সঙ্গসুখ লাভের চেয়ে খোঁজে সে মনের মত একজনকে যদি পাওয়া যায়!

কড়-কড় শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে কোথায়। অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে এতক্ষণে। বাতাসে জলের কণা। শোঁ-শোঁ হাওয়া বইছে। ছাদের নালা ব'য়ে জলের তোড় নেমেছে নীচের উঠোনে। গেছে আর এসেছে বসিরুদ্দিন। জলে-ভেজা জুঁইয়ের গন্ধে বর্ষার বাতাসও যেন উন্মনা হয়ে উঠলো। বসিরুদ্দিনও ভিজে গেছে জলের ধারায়। গহরজান মালাগুলো নিয়ে সহানুভূতির সুরে বললে,—ইস্, তোমাকে জলে ভেজালাম তো! এখন কি হবে?

বসিরুদ্দিন হাসতে-হাসতে বলে,—কি আর হবে, কিছু হবে না। দু' পাত্তর চাপালেই পানি-ফানি এখুনি শুকিয়ে যাবে। তুমি এখন একটা বোতল বের ক'রে দাও দিকিন। মাসীর কাছে চাইলেই তো খ্যাক্ ক'রে উঠবে এখুনি।

অনেক সাধের ফুল হাতে পেয়েছে গহরজান। খুশীর হাসি হেসে বললে,—এখুনি দিচ্ছি। তুমি এইখানে থাকো, ও-ঘরে মাসী আবার বাতের

বেদনায় শুয়ে প'ড়েছে এতক্ষণে। দিশী, না বিলিতী খাবে?

শুধু ফুল নয়, আরও কি যেন এক সুগন্ধির তীব্র গন্ধ পায় বসিরুদ্দিন গহরজানের গা থেকে। জেস্‌মিন আতরের। বসিরুদ্দিন বলে,—দিশী, দিশীই সই। যেও না, একটা কথা বলি শোন'।

চ'লেই যাচ্ছিল গহরজান। বসিরুদ্দিনের কথা শুনে ফিরে দাঁড়ালো। বসিরুদ্দিন এগিয়ে গিয়ে প্রায় কানে-কানে বললে,—এমন রাত আর আসবে না। যেমন ক'রে পারো বশ মানিয়ে নিতে হবে। কস্‌কালে এমনটি আর আমি জোগাড় করতে পারবো না। তোমার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হ'লে আমিও এ কাজে ইস্তিফা দিয়ে চ'লে যাবো লাহোরে। এক বাঈ আমার সাকরেদ হবে ব'লে পত্তর দিয়েছে সেখান থেকে। মাসে দেড়শো টাকা, কেলোয়াতী শিখবে শুধু। বুঝলে বিবিজান?

গহরজানের মনটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। বসিরুদ্দিন না থাকলে,—সে যেন আর ভাবতেই পারে না। সময় অপব্যয় হচ্ছে দেখে গহরজান কেবল বলে,—হ্যাঁ। বলতে-বলতেই ত্যাগ করে সিঁড়ির মুখ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসে আবার। শাড়ীর আঁচলের ভেতর থেকে বের ক'রে দেয় একটা বোতল। দিয়েই চ'লে যায় তৎক্ষণাৎ। যেতে-যেতে বলে,—তুমি ও-ঘরে আছো তো? আমি আসছি খানিক পরেই।

বসিরুদ্দিন সে-কথার কোন উত্তর দেয় না। বোতল পাওয়া মাত্রই মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে দাঁতে ছিপি খুলে ঢকঢকিয়ে খেতে থাকে বোতলের জলীয় পদার্থ। মুখটা শুধু বিকৃত করে।

ঘরে ঢুকে দেখলো গহরজান—ঘরের লোক তখন গহরজানেরই ওড়না-খানা নাড়াচাড়া করছে। ফিরোজা রঙের ওড়না। চুমকি-শলমার কাজ দেখছে হয়তো। জুঁইয়ের রাশি ফরাসের মাঝখানে নামিয়ে রেখে গহরজান

যেন গরমে অসহ্য হয়েই খুলে ফেললে গায়ের জামাটা। যতটুকু দেহাংশ ঢাকা ছিল জামাতে, এতক্ষণে যেন মুক্ত হ'ল। তবুও এখনও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়নি, এখনও রয়েছে গোলাপী ভয়েলের কাঁচুলী। জামাটা এক পাশে ফেলে দিয়ে অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে বসলো গহরজান।

কৃষ্ণকিশোরের নেশাচ্ছন্ন চোখ ঘুমে ঢুলু-ঢুলু। বললে,—এত ফুল এলো কোথা থেকে? কি হবে?

গহরজান হাসলে, ম্লান হাসি। বললে,—বাগান থেকে। কথা বলতে-বলতে একটা মালা জড়িয়ে-জড়িয়ে পরলে নিজের খোঁপায়। আর একটা মালা সহসা পরিয়ে দিলে তার কণ্ঠে। বললে,—আমি খুলে না নিলে খুলতে পাবে না।

আগের দিন ঘর ছিল অন্ধকার। গহরজানের যে এত রূপ তা যেন চোখে পড়েনি। এত রঙ দেখতে পায়নি। এমন নিটোল গড়ন পল্লবিনী লতার মত! ঘরের আবহাওয়া যেন বদলে গেল জুঁইয়ের গন্ধে। গহরজান চোখে করুণ দৃষ্টি ফুটিয়ে কথা বলে কাতর স্বরে। বলে,—মালাটা এবার পরিয়ে দাও আমার গলায়। মালাবদল হোক্। আর মালাবদল হ'লে—

কথামত মালা খুলে সত্যিই কৃষ্ণকিশোর পরিয়ে দেয় গহরজানকে। বলে,—কি বলছিলে? আর, মালাবদল হ'লে?

খুশীর বন্যায় যেন উথলে ওঠে গহরজানের দেহ-মন। মালা প'রে তৃপ্তির আতিশয্যে দু'বাহু মেলে বক্ষে টেনে নেয় তাকে। বলে,—মালাবদল হ'য়ে গেলে বিয়ে হ'য়ে যায়। কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না চিরদিনের মত।

কৃষ্ণকিশোর দেখে গহরজানের অনিন্দ্য রূপ। দেখে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। গহরজানের কথাগুলো শুনে চিন্তাকুল হ'য়ে ভাবতে থাকে কি যেন। গহরজানের বাহুর অলঙ্কারটা লক্ষ্য করে। চুণী আর পান্নার তাবিজ। গহরজানের গায়ের রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেছে। গহরজান আবদারের

স্বরে শুধোয়,—রাত্তিরটা থাকবে আমার কাছে, খেতে হবে তো কিছু? কি খাবে বল' ?

এখন যেন অনেক বেশী ভাল লাগে গহরজানকে, আগের দিনের চেয়ে। মনে হয়, কত যেন নিকট-সম্পর্কের। কত দিনের পরিচয়ে কত যেন আপন। কৃষ্ণকিশোর বললে,—হ্যাঁ, খাব। কথার শেষে চোখের ইশারায় দেখিয়ে দেয় গহরজানের ওষ্ঠাধর।

গহরজান ইশারার ইঙ্গিত দেখে হেসে ফেললে খিলখিল ক'রে। হাসি থামিয়ে বললে,—খেলে যদি খিধে মিটতো, তা হ'লে ভাবনা ছিল! থামো, আমি খাবারের কথা ব'লে আসি। যাবো আর আসবো।—বলতে-বলতে সে নিজের মুখখানাকে এগিয়ে ধরে।

কৃষ্ণকিশোর যা খেতে চাইছিল, তাইই পায়। খায় অনেক্ষণ ধ'রে। যেন সুধা পান করে। গহরজান কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে মুক্ত ক'রে উঠে যায় খাবারের জোগাড়ে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখে ঘুমন্ত মাসীকে। আর দেখে বসিরুদ্দিনকে। বোতল পাশে নিয়ে ব'সে আছে মাদুরের 'পরে। গহরজানকে দেখে বিস্মিত হয় যেন—প্রায় নিরাবরণ গহরজান।

গহরজান বললে কাকুতির স্বরে,—বসির, দোকানে গিয়ে ব'লে এসো না। খাবার দিয়ে যাবে। মাংস, ডিমের ডালনা আর রুটি দিতে বলবে। এই নাও টাকা। মাসীর নাম করবে। নয় তো, কার ঘরে আবার দিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

—যো হুকুম বিবিজান। বলতে-বলতে উঠে পড়লো বসিরুদ্দিন। গহরজান দেরাজ খুলে টাকা দিতেই চ'লে গেল তক্ষুনি। টলতে-টলতে।

ঘরে যেতেই বললে কৃষ্ণকিশোর,—বেড়ালটাকে বুঝি তুমি পুষেছো?

ডালিম কখন্ এসে ফরাসে আরাম ক'রে বসেছে, এতক্ষণ দেখতেই

পায়নি। ঘুমের ভান ক'রে ব'সে আছে ডালিম, চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে। যেন কত ঘুমোচ্ছে। গহরজান বললে,—ও মা! তুমি এসে হাজির হয়েছো? হ্যাঁ, ওকে আমি পুষেছি। আমাকে না দেখলে ও থাকতে পারে না। তোমার কাছে একটা আর্জ্জি আছে আমার। বলবো?

গহরজানকে বুকে টেনে নিয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর,—হ্যাঁ, বল' না।

—কথা রাখবে বল'?

—হ্যাঁ।

তবুও যেন বিশ্বাস হয় না গহরজানের। বলে,—কিছুতেই কথার খেলাপ হবে না তো?

—না। বল' না তুমি আর্জ্জিটা।

খানিক নীরবে তাকিয়ে থাকে গহরজান, মদালস দৃষ্টি মেলে। তার পর বলে,—ঐ ডালিমের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে তোমাকে। আমি ওর বিয়ে দেওয়াবো। অনেক টাকা খরচ করতে হবে কিন্তু।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—বেশ তো। কিন্তু বিয়েটা হবে কার সঙ্গে?

গহরজান সম্মতি পেয়ে উৎসাহে উপছে পড়ে যেন। বুকে তার মুখ রেখে বলে ধীরে ধীরে,—এ পাড়াতে গঙ্গামণি নামে আমার একজন বন্ধু আছে। যার কাছে আছে, কি যেন নাম তার! হ্যাঁ, ঠনঠনের মল্লিকদের বিষ্টুবাবু। কোটি টাকার মালিক। ঐ গঙ্গামণির বিড়াল রতনের সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা হয়ে আছে আমার ডালিমের। এখন তুমি রাজী হ'লেই হয়।

গহরজানের রূপে মুগ্ধ হয়ে গেছে। কখনও যা দেখেনি, দেখতে পেয়েছে সামনা-সামনি। এখন যা বলবে তাই। কৃষ্ণকিশোর নেশার ঝোঁকেই বলে,—বেশ তো। দাও-না তুমি বিয়ে। এ আর কি এমন কথা!

তৃপ্তির হাসি দেখা যায় গহরজানের চোখে-মুখে। নিশ্চিন্ততার পরিতৃপ্ত হাসি। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে কি করবে যেন ভেবে পায় না। সাপের মত আরও নিবিড় করে বাহুবন্ধন। আরও কাছে টেনে নেয়। মূর্খের মত সাত-পাঁচ না ভেবে যে সম্মতি জানায়, তারও মুখে যেন গর্ব্বের ছায়া ফুটে ওঠে। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এমনি তাচ্ছিল্যের চাউনি তার চোখে।

অতি কাছেই রূপার রেকাবীতে ছিল এলাচদানা আর মশলা। দারুচিনি, মৌরী আর লাল-সুপারী। গহরজান ক'টা এলাচদানা পুরে দেয় তার মুখে, পরম আদরে। নিজের কণ্ঠের মালাটা খুলে পরিয়ে দেয়। কৃষ্ণকিশোরও পরিয়ে দেয় গহরজানকে। এমনি মালা-বিনিময়ের খেলা চলতে থাকে কতক্ষণ। হাসতে-হাসতে।

রাত্রি আর বর্ষা তখন বাইরে যেন পাল্লা দেয় পরস্পরে। ঘোর অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন ক'রে কড়কড়িয়ে মেঘ ডাকে। বর্ষণ হয় দুরন্ত বেগে।

আর তখন ঠিক আরেক জন কিশোরী ঘুমের মাঝে দেখে কত বিচিত্র স্বপ্ন! কত রঙীন পটভূমিকায়। রাজার রাণী হবে সে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাকে দেখে পছন্দ হয়েছে যাদের, তাদেরই গৃহের বধূ হবে। আর তাও যেমন-তেমন ঘর নয়, ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী যাদের ঘরে বাঁধা। একমাত্র পুত্র; বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কল্পনাতেও যা কেউ ভাবতে পারে না, স্বপ্ন দেখে শুধু! ঘুমের ঘোরে সেই স্বপ্নই দেখছিল রাজেশ্বরী। নিদ্রাতুর মুখে তার মাঝে-মাঝে হাসির রেখা মিলিয়ে যায়। রাজেশ্বরী স্বপ্ন দেখে রাজ্যেশ্বরী হওয়ার?

—ও রাজো, আর কত ঘুমোবি?

—কৈ না তো, আমি তো জেগে রয়েছি।

—তোর যে বে, লা! আয়, যোলো বিনুনীর খোঁপা বেঁধে দিই। কনে-চন্নন পরিয়ে দিই। পায়ে আলতা দিয়ে দিই।

রাজেশ্বরী উঠে বসে ধড়মড়িয়ে। বজ্রপাতের শব্দে তার নিদ্রা টুটে যায়। কৈ, ঠাগ্‌মা কৈ? কেউ তো নেই, শুধু বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দ। রাজেশ্বরী আবার শুয়ে পড়লো ক্ষুণ্ণ মনে। কত দেরী আর সেই শুভ-দিনের! সেই শুভলগ্নের! সেই শুভদৃষ্টির!

রাত্রির পর দিন। অন্ধকারের পরেই আলো। বর্ষার পর যেমন দেখা দেয় শুভ্র পরিচ্ছন্ন আকাশ। কূল-ছাপানো জোয়ারের পর যেমন ভাঁটা। তেমনি ঠিক ঘনঘোর বর্ষার রাত্রি স্তিমিত হয়ে আসে অতি ধীরে। ভিজে আকাশের পূর্ব্বাচলে সূর্য্য যেন নেই, তবু সূর্য্যের ঘোলাটে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয় শহরাঞ্চল। কাক আর চড়াই আলো দেখে ডাকাডাকি করে। ঠাণ্ডা বাতাস বয়। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন কে জানে, কিন্তু বাতাসে যেন জলের রেণু। শহরের পথ পিচ্ছিল।

আদেশ মত ভোরে উঠেই গাড়ী নিয়ে হাজির করে গরানহাটায় কোচম্যান আবদুল। ঘণ্টাটা বাজায় কয়েক বার। জানান দেয় তার উপস্থিতি। অনেক্ষণ অপেক্ষার পর হুজুর আসে, গাড়ীতে উঠে বসে উড়ু-উড়ু চেহারায়।

বিদায় দেওয়ার সময় গহরজান শুধু কাকুতির সুরে ব'লে দেয়,—আর যেন মিঞাকে না আনতে হয়। এখন তো চেনা-জানা হয়ে গেছে,

নিজে-নিজেই চ'লে আসবে যখন খুশী। আর, না এলে, আমিই গিয়ে হাজির হবো।

কথাটা শুনে কৃষ্ণকিশোর বলে,—না না, তুমি যেন যেয়ো না। আমিই আসব। লোকে কি মনে করবে?

খিল-খিল শব্দে হেসেছে গহরজান, লোকভীতি দেখে। হাসতে-হাসতেই বিদায় দিয়েছে। বসিরুদ্দিন চ'লে গেছে কখন জানতে পারেনি গহরজান। হয়তো, দোকানে খাবারের কথা ব'লে দিয়ে চ'লে গেছে বসিরুদ্দিন নিজের বাসায়, ঐ ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই। বসিরুদ্দিনের বাসা, এখান থেকে অনেক দূর। খিদিরপুরের মেটিয়াবুরুজে।

মাসী ভোরে উঠেই গেছে গঙ্গাস্নানে। স্নান সেরে বাবা শ্মশানেশ্বরের পূজা দিয়ে ফিরতে মাসীর অনেক দেরী। গহরজান গিয়ে ফরাসে এলিয়ে পড়ে ঘুম-কাতর চোখে। প্রায় বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে গহরজান। চোখে এখনও যেন ঘুম লেগে রয়েছে পুরোপুরি।

ঘরের ভেতর বাসি জুঁইয়ের মিষ্টি গন্ধ। ফরাসে গেলাস আর বোতল। পানের ডিবে। মশলার রেকাবী। তাকিয়াগুলো হেথায়-সেথায় ছড়িয়ে আছে। বেশ বোঝা যায়, রাত্রে যেন তাণ্ডবলীলা হয়ে গেছে। তারই চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে ঘরে।

বাড়ীতে ফিরতে যেন মন চায় না।

নেহাৎ ফিরতে হয় তাই যেন ফিরেছে। গহরজান একটা রাতের মধ্যে কি এমন আকর্ষণের মায়ায় জড়ালে যে, আজন্ম যেখানে লালিত-পালিত হয়েছে—সেই বসন্ত-বাড়ীতে আর মন উঠছে না। কেউ যেন নেই কোথাও। যক্ষপুরীর মত শূন্য গৃহ! লোকজন গেল কোথায় সব। পাইক, বরকন্দাজ, তাঁবেদার, ভৃত্যের দল ছুটি নিয়েছে নাকি? ফটকে শুধু দ্বারপালকে দেখা

যায়, পেতলের লোটায় ছাই ঘষছে। জুড়ী আসতেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। গাড়ীর মধ্যস্থিত মনিবের উদ্দেশে সেলাম ঠোকে!

মনিবকে আসতে দেখে সাহস-ভরে কথা বলে শুধু একজন। অন্দরের কোথা থেকে কথা বলে কে জানে। পদক্ষেপের শব্দে খিলানের পায়রাগুলো উঠান থেকে উড়ে পালায় ঝাঁকে-ঝাঁকে। বিনোদা কথা বলে। বলে,—কোথায় কাটলো শুনি রাতটা? এ-ও দেখতে হ'ল এই পোড়াকপালে! একেবারে উচ্ছন্নয় গেলে? বিবেকে বাধলো না? ওমা, কি হবে গো! কোথায় যাবো গো! এমন নচ্ছার ছেলেও পেটে ধরে মানুষ? হায়, হায়, হায়, হায়!

কোন্ অদৃশ্য উত্তরদাতার উদ্দেশে যে কথাগুলি বলে বিনোদা, বুঝতে পারে না গৃহের মালিক। অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে শুধু, যেদিক থেকে কথা ভেসে আসে সেদিকে। বলে,—যাত্রা দেখতে গিছলাম।

কথাটা কি সত্যি?

তাই যদি গিয়ে থাকে, তাতে আর দোষের এমন কি আছে। নিজের মনে ভাবে বিনোদা। আর যাত্রা দেখতে না গিয়ে যদি গিয়ে থাকে অন্ত কোথাও! অস্থানে-কুস্থানে? এও মনে হয় বিনোদার, সারা রাত্রি জেগে ব'সে ব'সে যাত্রা দেখবার ছেলে ও নয়। মন থেকে যেন কেমন সায় দেয় না কথাটা। স্বগত করে চাপা-গলায়। বলে,—যাত্রা দেখতে গিছলে, না, আরও কিছু! জাহান্নমে গিছলে তা আর আমি জানি না? হায়, হায়, হায়! কি হবে গো! কোথায় যাবো গো! কোথা থেকে এসে জুটলো এই কুলাঙ্গার?

—মা আসেননি বিনো? ওপরে উঠতে-উঠতে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

—মায়ের সাত পুরুষের কি ভাগ্যি যে খোঁজ পড়লো। মুখ খিঁচিয়ে

বললে বিনোদা। বললে,—কোন্ মুখে আর আসবেন বল', তোমার মতন রত্ন ছেলে যাঁর ? নাঃ, আসেননি। আসবেনও না আর।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মনটা যেন আঁকুপাঁকু করে। কুমুদিনীর কুপিত মুখ নয়, হাসি-ভরা মুখ স্নেহময়ী কুমুদিনীর, চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বৈধব্যের দুঃখ-কাতর কথা যেন ভাসতে থাকে কানে। ছেলের শয়ন-ঘরে কুমুদিনীর ছবি আছে একখানা। সধবা অবস্থায় বধূবেশে কুমুদিনী। গায়ে জড়োয়া গয়না, মাথায় হীরার মুকুট আর বেনারসীর গোলাপী ভেল্। ওষ্ঠে পবিত্র হাসির মৃদু আভাস। চোখে সরল দৃষ্টি। রঙীন আবক্ষ তৈলচিত্র কুমুদিনীর। ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় ছবিখানা। ছবির তলায় দাঁড়িয়ে দেখে, দেখে তার মাকে—মায়ের এই রূপ খুব বেশী দিন দেখবার সৌভাগ্য তার হয়নি। মা কি কাঁদছে ! ছবিতে কুমুদিনীর চোখ দু'টো কি অশ্রু-সজল ! না, ছবিখানাই ঐ রকম। মনে হয়, মুখে তাঁর হাসির রেখা, আর চোখে জলের। দক্ষ শিল্পীর তূলির পরশে যেন জীবন্ত হয়ে আছে।

—ম্যানেজারবাবু দেখা করতে চাইছেন। অনন্তরাম এসে বললে পেছন থেকে।—খুব জরুরী দরকার, এখুনি দেখা করতে চান।

—চলো যাচ্ছি। কিন্তু অনন্তদা, মাকে আনাবার কি ব্যবস্থা হবে ? কৃষ্ণকিশোর কথা বলে কেমন যেন বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে।

খানিক চুপ ক'রে থাকে অনন্তরাম। কুমুদিনীর ছবিখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ছবির দিকে চোখ রেখেই বললে,—তেনাকে আনতে পারে—সাধ্যি কার ! তিনি আর আসবেন না। আসবার রাস্তা রাখলে কৈ ? কথা বলতে-বলতে অনন্তরামের কথাও যেন কাঁপতে থাকে। চোখ দু'টো যেন চিক-চিক ক'রে ওঠে। বলে,—আমাকেও ছুটি দিয়ে দাও।

ভৃত্যের কথার কোন উত্তর দেয় না মনিব।

ম্যানেজারবাবু জরুরী প্রয়োজনে ডাকছেন শুনে সদরের দিকে এগোয়। অনেক্ষণ দেখা পায়নি প্রভুর, টম্ ছুটতে-ছুটতে আসে কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চলে। গলার বন্ধনীতে পেতলের ঘন্টি, ঝুম-ঝুম শব্দ হয় টমের চাঞ্চল্যে।

কাছারীর দালানে অপেক্ষা করছিলেন ম্যানেজারবাবু। মুখখানা যেন তাঁর বিষণ্ণ। চোখের দৃষ্টিতে হতাশা। দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটেছে তাঁর মুখে। রাত্রে হয়তো ঘুম হয়নি, তাই চোখের তলায় মলিন রেখা। ম্যানেজারবাবু বিজ্ঞজন, বুঝে নিয়েছেন সকল কিছু। জীবনে তাঁর দেখবার ভাগ্য হয়েছে অনেক কিছু, অভিজ্ঞতার সীমাও তাঁর নেহাৎ অল্প নয়। ইচ্ছা করলে, হুজুরকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার পন্থাও তাঁর জানা আছে; কিন্তু সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর কোথায় থাকবেন তিনি! মাত্র এই ক'দিনের জন্য বাধার সৃষ্টি ক'রে, কি ফল হবে।

প্রাঙ্গণের গাছপালা থেকে তখনও বৃষ্টির জল পড়ছিল টুপ-টাপ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। গাছ আর লতাপাতার সবুজতা বর্ষার জলে ধৌত হয়ে আরও যেন অধিক পরিমাণে স্পষ্ট হয়েছে। ফুটন্ত ফুলের রঙ যেন চোখে পড়ছে অন্য দিনের চেয়ে।

ম্যানেজারবাবু একা নন। আরও কে একজন ব'সে ছিল কাছারীর দালানের কেদারায়। হুজুরের সাক্ষাৎ পেয়েই বললেন ম্যানেজারবাবু,—গত সন্ধ্যায় আপনার ফিরিঙ্গী বন্ধুটি এসে এই লেফাফাখানা দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন তাঁদেরই একজন worker এসে নিয়ে যাবে এটি। Worker-টিও এসেছেন। ঐ যে ব'সে আছেন।

ম্যানেজারবাবু কথার শেষে হস্তান্তরিত করেন লেফাফাখানি। কৃষ্ণ-কিশোর লক্ষ্য ক'রে দেখে workerকে। দেখে যেন চেনা-চেনা মনে হয়।

মনে হয় কোথায় যেন দেখেছে। মনে পড়ে নর্শ্মান অরুণেন্দ্রদের ড্রইং-রুমে বন্ধু-সম্মেলনের একটি সন্ধ্যা।

প্রতীক্ষারত workerটি এগিয়ে আসে কেদারা থেকে উঠে। বলে,—আমার নাম নর্শ্মান অজয়েন্দ্র। আলাপ হয়েছিল,—মনে নেই তোমার, নর্শ্মান অরুণেন্দ্রর দেওয়া টী-পার্টিতে?

যৌবনের প্রতিমূর্ত্তি যেন। কথার স্বরে তেজস্বিতা। বলিষ্ঠ দেহ, তবুও যেন কত কমনীয়। আকর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ে উগ্র দৃষ্টি। গ্রীসীয় ধরণের তীক্ষ্ণ নাসিকা। মাথায় এলবার্ট চুল। খাঁকির সার্ট আর পাৎলুন পরনে। পায়ে ক্যাম্পের বুট্।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হ্যাঁ, মনে আছে। নর্শ্মান অরুণেন্দ্র কোথায়? এই নাও তার দেওয়া লেফাফা। কি আছে এতে?

অনেকগুলি প্রশ্ন। ম্যানেজারবাবু চলে যাচ্ছিলেন নিজের কামরায়। কামরার কাছাকাছি গিয়ে বললেন,—Secretly ব'লে গেছেন ফিরিঙ্গীটি, লুধিয়ানায় গেছেন গত রাত্রের ট্রেনে।

হেসে ফেললে নর্শ্মান অজয়েন্দ্র। ফিস-ফিস শব্দে বললে,—না, সেখানে যায়নি। যেখানে গেছে, কেউ জানে না সন্ধান। আমি শুধু জানি। গেছে ট্রেনে চেপে বম্বে, সেখান থেকে জাহাজের খালাসী সেজে চ'লে যাবে জার্ম্মানী। Arms and ammunition জোগাড় করতে গেছে। ফিরতে বছর খানেক। কিন্তু, don't disclose it—কেউ যেন না জানতে পারে। তোমার সঙ্গে তার friendship, তুমি তার জন্যে anxious হবে, only for that reason আমি বললাম। আর এখন জানলেও, তাকে ধরা যাবে না। নর্শ্মান অরুণেন্দ্র এখন out of danger zone. আর এই লেফাফাতে আছে কয়েকটা map আর কিছু code. পরে কাজে লাগবে।

কথাগুলি শুনতে-শুনতে কৃষ্ণকিশোর বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। কথার

শেষে নর্ম্মান অজয়েন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত আরও অপেক্ষা করে। কৃষ্ণকিশোর আর কিছু বলছে না দেখে বলে,—If opportunity comes, আবার দেখা হবে। But don't disclose anything—কেউ যেন না কিছু জানতে পারে ঘুণাক্ষরেও।

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টা বাজতে থাকে ঢং ঢং। ক'টা বাজে কে জানে। নর্ম্মান অজয়েন্দ্র হাসতে-হাসতে চ'লে যায় লেফাফা পকেটস্থ ক'রে। কৃষ্ণকিশোর শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। নর্ম্মান অজয়েন্দ্রকে দেখে মনে প'ড়ে যায় লিলিয়ানকে। অনেক দিন বাদে মনে পড়ে। লিলিয়ানের কথা, আর তার মুখাকৃতি। লিলিয়ান আর নেই, এই কথাটিই বাজতে থাকে তার বুকে।

বর্ষা ঋতু। গঙ্গাজলের মত ঘোলাটে রঙ আকাশের। বাদলা-পোকা উড়ছে।

চাতকের ঝাঁক উড়ছে আকাশে, অনেক উঁচুতে, এখানে-সেখানে। হিমেল হাওয়া বইছে এলোমেলো। গাছ আর লতাপাতা জড়াজড়ি করছে পরস্পরে। হাওয়ার বেগে হেলছে দুলছে। বর্ষণের অবশিষ্ট চিহ্ন—গাছের পাতা থেকে জল পড়ছে টুপ-টাপ। আর ফুটন্ত ফুলের কত যে রঙীন পাপড়ি খসে পড়ছে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়ছে প্রজাপতির মত।

উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আরও কয়েকটা দিন।

ফুলের পাপড়ি হাওয়ায় উড়ছে প্রজাপতির মত।

উত্তুরে বাতাসে শাখা থেকে ঝরছে বর্ষায় ভেজা ফুল। কত অজস্র ফুল! রঙরেজ বিধাতার খেয়াল-খুশীর সৃষ্টি, কত বিচিত্র রঙ।

কখন কুঁড়ি ছিল, কখন আবার কেউ জানলো না, হ'ল ফুটন্ত—ছড়ালো সুগন্ধ, বিকিয়ে দিলে মধু। দেখতে না দেখতে কখন ফুরালো যে আয়ু—পাপড়ি খসিয়ে ধীরে ধীরে মিশে গেল ধুলায়। সাঁজের আবছা আঁধারে যেন ঘুম ভেঙ্গে জাগলো; জেগে রইলো হাওয়ায় দুলতে দুলতে। রাতের কত কুঁড়ি ভোরের ফুল হয়ে হাসলো পরস্পরে—রূপ আর রঙের ডালি দিলে উজাড় ক'রে দিনের পর দিন। তারপর এল ঝোড়ো হাওয়ার অশুভ সময়। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া? এলো অবিশ্রান্ত বর্ষণ?

প্রজাপতির মত বাতাসে উড়লো রঙীন ফুলের ছিন্নদল।

শীত যখন বিদায় নেয়, বসন্ত যখন আসে—সঙ্গে আনে পুষ্পশোভা, ধরিত্রীকে রাঙিয়ে দেয় ফুলের রঙে। বাসন্তিক ফুল—যেন প্রেমের মত। ফুলের মত প্রেম? অনেক ফুলে আছে যেমন মধু, কত ফুলে আছ বিষ। যেন মিলন আর বিরহ। সুখ আর দুঃখের মত। আসে আর চ'লে যায়—যায় আর আসে। একটি একটি পাপড়ি যেন একেকটি দিন।

পাখীর কূজনের সঙ্গে ফুল প্রস্ফুটিত হয়, দিন চক্ষু মেলে। পাখীর কূজনের সঙ্গেই আবার মুদিত করে চক্ষু। ফুলও ঝ'রে যায়। সুখের মিষ্টি স্বপ্নরাঙা মধুময় দিন। দুঃখের মেঘাচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর, বিষাক্ত দিন। দুর্দ্দিন। যেমন মিলন আর বিরহ?

ফুলের উড়ন্ত ছিন্নদলের মত দিনের পরিক্রমা।

উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আরও কয়েকটা দিন। অলস-জনের বৈচিত্র্যহীন দিন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মত যথা-পূর্ব্বং-তথা-পরং একেকটি দিন। তবে, হুজুরের উন্নতি হয়েছে কয়েক বিষয়ে। নাবালকত্বের টাইম্ ওভার হয়ে যাওয়াতে সরকার হুজুরকে জমিদারীর মালিকানা হ্যাণ্ড্-ওভার করেছেন। হুজুর স্বয়ং এখন মনার্ক্। রাজত্ব করবেন—অস্ত্র-চালনা না

শিখলে চলে না। হুজুর আলমারীতে সজ্জিত বন্দুক আর রিভলভার বের করিয়ে দাগতে শিখেছেন। ক'দিন এ উপলক্ষে শহরের আনাচে-কানাচে যেয়ে, জলা আর বাদায় উড়ন্ত বক মেরে এসেছেন। কাদাখোঁচা হত্যা ক'রে এসেছেন আর কাপ্তেনীর যত রকম কায়দা-কানুন থাকে তাদের রপ্ত ক'রে ফেলেছেন। আক্রামুদ্দিন নামে বাপ-পিতামোর আমলের পরিচিত দর্জ্জিকে ডেকে পাঠিয়ে কয়েক শত টাকার পোষাক করিয়েছেন। আক্রামুদ্দিন যে যে ফ্যাশনে হুজুরকে মানাবে বলেছে, হুজুর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সে সে পোষাকের মাপ এবং অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন। বলতে লজ্জা হয়, বিবি গহরজানকেও কয়েকটা দামী-দামী পোষাক লুকিয়ে করিয়ে দিয়েছেন। বেনারসী আর কিংখাবের জামা পেয়ে গহরজান যেন ব'র্ত্তে গেছে।

অভাগা জননী দিনের পর দিন ছেলের কীর্ত্তিকাহিনী শুনে কেঁদেছেন আর দিন গুনেছেন। ছেলের খেয়াল নেই। দিন গুনেছেন তিনি—বিয়ের ধার্য্য দিন। বিয়ে দিয়েই কুমুদিনী চলে যাবেন—কোথায় যাবেন কেউ জানে না। মুখ ফুটে বলেননি। মায়ে-ছেলেতে যাতে আবার পুনর্মিলন হয়, হেমনলিনী তার চেষ্টার ত্রুটি করেননি; কিন্তু কুমুদিনী যেন পাষাণ, কিছুতেই ঠাকুরঝির কথায় সায় দেননি। গৃহদেবতার অপমানে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে জপ-আহ্নিক নিয়ে থাকেন। সময়ে-অসময়ে কাঁদেন। কিছু মুখে তোলেন না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রেছেন বললেই হয়।

দেখতে দেখতে চ'লে গেল আরও কয়েকটা দিন।

ক্রমে বিবাহের দিন আরও ঘনিয়ে এলো। রাজেশ্বরীর স্বপ্ন সার্থক হওয়ার শুভক্ষণ। হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে মুখর হয়ে উঠল বিয়ে-বাড়ী। আত্মীয়-স্বজনরা এলো; মহল থেকে এলো আমলা আর গোমস্তা;

পড়শিরা এলো, যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হোগলার চালা উঠলো; এখানে-সেখানে ঝুললো হরেক রঙের লণ্ঠন; উঠানগুলো শামিয়ানার আবরণে প্রায়ান্ধকার হয়ে গেল। গোলাপী কাপড়ের তক্‌মা-ধরা ও উর্দ্দীপরা তাঁবেদার, ভৃত্য, পাইক, বরকন্দাজ আর সিপাইরা যে যার এলাকায় মোতায়েন হ'ল। বিয়ে-বাড়ী যেন গম-গম করতে লাগলো।

সানাই বাজলো।

সিন্দুক থেকে নিজের গয়না বের করতে করতে হেমনলিনী বললেন,—তোমার ছেলের বে, তুমি থাকবে না? ভাঁড়ার আগলাবে কে? লোকে কি বলবে? বৌকে আশীর্ব্বাদ করবে না?

কুমুদিনীর কাতর কণ্ঠস্বর। চোখে জলের রেখা। বিবর্ণ মুখাকৃতি। বললেন,—তুমি দেখবে ঠাকুরঝি! তুমি বৌ বরণ করবে। তুমি যজ্ঞি তুলবে। লোকজন আছে—তুমি যেমন বলবে তেমন হবে। বৌকে আমি প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিনই আশীর্ব্বাদ ক'রেছি। আমাকে এসে বলবে যে, বৌ ঘরে এসেছে,—শুনে আমি তীর্থে বেরিয়ে পড়বো। তারপর ছেলে যা খুশী করুক।

কথার শেষে কুমুদিনীর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জলের ধারা নামলো। অসহ্য কষ্টের ব্যথাতুর অশ্রুপাত। কুমুদিনী চক্ষু মুদিত ক'রে ব'সে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত যেতে না যেতে আবার বললেন,—দেখো ঠাকুরঝি, দেখাশুনার যেন ত্রুটি না হয়। কেউ যেন অখুশী না হয়। আমার কেউ খোঁজ করলে কি আর বলবে, মিথ্যে কথাই বোলো। বোলো যে, বৌঠান কাশীতে রয়েছে। ভালয়-ভালয় শুভকাজটা মিটিয়ে দিয়ে এসো ভাই! বড়বাড়ীতে গাড়ী পাঠাবে, যদি কেউ আসে।

হেমনলিনী সিন্দুক থেকে গয়না বের করছিলেন। বিয়ে-বাড়ীতে চলেছেন, গা-মেলানো গয়না পরছেন তাই। বিছে-হার, মপচেন, বাজু, বাউটি, গিনি-গাঁথা। বললেন,—জানিনা বৌঠান, কেমন ক'রে কি ক'রব!

কুমুদিনী বললেন,—শশীবৌকে আসতে ব'লে পাঠাবে। সে থাকলে তোমার অনেক স্থবিধে হবে। দু'দিনের যজ্ঞি, ঠিক মিটে যাবে ঠাকুরের দয়ায়।

দু'দিনের অনুষ্ঠান। প্রথম দিনে গাত্র-হরিদ্রা, বরানুগমন। পরের দিনে বৌ-বরণ ও প্রীতিভোজন। রাত্রি থাকতে হেমনলিনী পিত্রালয়ে যাত্রা করলেন বৌঠানের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে। যখন এসে পৌছলেন তখন সানাইয়ের বাজনায় ভোরের রাগিণী ধ'রেছে। লোকজনের অভাব নেই, ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত হয়েই আছে সব কিছুর। তবুও কোথায় যেন কার অভাব বোধ হচ্ছে। যাঁর গৃহ, সেই গৃহকর্ত্রীর। যাঁর উপস্থিতি শতেক নারীর সমতুল্য, বজ্রের মত কঠিন সেই কুমুদিনীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এত আনন্দের মাঝেও যেন কোথায় দুঃখের রেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু কারও সাহস হচ্ছে না যে, যেয়ে তাঁকে নিয়ে আসে, হাজির করে এখানে।

গোলাপী পোষাকের বেতনভুক্‌রা, যেদিকে তাকাও সেদিকে। কোথাও অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের মধ্যে ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে—রূপোর টাকা, ছত্র, উত্তরীয় ও বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। সজ্জাকরেরা জানলা আর দরজায় ভেলভেটের পর্দ্দা খাটাচ্ছে। রাত ফুরোলেই বৌভাতের যজ্ঞি—ভিয়েনে খাজা, গজা, পান্তুয়া ও জিলাপীরা তোয়ের হচ্ছে। তাদের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে বাতাস। সদরের ঘরে-ঘরে ফরাসে রূপোর আতরদান, গোলাপ-পাশ, পানের ডিবে সাজানো হয়েছে। অন্দরে পড়শিরা বঁটিতে বসেছে—কুটনো কোটা হচ্ছে।

ক্রমশঃ বেলা অতিক্রান্ত হচ্ছে। উত্তরোত্তর ব্যস্ততাও বর্দ্ধিত হচ্ছে যেন। গায়ে-হলুদের ব্যবস্থা হচ্ছে। বরণডালা সাজানো হচ্ছে; কোথাও চাল আর ডাল বাছা হচ্ছে। কুশোর শব্দ হচ্ছে সপাং সপাং। রান্নাঘরে নাড়ু তৈরীর জোগাড় করছেন হেমনলিনী। পূর্ণশশী ও অন্যান্য এয়োরা জোগান দিচ্ছে। পড়শি মহিলাদের ভেতর ফিস্‌ফিস্‌ গুঞ্জন চলেছে, কুমুদিনীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? তাদের সকলের চোখে-মুখে জিজ্ঞাসু ঔৎসুক্য। হেমনলিনী বড়বাড়ীতে জুড়ী পাঠিয়েছিলেন বৌঠানের কথা মত মেয়ে-বৌদের আনতে। লোক ফিরে এসে বললে,—কেউ আসতে পারবেন না।

বিস্ময়ে খানিক চুপচাপ চেয়ে থাকেন হেমনলিনী। শরিকী আত্মীয়তা, শুভকাজে না-আসা এমন কিছু বিস্ময়কর নয়। তবুও বললেন,—কেন? বৌঠান তো তাঁদের কাছে দোষ করেনি কিছু!

লোক তখন বললে,—না না, দোষের কিছু কথা হচ্ছে না। বড়বাড়ীতে অসুখ। এখন যায় তখন যায় অবস্থা।

এতক্ষণে সত্যিকার বিস্মিত হ'লেন হেমনলিনী। বললেন,—কার আবার অসুখ হ'ল!

লোক তখন বললে,—বড়বাবুর অসুখ। গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। লোকটি কথা বলতে-বলতে দেখলো কেউ শুনছে কিনা। বললে,—অত্যাচারে অত্যাচারে বড়বাবু শরীরটার কিছু কি আর রেখেছেন! মদ খেঁয়ে খেয়ে এ্যাদ্দিনে তার ফল-ভোগ করছেন। পীলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পেটের ভেতর ঘা হয়ে গেছে। দু'দিন দু'রাত্তির জ্ঞানহারা হয়ে আছেন। গ্যাস চলছে।

কথাগুলো শুনে হেমনলিনীর মুখখানা দেখায় যেন ভয়ার্ত্ত। কোন উত্তর দেন না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, যেন শুভকাজে বিঘ্ন না হয়।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ! স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণর অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয়। মদ এবং মেয়েমানুষের জন্যে কত টাকা যে জলাঞ্জলি দিয়েছেন! ঘর থেকে গয়না বের ক'রে দিয়েছেন, ক'টা তালুক পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে ফেলেছেন। মোসায়েব, মদ ও মেয়েমানুষ ব্যতীত অন্য কিছু জানলেন না। এমন কি পরম রূপবতী স্ত্রী থাকতেও ফিরে তাকালেন না। দুঃখের শ্বাস ফেললেন হেমনলিনী।

—হেম! হেম গেলে কোথায়?

নাম ধ'রে ডাক শুনে হেমনলিনী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন যিনি ডাকছেন, নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার তাঁর আছে। বললেন,—ডাকছেন?

—হ্যাঁ, এ কিরকম কথা?

—কেন, কি হয়েছে? ভয়ে ভয়ে শুধোলেন হেমনলিনী।

—ভদ্রেশ্বরের ক'ঘর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁদের প্রাপ্য কেন পাবেন না? মুড়ীপোড়া বামুনরা পাচ্ছে, তাঁরা কি দোষ করলেন?

বক্তার প্রশ্ন জটিল। হেমনলিনী কি উত্তর দেবেন, ভেবে স্থির করতে পারেন না। বলেন,—আমি কি বলব? যা বলবেন, তাই হবে।

প্রশ্নকর্ত্তা লালমোহন। সন্ন্যাসী-লালু। যেন কিঞ্চিৎ কুপিত হয়েছেন। বলছেন,—তোমাদের সাতপুরুষ থেকে তাঁরা পাচ্ছেন। আর এখন গোমস্তাদের আমল হ'য়ে তাঁরা—

কথা শেষ হওয়ার আগেই কথা বলেন হেমনলিনী,—আমার নাম নিয়ে বলুন কাছারীতে। গোমস্তারা হয়তো জানেন না।

লালমোহন বললেন,—পত্তর বিলির কাজ পড়েছিল মা, আমার ওপর। সর্ব্বসমেত সাড়ে তিনশো পত্তর বিলি ক'রেছি ক'দিনে। তোমার, বেহালা থেকে বেলগেছে পর্য্যন্ত।

লালমোহন ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকর্ম্মে ভাটের কাজ করেন। আমন্ত্রণলিপি বিতরণ করেন। হেমনলিনীর সম্মতি পেয়ে খুশী হলেন কিনা, বুঝলেন না হেমনলিনী।

লালমোহন বাক্যব্যয় না ক'রে সদরের দিকে অগ্রসর হ'লেন। অন্দরের শেষ বরাবর গিয়ে বললেন,—গায়ে-হলুদের সময় যেন উত্তীর্ণ হ'য়ে না যায়। আটটা ক' মিনিট পর্য্যন্ত তোমার টাইম্। এখন বেজেছে প্রায় সাতটা।

রাজেশ্বরী তখন জেগেছে ঘুম থেকে অনেক্ষণ। কাক ডাকার শব্দে।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে তার স্বপ্ন সার্থক হওয়ার শুভদিনের। বুকের ভেতরটা গুমরে উঠছে থেকে-থেকে! এত সুখের মাঝেও অসহ্য কষ্ট হচ্ছে যেন। হু-হু করছে বুকটা। ঠাগ্‌মা'র জন্যে আর বাড়ীর আর-আর সকলের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্ষণে-ক্ষণে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যাদের কাছে লালিত-পালিত হয়েছে পরম আদরে, তাদের ছেড়ে যেতে হবে—রাতটা পোয়ালেই আর তাদের দেখতে পাওয়া যাবে না! যেখানে যাচ্ছে, হোক না সেখানটা স্বর্গ, হোক না অশেষ সুখের লীলাক্ষেত্র, তবুও জন্মাবধি যাদের অকৃত্রিম স্নেহচ্ছায়ায় এতগুলো দিন কাটিয়েছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে হবে ভাবতেও যেন চোখ ফেটে জল আসে রাজেশ্বরীর। অজান্তে কখন চোখের কোণে টলমল করে জলের বিন্দু, পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই আঁচলে চোখ মুছে নেয়। বুকের ভেতরটা হু-হু করে বিয়ে-বাড়ীর কল-কোলাহলে আর সানাইয়ের শব্দে। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। ঢিপ-ঢিপ করে বুকটা। অবশ হয়ে আসে শরীরটা। শুয়ে পড়ে রাজেশ্বরী।

—রাজো, ওলো রাজো!

কোথা থেকে এসে ডাকেন ঠাগ্‌মা। বার্দ্ধক্যের আধিক্যে কাঁপতে কাঁপতে। দরজা ধ'রে নিজের দেহের টাল সামলে ডাকেন,—ওলো রাজো, উঠবি না মনে ক'রেছিস। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এসে পড়লো ব'লে। এখনও শুয়ে থাকবি বেআক্কেলী!

কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান ঠাগ্‌মা। উঠে বসে রাজেশ্বরী। ঠাগ্‌মা তার হাত ধ'রে তোলেন। দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে কেন কি জানি মুখখানা তার দেখেন কতক্ষণ। দেখতে দেখতে স্বর্গে যান যেন। পত্রবহুল চোখ রাজেশ্বরীর, স্বপ্নে মাখানো। কচি ডাবের মত মুখ। চন্দনের মত রঙ। কুঞ্চিত কেশরাশির ঢেউ নেমেছে পিঠে। মোমের মত গড়ন। দেখত দেখতে বৃদ্ধা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন শিশুর মত। ঠোঁট দু'টো তাঁর কাঁপতে লাগলো। ন্যুব্জ দেহটা তো কাঁপছেই সদাক্ষণ। রাজেশ্বরীও জড়িয়ে ধরলে পিতামহীকে। তারও চোখে বুঝি বা নামলো অশ্রুবন্যা! বিচ্ছেদের অন্তর্দাহে কাঁদলে দুজনে—একজন ফুটন্ত ও অনাঘ্রাত ফুলের মত ভরন্ত কুমারী, আর অন্যজন মৃত্যুর আহ্বানের জন্যে প্রস্তুত লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা!

—রাজো!

—ঠাগ্‌মা!

—তুই আমাকে ফেলে চ'লে যাবি?

—না, তোমাকেও নিয়ে যাবো। তুমি যাবে আমার সঙ্গে।

হেসে ফেললেন ঠাগ্‌মা নাতনীর কথা শুনে। কাঁদতে কাঁদতে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন,—বে হচ্ছে তোর, আমি যেতে যাবো কেন?

চুপচাপ চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী। ঘুমভাঙ্গা চোখে। এ কথার উত্তর খুঁজে পায় না। তবুও বলে,—হ্যাঁ, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। থাকবে আমার কাছে। খু—ব যত্ন করবো তোমাকে।

—আর এ ঘর-দোর কে দেখবে তোর? রাজো, যদ্দিন না মরি,

এ ভিটেয় থাকতে দিবি তো? কথা বলতে বলতে কথা কেঁপে ওঠে বৃদ্ধার। বলেন,—ঘর-দোর যে তোর। তোর বাপ যে দে গেছে তোকে।

রাজেশ্বরী বলে,—এবার আমি রাগ করবো ঠাগ্‌মা। যা মুখে আসছে বলছো?

আবার হেসে ফেললেন ঠাগ্‌মা। দন্তহীন মাড়ি বের ক'রে হাসলেন দুঃখ-কাতর হাসি। বললেন,—আর ভাই দেরী করিস নে, যা, মুখ-হাত ধুগে যা। তত্ত্ব এসে পড়লো ব'লে! যা ভাই—দিদি আমার!

সুখ আর দুঃখের মিশ্রিত অনুভূতিতে বুকটা আবার ঢিপ-ঢিপ ক'রে উঠলো। রাজেশ্বরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অবশ পদক্ষেপে। গেল মুখে-হাতে জল দিতে। পবিত্র বাসে নিজেকে পবিত্র করতে। লাল-পাড কোরা শাড়ী পরতে। রূপার কাজললতা খোঁপায় গুঁজতে।

ঠাগ্‌মা পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন সেখানে। দর-দর বেগে অশ্রুপাত হয় তাঁর। আসন্ন বিয়োগ-ব্যথার দুঃখে।

শহরে যেন টি-টি প'ড়ে গেছে। বাবুদের ছেলের বিয়ে।

এ যুগে টাকা না থাকলে কেউ কারেও চিনতে চায় না। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে অধিক লোক বিনয়াবনত হয়। তাদের নাম করে, তাদের যশের কীর্ত্তন গায়, তাদের সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে ক'রে ইষ্টের ন্যায় পূজা করে। দুর্গোৎসবে ও ছেলের বিয়েতে প্রতিযোগিতা চলে—কে কত টাকা খরচ করতে পারে। বাবুদের ছেলের বিয়েতেও ঐ ধরণের টাকার ঠাটের ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে ঢলতে না ঢলতে রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হ'তে লাগলো। ঢোল, ভোড়ং ও ভেঁপুর শব্দে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠলো। চুনোগলির ইংরেজী বাজনায় পাড়া কেঁপে উঠলো।

ঢুলীরা যেনো সুরা খেয়েছে, জ্ঞানগম্যি হারিয়ে বেতালা নাচতে লাগলো। বক্‌শিশের লোভে যে যত রকম ঢঙ ও কায়দা জানে নেচে নেচে দেখাতে লাগলো।

ক্রমে দেখতে দেখতে শুভ-মুহূর্ত্ত এলো।

জুড়ীতে চেপে হুজুর যাত্রা করলেন। আত্মীয়-অন্তরঙ্গরা ও পুরোহিত চললেন। অব্বরের হাতঝাড়, পাঞ্জা ও সিঁড়ি রাস্তার দু'পাশে চললো। পেছনে পেছনে গ্যাস-বাতির গেট্। তক্তানামার ওপর মগের নাচ ও ফিরিঙ্গীর নাচ। লাল বনাতের থাস-গেলাস ও রূপোর ডাণ্ডিতে রেশমের পতাকা-ধরা তক্‌মা-পরা মুটেরা চললো। সাজা সায়েব-তুরুক-সওয়ারের পেছনে ঝাড় ও লণ্ঠনধারীরা। ব্যাণ্ড্, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের হল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চিৎকারে কলকাতা কাঁপতে লাগলো। রাস্তার দু'ধারি বাড়ীর জানলা ও বারান্দা লোকে পু'রে গেল।

মা কুমুদিনী তখন হেমনলিনীর শ্বশুরালয়ে, তাঁদের পূজার ঘরে। মুদিত চোখে বিড়-বিড় ক'রে প্রার্থনা করছেন। শুভকাজ যাতে ভালয় ভালয় মিটে যায়, কায়মনোবাক্যে ডাকছেন। বলছেন কত কথা, আর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হচ্ছে তাঁর। পুত্র এবং পুত্রবধূর মঙ্গল কামনা করছেন।

এত আনন্দ আর হাসির মাঝেও যেন দুঃখের ছায়া। যেন কার অভাব। মা চ'লে গেছেন ব'লে ছেলের 'পরে আক্রোশ হচ্ছে কারও কারও। কিন্তু হাসিমুখে বিয়েয় মত দিয়েছে, বিয়ে হ'লে হয়তো সুমতি হবে, এই কথা ভেবে কেউ আর মুখ ফুটে কিছু বলছে না।

শাঁখ আর উলু-উলু। ছাদনা-তলা আলোয় আলো।

—ছাখ্ রাজো, ভাল ক'রে ছাখ্।

—তাকাও, চোখ তুলে তাকাও। লজ্জা ক'র না। ছিঃ!

পত্রবহুল চোখ রাজেশ্বরীর। ভয় আর লজ্জায় জড়সড়। কত লোক ঘিরে আছে তাকে! এ অবস্থায় তাকাতে পারে কেউ, যার বিয়ে হচ্ছে? রাজেশ্বরী তবুও চোখ তোলে, কাজলপরা চোখ। তাকায় কয়েক মুহূর্ত। কতক ভয় আর কতক লজ্জায়। শরীরটা কাঁপছে, ধড়াস-ধড়াস করছে বুকটা। ঠাট্টা আর তামাসা করছে কত কে। ছড়া কাটছে। হাসাহাসি হচ্ছে। লজ্জা করে রাজেশ্বরীর। 'লাল চেলী প'রেছে। গয়না প'রেছে কত। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত। ঘামে ভিজে যাচ্ছে দেহটা। স্ত্রী-আচার চলেছে। এখনও আছে বাসরের রাত!

সেখানেও যেমন এখানেও তেমন। এত উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যেও হাসির পরিপূর্ণতা কৈ! যারা এসেছে তাদের মুখের হাসিতে দেখা যায় রুক্ষতা। কারও মুখে হিংসা, কারও চোখে কটাক্ষ। মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, কত মেয়ে জ্বলছে ঈর্ষায়। ঐ ঠাগ্‌মা ছাড়া কে আছে রাজেশ্বরীর, যে কাঁদবে তার জন্যে। শৈশবে হারিয়েছে পিতামাতাকে—লালিত-পালিত হয়েছে ঐ ঠাগ্‌মা'র শেল-বেঁধা বুকে। আদরের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু পিতা-মাতার বুকভরা ভালবাসা পেলে কৈ? শুধু মুখের ভালবাসার মূল্য আছে? তবুও, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী রাজেশ্বরী, হাঘরের মেয়ে হ'লে কথা ছিল।

রাত্তিরটা গেল কোথা দিয়ে।

পাপড়ি খ'সে গেল আরেকটা। মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাবে, ভোর থেকে ব্যাগ-পাইপে দুঃখের রাগিণী বাজলো। রাজেশ্বরী কাঁদতে কাঁদতে চললো। সঙ্গে চললো বাক্স-প্যাঁটরা। ঠাগ্‌মা কাঁদলেন বুক চাপড়ে, রাজোকে বুকে জড়িয়ে। পরিস্থিতি বুঝে বাদ্যকররা দেখে দেখে বাজালো ব্যথা-ভরা রাগিণী। রাজেশ্বরী চললো গাঁট-ছড়ায় বাঁধা প'ড়ে।

—আমাকে ফেলে যাবি, রাজো! কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঠাগ্‌মা। বললেন,—বুকে ক'রে মানুষ করেছি, ছেড়ে থাকবো কি ক'রে?

ঠাগ্‌মা বলেন আর কাঁদেন।

রাজেশ্বরী উত্তর দেবে কোথা থেকে? ঠাগ্‌মার বুকে মুখ রেখে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

রাজেশ্বরীর সঙ্গে চলে বাক্স-প্যাঁটরা; এলোকেশী, পুরোনো ঝি, যে তাকে দেখেছে শুনেছে শৈশব থেকে—হেসেছে খেলেছে হাসি-খেলায়।

বধূকে ঘরে তুললেন হেমনলিনী। কাঁকালে ক'রে। এয়োরা তুক্‌তাক্ করলে কত রকম। ভয়ে আর লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে রাজেশ্বরী।

—তোর ভাগ্যি বটে, রাজো!

কাছাকাছি এসে ফিস্-ফিস্ করলে এলোকেশী। ফুর্তিতে গদগদ হয়ে। বললে,—ঘর-দোর দেখে এলেম ঘুরে-ফিরে। ঐশয্যি ছড়ানো রয়েছে। —কিন্তু, ছেলের মাকে দেখলেম না তো! তোর শাউড়ীকে তো দেখতে পাচ্ছি না!

ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী। জানলে তবে তো বলবে। এলোকেশী বললে,—শুধোলেম নোকজনদের। বললে না কেউ। চুপ মে'রে গেল।

রাজেশ্বরী উত্তর করে না। জানলে তবে তো বলবে, তাকে জানালে তবে তো।

—থামো তুমি এলোকেশী! কে কোত্থেকে শুনবে! আছেন, যাবেন আবার কোথায়!

বিরক্ত হয় রাজেশ্বরী। কথাগুলো বলে চুপিচুপি। বলে,—পাখা কর' দেখি, গরম লাগছে।

শামিয়ানায় ঢাকা উঠোনগুলো। গুমোট হয়ে আছে। হাওয়ার লেশ নেই।

ঘরের দেওয়ালে ছিল হাত-পাখা। এলোকেশী হাওয়া করে। রাজেশ্বরী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে,—তুমি হাঁদার মত যা-তা কথা বোলো না যার-তার সঙ্গে।

—না না। আমাকে তুই বলবি রাজো! শেখাবি আদব-কায়দা? এলোকেশীর কথায় বিজ্ঞতার সুর। বলে,—কিন্তু, ভাগ্যি বটে তোর!

—কতক্ষণে মিটবে বল' তো! রাজেশ্বরী কথা বলে অসহিষ্ণু হয়ে। বলে,—এত গয়না! খুলে দে এলো। কষ্ট হচ্ছে যে! বিঁধছে গায়ে।

—তা বললে হয়? বলে এলোকেশী।—মিটুক আগে কুসুম-ডিঙে। জিরো না তুই। দেখতে-দেখতে হয়ে যাবে। আমি পাখা করছি।

কলরোল আর লোকজনের ব্যস্ততায় গমগম করছে বাড়ী। সায়াহ্নে প্রীতিভোজন। কত অতিথি আসবে। কত মান্য-গণ্য পুরুষ আর মহিলা। আত্মীয়-স্বজন, কত কে আসবে। যজ্ঞির জোগাড় হচ্ছে। কনের বাড়ী থেকে তত্ত্ব এসে পড়লো ব'লে। ফুলশয্যার তত্ত্ব। কত সামগ্রী দেবে রাজেশ্বরীর ঠাগ্‌মা। ঘর খালি ক'রে দেবে।

প্রজাপতিঃ ঋষিঃ—

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন। পুনরুক্ত হয়। হোমকুণ্ডের ধোঁয়ায় জলে রাজেশ্বরীর চোখ। সিঁদুরের রাশিতে কপাল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নাটমন্দির পুরোহিতের মন্ত্রের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। বৈবাহিক কার্য্য শেষ হ'তে বেলা হ'য়ে যায় কত।

এ আবার কার ঘর। ঝকঝক তকতক করছে। পরিপাটি সজ্জিত। পিসশাশুড়ীর সঙ্গে চলে রাজেশ্বরী। হেমনলিনী বলেন,—তোমার ঘর। এসো, গয়না খুলে দিই, পোষাক বদলে দিই। আহা, কত কষ্টই যে হয়েছে! লজ্জা করবে না—কে আছে তোমার শ্বশুরের ঘরে! তোমারই তো ঘর। শাশুড়ী ছিলেন, তিনিও—

অবাক-চোখে চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী। হেমনলিনীর মুখের দিকে। হেমনলিনী বলেন,—শাশুড়ী তোমার কাশীবাসী হয়েছেন।

এতক্ষণে বোঝে রাজেশ্বরী। মুখ ফুটে বলেনা কিছু। পত্রবহুল চোখ দু'টো তুলে তাকায় শুধু। তাকায় কত লজ্জায়। হেমনলিনী একটা একটা ক'রে গয়না খুলে রাখেন রূপার একটা থালায়।

ঘর সজ্জিত ছিল আগে থেকেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পালঙে ধপধপে শয্যা। গালচে বিছানো মেঝেয়। বর্ম্মী কাজের আসবাব-পত্র এখানে-সেখানে। ঝকঝক তকতক করছে। রাজেশ্বরীর নাম লেখা তোরঙ্গ, গয়নার ক্যাশ-বাক্স। বলেন,—কোন্ শাড়ীটা পরবে বল'। কোন্ গয়না রাখবে গায়ে?

রাজেশ্বরী হাসে, লাজুক-হাসি। মুক্তার মত দাঁতগুলো দেখা যায় রাঙা ঠোঁটের ফাঁকে। কথা বলে না। হেমনলিনী বলেন,—আমরা মা সে-যুগের, মনে যদি না ধরে!

রাজেশ্বরী আবার হাসে। মিষ্টি-হাসি। হেমনলিনী বলেন গয়না খুলতে খুলতে,—আলাপ হয়েছে? কথা বলেছে আমার ভাইপোটি?

লজ্জিত হয় রাজেশ্বরী। ঘামতে থাকে লজ্জায়।

হেমনলিনী বলেন,—খুব ভাল ছেলে। বিষয় দেখাশুনো করতে হ'ল ব'লে বেশী দূর লেখাপড়া করতে পেল না। ছেলেবেলায় বাপকে হারিয়েছে।

ফুলশয্যার প্রাথমিক পালা চুকতে রাত হয়ে গেল।

স্বামী ও স্ত্রী। ঘরে শুধু এখন ছেলে আর মেয়ে। কথা প্রথম বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—ঐ কুমুদিনী, কুমু, মা।

রাজেশ্বরী চম্‌কে উঠলো কথাটা শুনে। মা। তিনি তো কাশীবাসী। দেখলো দেওয়ালের তৈলচিত্র। কুমুদিনীর সধবা বেশের। দেখলো রাজেশ্বরী, দেখলো কতক্ষণ ধ'রে। ভেলে ঢাকা মুখ, মুখে মৃদুহাসির রেখা। করুণ চোখ।

আর কুমুদিনী তখনও, মুখে জল না দিয়ে ব'সে পূজার ঘরে। মুদ্রিত চক্ষু, বকছেন বিড়বিড়। হেমনলিনীদের পূজা-ঘরে অষ্টধাতুর মূর্তি। পদ্মপলাশাক্ষি হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীমূর্ত্তি। রাজলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তি। কুমুদিনী যুক্তকরে ডাকছেন। জানাচ্ছেন কত কথা!

—কোথাও কেউ দেখছে না তো? বললে কৃষ্ণকিশোর। দেখলে হেথায়-সেথায়, খাট আর দেরাজের আশ-পাশ। বললে,—ঠাগ্‌মার জন্যে মন কেমন করছে?

রাজেশ্বরীর অধোমুখ। লজ্জায় কাঁপছে দেহ। ঢিপ-ঢিপ করছে বুকটা।

চুড়ির ঝুনু-ঝুনু। আড়ি পেতে রয়েছে কে কোথায়। দরজা আর জানলায়। রাজেশ্বরী কথা বলে গলা কাঁপিয়ে। বলে,—ঠাগ্‌মা তো এসেছিল।

ফুল-শয্যা। কত ফুলের রাশি। জুঁই, গোলাপ, বেল, পদ্ম। গন্ধরাজ। ভিজে-ভিজে ফুল—সুগন্ধে নেশা হয়ে যায় বুঝি। পালঙের ছত্রীতে ঝুলছে রজনীগন্ধার মালা, মশারী তৈরী হয়েছে ফুলের।

রাজেশ্বরীও প'রেছে ফুলের গয়না। গয়নায় চিক্‌চিক্ করছে রূপালী

রাঙতা। কোরা গঙ্গাজলী শাড়ী পরেছে। লাল ভেলভেটের জামা। পায়ে রূপোর তোড়া। কাজল-পরা চোখ। ব'সে আছে অধোমুখে। জেগে আছে, না, ঘুমোচ্ছে। চালচিত্তির খোঁপা মাথায়। কাজললতা উঁকি মারছে খোঁপা থেকে। রাজেশ্বরীর বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে। একটা হাত টেনে নেয় কৃষ্ণকিশোর। মোমের মত গড়ন যে-হাতের। আড়ষ্ট হয়ে থাকে রাজেশ্বরী। চোখ তুলে তাকায় কয়েক মুহূর্ত্ত। মুখটা রাঙিয়ে ওঠে। কাছাকাছি এগিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরীর কাছে। দেখে মুখটা রাজেশ্বরীর। অদৃশ্যপূর্ব্ব! দেখে অপূর্ব্ব দ্যুতি। ঢল-ঢল করছে কচি মুখটা রাজেশ্বরীর।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে থাকে হঠাৎ। অন্ধকারের বুক চিরে শব্দায়িত হয়। চমকে চমকে ওঠে রাজেশ্বরী।

ঝড় ব'য়ে গেল হঠাৎ।

ঝড়ের বেগ তবুও থামে না। গান শেষ হ'লে গানের রেশ থাকে কানে; হাসি থেমে গিয়েও যেমন হাসি কানে বাজে; শব্দ ফুরিয়ে যায়, থাকে কেবল প্রতিশব্দ; ফুল শুকোলেও পাওয়া যায় মিষ্টি সুবাস; বৃষ্টি-শেষে বয় যেমন জোলো-হাওয়া—যজ্ঞি শেষ হলেও যজ্ঞির জের তবুও যায় না। কোথায় রয়েছে ঐ শুভানুষ্ঠানের চিহ্ন। কত কে দেখতে আসছে কনেকে। বিয়ে উপলক্ষে যারা এসেছিল তাদের চলে-যাওয়ার পালা চলেছে। মহল থেকে আমলা-গোমস্তারা এসেছিল, কয়েক জন প্রজাও এসেছিল। দূর-দেশ থেকে এসেছিল ক'ঘর আত্মীয়। আসা-যাওয়ার পাথেয় নিয়ে ঘরের মানুষরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। নায়েবরা টাকা চুকিয়ে দিচ্ছেন যার যা প্রাপ্য। হোগলার চালা এখনও রয়েছে। দরজা-জানলায় রয়েছে ভেলভেটের পর্দা। কার্য্যোপলক্ষে ঝোলানো লণ্ঠনগুলোও রয়েছে। যজ্ঞির অফুরন্ত বাসি লুচি

কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। লোকজন খেয়েও ফুরোতে পাচ্ছে না। যে আসছে, খাচ্ছে।

এত কিছু হ'ল, দেখলেন না শুধু কুমুদিনী।

হেমনলিনীর মুখে কাজ মিটে যাওয়ার ফিরিস্তি শুনেই বললেন,—আমি তো আর অপেক্ষা করব না, ঠাকুরঝি। আমাকে যেতে হবে, আর দেরী করা চলবে না।

—যাবে কোথায়, বৌঠান! যাবো বলেছ ব'লে সত্যিই যাবে তুমি? হেমনলিনীর কথায় বিস্ময়ের সুর। বলেন,—তুমি কি জেদী বৌঠান! ভুলে যাও-না, ক্ষেমাঘেন্না ক'রে ভুলে যাও।

—না ঠাকুরঝি! তুমি আর বাধা দিও না। কুমুদিনীর দৃষ্টিতে কঠিন প্রতিজ্ঞা। বলেন,—কাছারীতে ব'লে পাঠাও, ট্রেনের খরচা পাঠিয়ে দেবে, পেয়াদা দেবে দুজন। পৌঁছে দিয়ে আসবে আমাকে। যাবো আমি কাশীতে।

—কি যে বল' বৌঠান! আমাকে শুনিও না, যা খুশী কর'। হেমনলিনীর কথার সুরে হতাশা। বলেন,—ক্ষমা করতে নেই?

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কুমুদিনী। ওষ্ঠাধর কাঁপতে থাকে তাঁর। শীর্ণ মুখাকৃতি। হঠাৎ বলেন,—জানো ঠাকুরঝি? তুমি যে কিছু জানো না! ছেলে মদ ধ'রেছে, গেছে কুচ্ছিৎ জায়গায়। আমি শুনেছি ভালো লোকের কাছে।

—এ্যাঁ! বিস্মিত হ'লেন হেমনলিনী।—কে বললে কে? কি বলছ' বৌঠান? কে তোমার কান ভাঙ্গালে?

দুঃখের হাসি হাসলেন কুমুদিনী। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেন,—যে বলেছে তাকে আমি বিশ্বাস করি।

গালে হাত দিলেন হেমনলিনী। চেয়ে রইলেন বিস্ফারিত চোখে।

বললেন,—আমি ভাবি আমারই কপাল পুড়েছে। আমার স্বোয়ামী আর ছেলেরা শুধু—

—থাক্ ঠাকুরঝি, থাক্। কি হবে ব'লে? যে যাবে তাকে তুমি-আমি পারবো আটকাতে? তুমি দিদি অমত ক'র না। কুমুদিনীর কথায় কাকুতি। বলেন,—কাছারীতে ব'লে পাঠাও। পেয়াদার হাতে টাকা পাঠিয়ে দিক্।

—ক'দিন আর বাঁচবে বৌঠান? থাকো-না আমার কাছে। কোথায় আর যাবে! অনুরোধ করেন হেমনলিনী। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে।

—না ঠাকুরঝি! বেশ থাকবো আমি। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে পূজো ক'রবো। লক্ষ্মী দিদিটি আমার!

কোন ওজর-আপত্তি কানে তুললেন না কুমুদিনী।

ঐ দিন রাতের গাড়ীতেই চ'লে গেলেন। হেমনলিনীর পাল্কীতে চেপে হাওড়ায় গেলেন। দুজন পেয়াদা পৌঁছে আসতে সঙ্গে গেল। মহিলাদের কামরায় গেলেন কুমুদিনী।

দুপুর বেলা। তত আর সাড়াশব্দ নেই।

লোকজন ফাঁক পেয়ে বিশ্রাম করছে। বিনোদা আর এলোকেশী খাওয়া-দাওয়া ক'রে দু'দণ্ড গল্প করতে বসেছে। পরস্পরের সঙ্গে ক'দিনে ভাব জম্মেছে বেশ। যদিও এলোকেশীকে ঠিক মনে ধরেনি বিনোদার। কুটুম-বাড়ীর লোক; নেহাৎ কথা না বললে নয়। এলোকেশীও দেখেই চিনে ফেলেছে, বুঝেছে, দেমাকে মট-মট করছে মাগী। তবুও মেয়ে-তরফের ব'লে এলোকেশী খুশী হয়েই কথা বলছে।

বিনোদা বলছে,—আমি এয়েছি কুমুদিনীর সঙ্গে, যখন আমার বয়েস তিরিশ। তখন অন্য হাল ছিল। তখন কত্তাদের আমল। ঝি ব'লেই মনে

করতো না কেউ। ঘরের মেয়ের মত ছিলুম। এখনকার মত তখন? আর বোলো না!

বিনোদা কথার শেষে পান খায়। দোক্তা খায়।

এলোকেশী বললে,—কেন, এখনও তোমারই তো পতিপত্তি। তুমিই তো দেখাশুনো করো। তোমাকেই তো দেখি মানে নোকজনেরা।

—আর বোলো না। বলে বিনোদা।—নোকজনেরা মানলে কি হবে, ছেলে মানে? বললুম, যা মাকে ফিইরে নে আয়। শুনলে? মা তো শেষ পয্যন্ত কাশীবাসীই হ'ল! আর বোলো না!

—হয়েছিলটা কি? শুধোয় এলোকেশী। চাপা গলায়। বলে,—কি দুঃখে কাশীতে গেলো! হয়েছিলটা কি?

—পান খাবে? আপ্যায়িত করে বিনোদা। বলে,—আর বোলো না!

—দাও, খাই। দাঁত কি আর আছে যে চিবুতে পারবো!

বিনোদা বললে পা দু'টোকে ছড়িয়ে,—দুখ্যু ব'লে দুখ্যু! ব'লবো না, ব'ললে ব'লবে যে কান ভাঙ্গালে। ব'লে কি হবে? রূপুশী বৌ পেয়েছে, দেখি কি হয়!

কথাগুলো শুনে থতমত খেয়ে যায় এলোকেশী। সাজানো ঘর-দোর দেখে যত খুশী হয়েছিল, কথা ক'টা শুনে অন্য মেজাজ হয়ে যায়। বলে,—আমি কি আর বলতে যাবো কাউকে। বলো না দিদি, বলো না! মেয়েটাকে তো আগে থেকে ব'লে-ক'য়ে রাখতে হবে। কি হ'তে কি হয়!

বিনোদা হাসে, কৃত্রিম হাসি। হতাশা আর ব্যঙ্গ-মিশ্রিত হাসি। বলে,—তা বটে। ব'লে-ক'য়ে রাখলে তো ভালই হয়।

—শুনে যে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সিঁদোচ্ছে দিদি! এলোকেশী কথা বলে ভয়-কাতর কণ্ঠে। বলে,—কি হবে দিদি?

বিনোদার মুখে পিক্। কিছু বলে না। চুপচাপ চেয়ে থাকে

হতাশ-চোখে। বোঝে, কাজ হয়েছে—এলোকেশী ভয় পেয়েছে। কেন কে জানে বিনোদার যেন জাতক্রোধ আছে। কখনও যেন সহ্য করতে পারে না কুমুদিনীর ছেলেকে। কখনও পারতো না। এখন মায়ে-ছেলেতে শত্রু-হাসানো সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। এখন তো আরও বেশী। দেখলেই শরীর জ্বলতে থাকে যেন। কথা বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। বললে,—হুজুর কোথায় এখন?

এলোকেশী ক্রমশঃ অবাক হয়। বলে,—কে জানে! বলো না দিদি, তুমি যেন পেটে কথা রাখছো!

বিনোদা বলে,—বললে কি চাপা থাকবে কথা! আমিও তো বলতে চাই। তোমারও জেনে রাখা ভাল। বৌটাকে ব'লে রাখলে যদি—

কথার মাঝপথে কথা থামায় বিনোদা। বিষয়টা জটিল ক'রে তোলে এলোকেশীর কানে। এলোকেশী ভাবে এলোপাতাড়ি। গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যায়। কত সুখের স্বপ্ন দেখেছিল এলোকেশী রাজেশ্বরীকে জড়িয়ে। কত কল্পনা করেছিল।

—বলো না দিদি, বলো না। বললে এলোকেশী। কথায় উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে।

বিনোদা পিক্ গিলে ফেলে। বলে,—ব'লবো'খন। ব্যস্ত হও কেন?

অনন্তরাম কোথায় ছিল। হঠাৎ আসে। বলে,—বিনোদা, বৌদি ঝিকে ডাকছে। যেতে বল্ আগে।

—যাও দিদি, ডাকছে তোমাকে। বিনোদা যেতে বলে এলোকেশীকে। এলোকেশীর শরীর যেন কাঁপছে। অশ্রুত কথার প্রারম্ভ শুনেছে এলোকেশী। শুনে পর্য্যন্ত কেমন হয়ে গেছে যেন। উঠে যায় এলোকেশী।

—আচ্ছা মানুষ তো! তোর কি ভীমরতি ধ'রেছে? অনন্তরাম বললে এলোকেশী চলে যেতেই। বললে,—বৌটা শুনলে রক্ষে থাকবে ভেবেছিস্!

বিনোদা খিঁচিয়ে ওঠে। বলে,—কেন, দোষটা কি করেছি ?

অনন্তরাম বললে,—ত্যাখ্‌, এতক্ষণ শুনছিলাম আমি। ঝিটাকে বিষোচ্ছিস্ তো ? ভালটা কি হবে শুনি ?

—জানি না অত-শত। বলেছি বেশ ক'রেছি। বিনোদা বলতে বলতে শুয়ে পড়ে আড় হয়ে। তেলচিটে বালিসটা টেনে নেয়।

অনন্তরাম বললে,—যা বলেছিস্, বলেছিস্। বেশী কিছু বলিস্ তো কেটে দু'খানা ক'রে ফেলবো তোকে ব'লে রাখলাম। ভাল করতে পারবে না—মন্দ করবে ?

—মুখ সামলে কথা বলো বলছি। তোমার খাই, না পরি ! বিনোদা বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে।

—আমার খেলে বাঁচতে পেতিস্ এতক্ষণ ! যার খাচ্ছিস্ তাকে গাল দিবি আড়ালে ? যাতে ক্ষতি হয় করবি ? অনন্তরাম বললে ঘৃণার স্বরে।

—বেশ ক'রবো। কথার শেষে পাশ ফিরে শোয় বিনোদা। কথায় যেন তাচ্ছিল্য। বলে,—কানের কাছে চেঁচামেচি ক'র না বলছি।

অনন্তরাম চুপচাপ তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বলে না কিছু। স্নান করতে চলে যায় পুকুরে। আকাশের ঠিক মধ্যিখানে সূর্য্য। পুকুরের জলে প্রতিবিম্ব পড়েছে।

শুয়েছিল রাজেশ্বরী। বাহুতে মাথা রেখে। আলুলায়িত চুলের রাশি ছড়িয়ে প'ড়েছিল পালঙ থেকে ভূমিতে। বোধ হয় চোখ দু'টো বুজেছিল। এলোকেশী আসতেই চোখ চাইলো। বললে,—কিছু বলছো ?

এলোকেশীর চোখে বিস্ময়। বলে,—তবে যে বললে ডাকছিস্ তুই ?

রাজেশ্বরী বলে,—না তো। কে বললে ? যা, বিশ্রাম কর্ গে যা।

এলোকেশী বলে,—স্বোয়ামী কোথায় ?

রাজেশ্বরী হেসে ফেললে। বললে,—বেরিয়েছে। বললে তো আসছি শীঘ্রি।

—কোথায় গেল বললে না ? শুধোয় এলোকেশী।

রাজেশ্বরী বলে,—না। তুই ঐ বইটা দে যা দেখি আমায়।

দেরাজের মাথায় ছিল একটা বই। পাতা-খোলা। বিয়েতে উপহার পাওয়া। বেহুলা।

এলোকেশী বই দিয়ে বিশ্রাম করতে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে ঘরের ইদিক-সিদিক। দেওয়ালের ছবি, আসবাব-পত্র, ঝাড়-লণ্ঠন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলোকেশী। দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়, দেওয়ালের ছবিতে চোখ রেখে। যাদের ছবি তাদের মুখে-চোখে আভিজাত্য, দৃষ্টিতে পবিত্রতা!

—ঠাগ্‌মা'র কাছে যাবি কবে ? এলোকেশী জিজ্ঞেস করে। কি মনে ক'রে জিজ্ঞেস করে কে জানে।

রাজেশ্বরী বলে,—যাবো শীঘ্রি। ঠাগ্‌মা বলেছে, ব'লে পাঠাবে।

জোড়ে গিয়েছিল রাজেশ্বরী। কাটিয়ে এসেছে ক'টা দিন। ঠাগ্‌মা বলেছেন,—শ্বশুরঘরে কেই বা আছে ! যা, শ্বশুরঘর কর্‌গে যা। মন আঁকুপাকু করলে আমিই যেয়ে দেখে আসবো।

এলোকেশী খানিক বাদে কি মনে হ'তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিনোদারি কাছে যেতেও মন চায় না, কি শোনাতে কি শোনাবে কে জানে! বুকটা গুমরে ওঠে এলোকেশীর। দালানে গিয়ে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবে।

কাছারীতে নায়েবদের মধ্যে তখন বাক্‌বিতণ্ডা চলছিল। সাবেকী আমলের কয়েকজন কথা কইছিলেন। হুজুর বেরুবার সময় টাকা নে গেছেন। বিশ-পঁচিশ হ'লে কথা ছিল না, তবিল খুলিয়ে যা পেয়েছেন

তুলেছেন। কাগজের টাকা, সব সমেত হাজার দু'য়েক হবে। নায়েবরা হতচকিত হয়ে গেছেন। কখনও এমন হয় না। এত টাকা একসঙ্গে প্রয়োজন হয় না কখনও। নায়েবরা বাধা দেবেন এমন সাধ্য কার হবে। হুজুর স্বয়ং এখন মালিক। ম্যানেজারবাবু থাকলে বলতে পারতেন। কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে, পারতেন জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবুও কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন।

নায়েবরা বলাবলি করছিলেন টাকা কেন প্রয়োজন হ'তে পারে। যার যা মনে হচ্ছিল বলছিলেন।

ভাদ্রের প্রথম। চড়া রোদ্দুর দুপুরের। গুমোট হয়ে আছে।

কাছারীর প্রাঙ্গণে কতকগুলো কাক টা টা করছে। পাল পাল মুরগীর বাচ্ছা লাফালাফি করছে হেথায়-সেথায়।

দেখতে দেখতে কতক্ষণ কেটে যায়। দুপুর গড়িয়ে যায়।

বেহুলা পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। এলোকেশী ডাকে। ঘুম ভাঙ্গায়। বলে,—আয়, চুল বেঁধে দি। বেলা ফুইরেছে। উঠে পড়্।

ঘুম-চোখে দেখে রাজেশ্বরী। উঠে বসে। বলে,—ডাকতে হয়! কত বেলা হয়েছে বল্ তো।

—ডাকছি তো। মেজাজ ভাল নয় আমার। আয় চুল বেঁধে দি। এলোকেশী কথা বলে বিরক্ত হয়ে। বলে,—মা লক্ষ্মীর কিপায় ভাল হলেই ভাল।

রাজেশ্বরী কান দেয় না এলোকেশীর কথায়। এলোকেশী সময় নেই অসময় নেই বলে এমন কত কথা। কথার শ্রোতা যে কে, কাকে উদ্দেশ্য ক'রে যে বলে, এলোকেশীই জানে।

রাজেশ্বরী বললে,—শাশুড়ীর ঘর খুলিয়েছিলুম, এলো। দেখলি না তো তুই!

—ডেকেছিলি আমাকে ? বলে এলোকেশী।—সাজানো-গোছানো ঘর তো ?

—হ্যাঁ। সাজানো ব'লে সাজানো ! দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে গেলো। শ্বশুরের ছবি দেখলুম। রাজেশ্বরী কথা বলে বিহ্বল হয়ে। বলে,—কত শাড়ী-জামা শাশুড়ীর। আলমারী ঠাসা।

—তুই তো পাবি। বলে এলোকেশী, কথায় লোভ ফুটিয়ে। বলে,—শাউড়ীকে ফেরাতে হবে, রাজো। যেখানেই থাক্, ফেরাতে হবে। শাউড়ী না এলে ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

কি বলছে সব এলোকেশী, যে-সব কথার কোন মানে হয় না। রাজেশ্বরী তাকিয়ে থাকে ডাগর চোখ দুটোকে তুলে। বলে,—তীর্থ করতে গেছে শাশুড়ী, গেছে কাশীতে। কথা বলতে বলতে থামে রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত্ত। বলে,—বললে যে, আসছি শীগ্রি। কোথায় গেলো বল্ তো !

বুকটা গুমরে ওঠে এলোকেশীর। কোথায় গেছে, এলোকেশী জানবে কোত্থেকে। এলোকেশীও তো ভাবছে, গেছে কোথায় ! কতক্ষণ কেটে গেছে। সূর্য্য প্রায় ঢ'লে পড়েছে পশ্চিমে। ভাদ্রের বেলাশেষে মেঘ জমেছে ঈশানে। দলে দলে মেঘ। কোথায় যেন কে আছে কেশবতী, মুখ লুকিয়ে আছে আকাশে। বিছিয়ে দিয়েছে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আকাশের বুকে। হাওয়া চ'লেছে মাঝে মাঝে। শিরশিরে হাওয়া।

—কোথায় গেছে, ব'লে গেছে আমাকে ? বলে এলোকেশী। কথাটা শুনে মুখটা শুকিয়ে যায়, চুপচাপ চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী। লজ্জিত হয় কিছুটা। বলে,—ফিতে-কাঁটা কোথায় আছে ?

এলোকেশী উত্তর দেয় না কথার। ফিতে-কাঁটা এনে জিজ্ঞেস করে,—এখানে বাঁধবি, না, ছাতে যাবি ?

রাজেশ্বরী বললে,—চল্, ছাতে চল্। অনন্তরামকে শুধো দেখি, গাড়ীতে গেছে তো? আমি ছাতে আছি।

রাজেশ্বরী ছাদে যায়। ছাদে গিয়ে ঘোরা-ফেরা করতে ভাল লাগে। গিয়ে বসে রাজেশ্বরী। চুল বেঁধে দেয় এলোকেশী। একেক দিন একেক ধারার খোঁপা বেঁধে দেয়।

—হ্যাঁ, গাড়ীতে গেছে। পেছন থেকে বললে এলোকেশী। বললে, —কাছারী থেকে টাকা নে যাওয়া হয়েছে।

ভ্রূ দু'টো কুঁচকে ওঠে। রাজেশ্বরী ভাবতে থাকে কত কথা। বলে,— পিসীমার কাছে গেছে?

—জানি নে বাবা! এলোকেশীর কথায় বিরক্তি। বলে,—ভাবগতিক ভাল বুঝছি না বাপু!

চুপচাপ চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম কোথা থেকে আসে হঠাৎ। আসে ঝড়ের মত। বলে,— বৌদিদি, বৌদিদি—। চোখে দেখবে তুমি, তবুও—

—কি হয়েছে অনন্ত? অবাক-চোখে বলে রাজেশ্বরী। বলে,—কি হয়েছে?

অনন্তরামের চোখে জল। মুখে হতাশা, কথায় কাকুতি। বলে,— চোখে দেখেও কিছু মনে করবে না তুমি, বৌদিদি! হিতে বিপরীত হয়ে যাবে বৌদিদি! ধৈর্য্য ধরতে হবে যে তোমাকে। বৌদিদি—

অনন্তরামের চোখে অশ্রুধারা। কথা শেষ না ক'রেই চ'লে যাচ্ছিল। রাজেশ্বরী ডাকলে,—অনন্ত, কি হয়েছে ব'লে যাও।

এলোকেশী বলে,—হয়েছে যা, শুনে কি হবে? বুঝেছি আমি যা হয়েছে।

রাজেশ্বরী উঠে দাঁড়ায়। ছাদ থেকে ঘরে ফিরে আসে। এলোকেশীকে বলে,—কি হয়েছে বল্ আমাকে।

এলোকেশী কিছু বলে না। বিনোদা এসে বলে,—মদে চুর হয়ে ফিরেছে যে স্বোয়ামী!

বজ্রাঘাত হয় মাথায়। রাজেশ্বরী চোখ দুটোকে বন্ধ ক'রে ফেলে। কম্পিত-কণ্ঠে বলে,—কি হবে, এলো?

এলোকেশী কথার উত্তর দেয় না। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। রাজেশ্বরী পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তোলপাড় হয়ে যায়। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে ঠকঠকিয়ে। রাজেশ্বরী তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে। হাতের তালু দু'টো ঘেমে ওঠে। কপালের দু'পাশ ঝিম-ঝিম করে। দেরাজে ছিল আয়না। রাজেশ্বরী দেখতে পায় রাজেশ্বরীকে! শুভ্র ধপধপে রঙ, মোমের মত গড়ন, আলুলায়িত কেশরাশি। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় রাজেশ্বরী। কি হবে দেখে রূপের ডালি?—নেশা…মদ… মদ খাওয়ার নেশা! শুধু কি নেশা? মনে মনে কত প্রশ্ন জাগে। চোখ দুটোকে বিঁধে ফেলতে চায় আয়নায় দেখে। কত সুখ, কত হাসি, কত রঙীন কল্পনার জাল বুনেছিল রাজেশ্বরী! মুহূর্ত্তের মধ্যে কি হয়ে গেল!

॥ প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত ॥